দ্বিতীয় অধ্যায়

কোষ বিভাজন

CELL DIVISION

প্রধান শব্দসমূহ : সাইটোকাইনেসিস, কোষ চক্র, ক্রসিংওভার, সিন্যাপসিস

মাধ্যমিক শ্রেণির জীববিজ্ঞান বিষয়ে তোমরা কোষ বিভাজন সম্বন্ধে জেনেছো। এ অধ্যায়ে কোষ বিভাজন, বিশেষ করে কোষচক্র ও মায়োসিস সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—

- ❖ মাইটোসিসের ব্যাখ্যা।
- ❖ মাইটোসিসের গুরুত্ব।
- ❖ মিওসিসের (মায়োসিস) পর্যায়সমূহ।
- ❖ জীবদেহে মিওসিসের (মায়োসিস) গুরুত্ব।
- ❖ জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় মিওসিস (মায়োসিস) কোষ বিভাজনের অবদান।

ব্যবহারিক : মাইটোসিস বিভাজন পর্যবেক্ষণ করে চিত্র অঙ্কন।

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ
পাঠ ২	মাইটোসিস কোষ বিভাজন
পাঠ ৩	মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপসমূহ
পাঠ ৪	মায়োসিস কোষ বিভাজন
পাঠ ৫	মায়োসিস কোষ বিভাজনের ধাপসমূহ : মায়োসিস-১
পাঠ ৬	মায়োসিস কোষ বিভাজনের ধাপসমূহ : মায়োসিস-২
পাঠ ৭	মায়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব
পাঠ ৮	**ব্যবহারিক :** মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায় (স্থায়ী স্লাইড) পর্যবেক্ষণ

বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি কোষের একটি স্বাভাবিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এককোষী জীবসমূহ, যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট প্রভৃতি বার বার বিভাজনের মাধ্যমেই একটি থেকে অসংখ্য এককোষী জীবে পরিণত হয়। বিশালদেহী একটি বটগাছের সূচনাও ঘটে একটিমাত্র কোষ (জাইগোট = নিষিক্ত ডিম্বক) হতে। গাছ থেকে গাছের সৃষ্টি হয়, প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয় প্রাণী, আর তেমনি কোষ থেকেই কেবল কোষ সৃষ্টি হতে পারে। এককোষী নিষিক্ত ডিম্বক হতে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় এক সময় কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে একটি পরিণত মানুষের সৃষ্টি হয়। **জীবদেহে কোষ বিভাজন একটি মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া, এর মাধ্যমেই জীবের দৈহিক বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি ঘটে। যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষ বিভক্তির মাধ্যমে একটি থেকে দুটি বা চারটি কোষের সৃষ্টি হয় তাকে কোষ বিভাজন বলা হয়।** কোষ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট নতুন কোষকে বলে **অপত্যকোষ** (daughter cell) এবং যে কোষটি থেকে অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় সে কোষটি হলো **মাতৃকোষ** (mother cell)। Walter Flemming ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে সামুদ্রিক স্যালামান্ডার *(Triturus maculosa)* কোষে প্রথম **কোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন**। "কোষ থেকেই কেবল কোষ সৃষ্টি হতে পারে"—এটি বলেন রুডলফ ভিরশাও।

হ্যাপ্লয়েড বনাম ডিপ্লয়েড

প্রতিটি জীবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক unique ক্রোমোসোম থাকে; যেমন– মানুষের ২৩টি। ফলের মাছির ৪টি। সবগুলো unique (অনন্য, অদ্বিতীয়) ক্রোমোসোম মিলে একটি ক্রোমোসোম সেট হয়। মানুষের দুই সেট ক্রোমোসোম থাকে অর্থাৎ প্রতিটি ক্রোমোসোম দুই কপি করে আছে। যে কোষে ২ সেট ক্রোসোসোম আছে তাকে বলা হয় **ডিপ্লয়েড কোষ** বা '2n'। মানুষ ডিপ্লয়েড জীব। যে কোষে এক সেট ক্রোমোসোম থাকে তাকে বলা হয় **হ্যাপ্লয়েড কোষ** বা 'n'। n-stand for the number of unique chromosome. মানুষের দেহ কোষ '2n' কিন্তু শুক্রাণু বা ডিম্বাণু 'n'।

কোষ বিভাজনের প্রকার : জীব জগতে তিন প্রকার কোষ বিভাজন দেখা যায়। যথা :

১। অ্যামাইটোসিস (Amitosis) বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন (Without mitosis)।
২। মাইটোসিস (Mitosis) বা সমীকরণিক কোষ বিভাজন (Gr. mitos = thread)।
৩। মায়োসিস (Meiosis) বা হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন (Gr. Diminution)।

১। অ্যামাইটোসিস বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন

(Amitosis or Direct Cell Division)

যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম কোনো জটিল মাধ্যমিক পর্যায় ছাড়াই সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য (শিশু) কোষের সৃষ্টি করে তাকে **অ্যামাইটোসিস** বা প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলে।

প্রক্রিয়া : অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই সরাসরি মাতৃকোষের বিভাজন ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসটি প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি দু'অংশে ভাগ হয়। নিউক্লিয়াসটি প্রথমে লম্বা হয় ও মাঝখানে ভাগ হয়ে দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। পরে কোষটির মধ্যভাগে একটি চক্রাকার গর্ত ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়ে পরিশেষে কোষটিকে

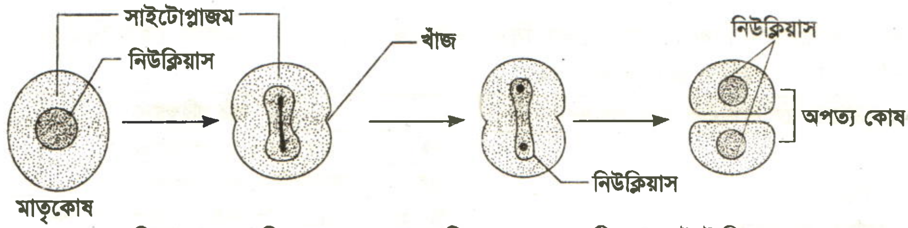

চিত্র ২.১ : একটি মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি (অ্যামাইটোসিস)।

দু'ভাগে ভাগ করে ফেলে। ফলে একটি কোষ দুটি অপত্য কোষে (daughter cell) পরিণত হয়। প্রতিটি অপত্য কোষ ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে মাতৃকোষের অনুরূপ আকার ও আকৃতি লাভ করে। **কতক ঈস্ট, অ্যামিবা প্রভৃতি এককোষী জীবে এ প্রকার কোষ বিভাজন দেখা যায়। ব্যাকটেরিয়ার দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়াও কতকটা অ্যামাইটোসিস এর মতোই। উভয় প্রক্রিয়া প্রায় সমার্থক।**

অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ার তাৎপর্য

(i) বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্জার (১৮৯২) এর মতে, অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া থেকেই জটিল ও উন্নত কোষ বিভাজন পদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছে।

(ii) কোনো কোনো এককোষী জীবের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং একমাত্র প্রক্রিয়া।

২। মাইটোসিস বা সমীকরণিক কোষ বিভাজন

[Mitosis = My toe sis or Equational Cell Division]

প্রকৃতকোষী জীবদেহ গঠনের কোষ বিভাজন হলো মাইটোসিস। মাইটোসিস কোষ বিভাজনে একটি প্রকৃতকোষের প্রতিটি ক্রোমোসোমের একটি করে ক্রোমাটিড দু'দিকে দু'মেরুতে সরে গিয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। পরে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে উদ্ভিদকোষে কোষপ্রাচীর সৃষ্টির মাধ্যমে এবং প্রাণিকোষে প্লাজমামেমব্রেন ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়ে সাইটোপ্লাজম দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলা হয় **ক্যারিওকাইনেসিস** (karyokinesis) এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে বলা হয় **সাইটোকাইনেসিস** (cytokinesis)। এ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যাগত, আকৃতিগত ও গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটে না অর্থাৎ নতুন দুটি কোষের প্রতিটিতে ক্রোমোসোমের সংখ্যা, গুণাগুণ ও গঠনাকৃতি মাতৃকোষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা, গুণাগুণ ও গঠনাকৃতির অনুরূপ থাকে। এ বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম উভয়ই একবার বিভাজিত হয়। **যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম উভয়ই একবার করে বিভক্ত হয় তা-ই মাইটোসিস কোষ বিভাজন। অন্যভাবে, যে কোষ বিভাজনে একটি দেহ কোষের নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে সমআকৃতি ও সমগুণসম্পন্ন দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টির মাধ্যমে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হয় সেই কোষ বিভাজনই মাইটোসিস।** নিউক্লিয়াসের এরূপ বিভাজন প্রথম দেখতে পান **শ্লাইখার** (Schleicher–1879) এবং নাম দেন **ক্যারিওকাইনেসিস**। পরে **ওয়াল্টার ফ্লেমিং** (Walter Flemming, 1882) এ প্রকার পূর্ণ বিভাজনকে **মাইটোসিস** নামে অভিহিত করেন।

মাইটোসিস বিভাজনে মাতৃকোষের প্রতিটি ক্রোমোসোম সেন্ট্রোমিয়ারসহ লম্বালম্বিভাবে সমান দু'অংশে ভাগ হয় এবং প্রতিটি অংশ এর নিকটবর্তী মেরুতে গমন করে। ফলে সৃষ্ট নতুন কোষ দুটিতে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান থাকে। তাই মাইটোসিসকে **ইকোয়েশনাল** বা **সমীকরণিক** বিভাজনও বলা হয়।

মাইটোসিস কোথায় ঘটে? : মাইটোসিস প্রাণী ও উদ্ভিদের বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন দৈহিক কোষে ঘটে থাকে; যেমন– উদ্ভিদের কাণ্ড বা তার শাখা-প্রশাখার শীর্ষ, মূলের বর্ধিষ্ণু শীর্ষ, ক্যাম্বিয়াম প্রভৃতি অঞ্চলে মাইটোসিস হয়ে থাকে। জীবদেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাইটোসিস প্রক্রিয়ারই ফল। জননাঙ্গের গঠন এবং বৃদ্ধিও মাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

মাইটোসিসের বৈশিষ্ট্য

১। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে তথা অনুদৈর্ঘ্যে দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়।
২। প্রতিটি ক্রোমাটিড তথা অপত্য ক্রোমোসোম তার নিকটস্থ মেরুতে পৌঁছে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। কাজেই দুটি অপত্য কোষেই ক্রোমোসোম সংখ্যা সমান থাকে।
৩। অপত্য কোষগুলো মাতৃকোষের সমগুণসম্পন্ন হয়, কারণ জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক জিনসমূহ বহনকারী ক্রোমোসোমগুলোর প্রতিটি লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষের নিউক্লিয়াসে যায়।
৪। অপত্য কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান থাকে।
৫। অপত্য কোষ বৃদ্ধি পেয়ে মাতৃকোষের সমান আয়তনের হয়।

কোষচক্র ও ইন্টারফেজ (Cell Cycle & Interphase)

একটি সুস্থ বর্ধিষ্ণু কোষের জীবন শুরু হয় তার মাতৃকোষের বিভাজনের মাধ্যমে এবং শেষ হয় নিজে বিভাজিত হয়ে অপত্যকোষ সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। **একটি কোষ সৃষ্টি, এর বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে বিভাজন—এ তিনটি কাজ যে চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় কোষচক্র** (Cell Cycle)। **হাওয়ার্ড ও পেল্ক** (Howard & Pelc, 1953) এই কোষচক্রের প্রস্তাব করেন। এ চক্রটি বার বার চলতেই থাকে। **একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দেহে ১০০ ($১০^{১৪}$) ট্রিলিয়ন** (trillion) **কোষ থাকে**। দেহকে সুস্থ রাখতে হলে এর মধ্যে সঠিক সময়ে সঠিক কোষটিকে বিভক্ত হতে হবে। এ বিভাজনের জন্য প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োজনীয় সিগনাল বা সংকেত। কিছু কোষ আছে যারা দ্রুত বিভাজনের জন্য বিশেষায়িত (যেমন ভ্রূণ কোষ, মূল ও কাণ্ডের শীর্ষ মেরিস্টেম কোষ); কিছু কোষ আছে প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা পেলে বিভাজিত হতে পারে; আবার অনেক কোষ আছে কখনো বিভক্ত হয় না। যেমন– আমাদের পূর্ণাঙ্গ লাল রক্ত কোষ, পেশিকোষ, স্নায়ুকোষ, উদ্ভিদের স্থায়ী কোষসমূহ।

কোষচক্র দুটি প্রধান ধাপে বিভক্ত; যথা-কোষের বিভাজনরত অবস্থাকে বলা হয় **এম. ফেজ** (Mitotic Phase) বা **মাইটোসিস** এবং দুটি এম. ফেজ-এর মধ্যবর্তী অবিভাজন অবস্থাকে বলা হয় **ইন্টারফেজ** (Interphase)। অন্যভাবে, একটি কোষ পরপর দু'বার বিভক্ত হওয়ার মধ্যবর্তী সময় বা পর্যায়ই হলো ইন্টারফেজ। এম. ফেজ এবং ইন্টারফেজ পর্যায়ক্রমিকভাবে পরপর এসে কোষ চক্র সম্পন্ন করে। কোষ চক্রের মোট সময়ের মাত্র ৫–১০ ভাগ ব্যয় হয় এম. ফেজ-এ, আর বাকি ৯০–৯৫ ভাগ সময় ব্যয় হয় ইন্টারফেজ অবস্থায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, **কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেহের মাত্র অল্পসংখ্যক কোষ মাইটোসিস পর্যায়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় অধিকাংশ কোষই ইন্টারফেজ পর্যায়ে থাকে। একটি জেনেটিক প্রোগ্রাম দ্বারা কোষ চক্র নিয়ন্ত্রিত হয়।** অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা প্রদান করে **সাইক্লিন-CDK যৌগ**। বিভিন্ন হরমোন ও গ্রোথ ফ্যাক্টর (gf) বাহ্যিক উদ্দীপনা দান করে। আমাদের দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে রক্তের অণুচক্রিকা একটি গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি করে যার উদ্দীপনায় চারপাশের কোষ বিভাজিত হয়ে ক্ষতস্থান জোড়া লাগিয়ে দেয়। দেহের ইমিউন সিস্টেমের জন্য দরকারি কোষসমূহ বিভাজিত হওয়ার জন্য শ্বেত রক্তকণিকা একটি গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি করে দেয়। Bone marrow-তে লোহিত রক্তকণিকা কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য 'কিডনি' **erythroprotein** তৈরি করে।

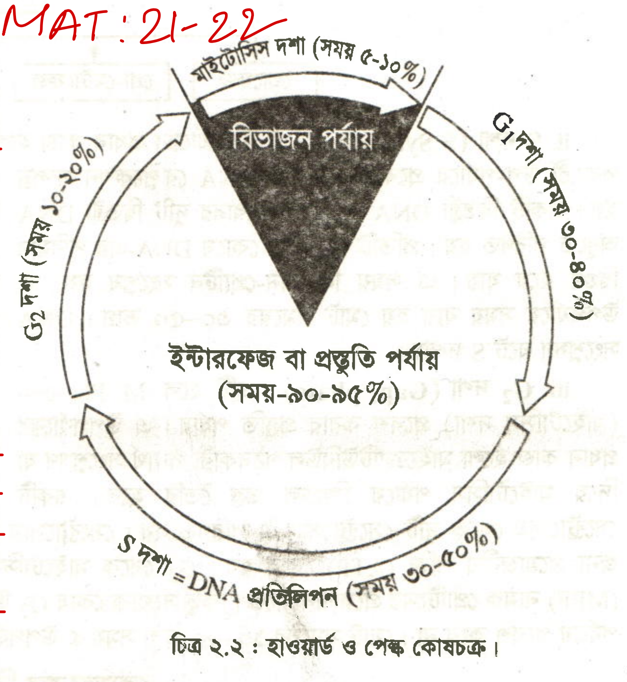

চিত্র ২.২ : হাওয়ার্ড ও পেল্ক কোষচক্র।

(ক) ইন্টারফেজ (Interphase) : ইন্টারফেজ অবস্থাটি বেশ দীর্ঘ। পরবর্তী বিভাজন পর্যায়টিকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইন্টারফেজ অবস্থায় নিউক্লিয়াসে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে থাকে। তাই ইন্টারফেজ অবস্থায় কোষের নিউক্লিয়াসকে বলা হয় **বিপাকীয় নিউক্লিয়াস**। এক কথায় বলা যায়, **M. Phase** (মাইটোটিক ফেজ)-কে সুসম্পন্ন করতে সব

ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় ইন্টারফেজ অবস্থায়। কোষ চক্রের মোট সময়ের ৯০—৯৫ ভাগ সময় ব্যয় হয় ইন্টারফেজ অবস্থায়। ইন্টারফেজ-কে সাধারণত ৩টি উপ-পর্যায়ে ভাগ করা হয়; যথা– G_1, S এবং G_2 দশা। **টার্গেট কোষের** (যে কোষ বিভাজিত হবে) **সার্ফেসে বিশেষ রিসেপ্টর প্রোটিনের সাথে গ্রোথ ফ্যাক্টর সংযুক্ত হয়ে কোষ চক্র শুরু করার নির্দেশ দান করে।**

i. G_1 দশা (Gap$_1$ phase) : একটি কোষ পরবর্তীতে বিভাজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে কিনা, তার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় G_1 উপপর্যায়ে। G_1-এর প্রথমেই **সাইক্লিন** নামক এক প্রকার প্রোটিন তৈরি হয় যা CDK (Cyclin dependent kinase) এর সাথে যুক্ত হয়ে সমগ্র প্রক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। CDK ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এ সময় প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রোটিন, RNA এবং DNA রেপ্লিকেশনের সকল উপাদান তৈরি হয়। যে কোষটি আর বিভাজিত হবে না তা এক সপ্তাহ বা এক বছর অর্থাৎ আমৃত্যু G_1 উপপর্যায়েই আবদ্ধ হয়ে যায়। মোট কোষ চক্রের ৩০—৪০% সময় এ উপপর্যায়ে ব্যয় হয়।

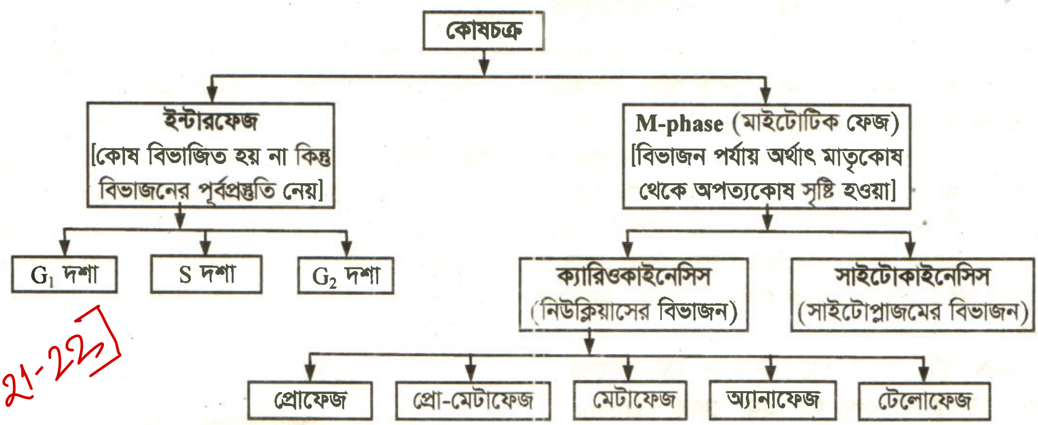

ii. S দশা (S Synthesis) : এ উপপর্যায়ের প্রধান কাজ হলো নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমস্থ DNA সূত্রের রেপ্লিকেশন। পরবর্তী উপ-পর্যায়ে প্রবেশের আগেই DNA রেপ্লিকেশন সম্পন্ন হয়। একটি দ্বিতন্ত্রী DNA অণু দৈর্ঘ্য বরাবর দুটি দ্বিতন্ত্রী DNA অণুতে পরিণত হয়। প্রতিটি ডিপ্লয়েড কোষে DNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। এ সময় **হিস্টোন-প্রোটিন** সংশ্লেষ হয়। এ উপপর্যায়ে সময় ব্যয় হয় মোট সময়ের ৩০—৫০ ভাগ। DNA সংশ্লেষণ ঘটে S দশায়।

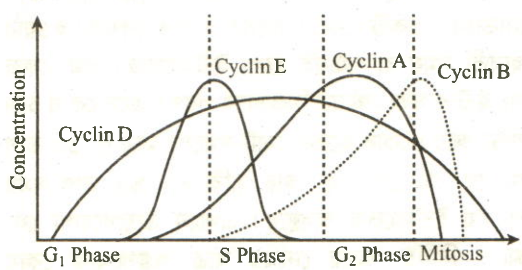

চিত্র : Cyclin graph

iii. G_2 দশা (Gap$_2$ phase) : এটি হলো M. Phase-এ (মাইটোসিস দশা) প্রবেশ করার প্রস্তুতি পর্যায়। এ উপপর্যায়ের প্রধান কাজ হলো মাইক্রোটিউবিউল গঠনকারী পদার্থ সংশ্লেষণ যা দিয়ে মাইটোসিস পর্যায়ে স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হবে। একটি সেন্ট্রোসোম থেকে দুটি সেন্ট্রোসোম-এ পরিণত হয়। সেন্ট্রোসোম মাইক্রোটিউবিউল তৈরি সূচনা করে। বিভাজন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি (ATP) তৈরি হয়। G_2 থেকে মাইটোসিস-এ প্রবেশ করতে হলে **ম্যাচুরেশন প্রোমোটিং ফ্যাক্টর** (MPF) নামক প্রোটিনের প্রয়োজন পড়ে। কিছু সংখ্যক কোষ G_2 উপপর্যায়ে এসেও আটকা পড়ে যায়, আর কখনো বিভাজন পর্যায়ে প্রবেশ করে না। মোট সময়ের ১০—২০ ভাগ সময় এ উপপর্যায়ে ব্যয় হয়।

কোষচক্রের নিয়ন্ত্রক

কোষচক্রের নিয়ন্ত্রক হলো **সাইক্লিন প্রোটিন** এবং CDK। মানুষের কোষে চার প্রকার সাইক্লিন থাকে।

সাইক্লিন-D : কোষকে G_1 থেকে S এবং S পর্যায় থেকে G_2 পর্যায়ে নিয়ে যায়।

সাইক্লিন-E : S-পর্যায়ে DNA রেপ্লিকেশনের জন্য কোষকে প্রস্তুত করে।

সাইক্লিন-A : S-পর্যায়ে DNA রেপ্লিকেশন সক্রিয় ও ত্বরান্বিত করে।

সাইক্লিন-B : মাইটোটিক স্পিন্ডল তৈরিসহ মাইটোসিসের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সম্পন্ন করে।

Sea Urchin-এর ডিমের প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে Timothy Hunt (1982) দৈবক্রমে বা অপ্রত্যাশিতভাবে সাইক্লিন প্রোটিন (তিনিই এই নাম দেন) আবিষ্কার করেন। এজন্য Hunt এবং সাথে Lee Hartwell ও Paul Nurse-কে ২০০১ সালে নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়। Hartwell ঈস্ট কোষে এমন জিনের সন্ধান পান যা কোষচক্র শুরু করে বলে ধরে নেয়া হয়। Nurse অন্য প্রজাতির ঈস্ট কোষে এমন জিনের সন্ধান পান যা মিউটেট হলে কোষচক্র বন্ধ করতে অথবা সময়ের আগে কোষ বিভাজন শুরু করতে পারে।

জীব জীবনে ইন্টারফেজ-এর গুরুত্ব : জীব জীবনে কোষের ইন্টারফেজ পর্যায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(i) কোষটি পরবর্তী কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করবে কিনা তা ইন্টারফেজ-এর প্রথম দিকেই ঠিক হয়।

(ii) পরবর্তী কোষ বিভাজনের জন্য প্রোটিন, RNA ও DNA রেপ্লিকেশনের সকল উপাদান তৈরি হয়।

(iii) DNA রেপ্লিকেটেড হয়।

(iv) কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় স্পিন্ডল তন্তু তৈরির জন্য মাইক্রোটিউবিউলস সৃষ্টি হয়।

(v) কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয় শক্তি (ATP) তৈরি হয়।

(vi) ইন্টারফেজ পর্যায় না থাকলে বিভাজন পর্যায় সম্পন্ন হবে না। বিভাজন প্রক্রিয়া না থাকলে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি, জীবের পূর্ণাঙ্গ গঠন ও বিকাশ হবে না, অর্থাৎ নতুন জীবই সৃষ্টি হবে না।

জীব জীবনে কোষচক্রের গুরুত্ব/তাৎপর্য : ইন্টারফেজ ও মাইটোটিক কোষ বিভাজন পর্যায়ক্রমিকভাবে এসে কোষ চক্র সম্পন্ন করে। কোষচক্রের গুরুত্ব অসীম।

(i) কোষচক্র না হলে এককোষী বা বহুকোষী কোনো জীবেরই বংশবৃদ্ধি হবে না।

(ii) কোষচক্রের ইন্টারফেজ-এর প্রস্তুতির কারণেই মাইটোসিস হয়, আর মাইটোসিস বহুকোষী জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায়, প্রজনন-অঙ্গ তৈরি করে এবং ক্ষয়পূরণ করে।

(iii) প্রতিটি জীবে স্বাভাবিক কোষচক্র ঐ জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পন্ন করে।

(iv) অস্বাভাবিক অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত কোষচক্র জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত করে। এমনকি ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

(খ) M-Phase বা মাইটোটিক ফেজ : কোষচক্র G_2 ফেজ থেকে মাইটোসিস বা বিভাজন পর্যায়ে প্রবেশ করে। একটি জটিল প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও পুনঃগঠন, সাইটোপ্লাজমের নতুন দুই কোষে গমন, সেলমেমব্রেন এবং উদ্ভিদ কোষে কোষপ্রাচীর গঠনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টির মধ্যদিয়ে M-Phase সমাপ্ত হয়। কোষ চক্রের মোট সময়ের মাত্র ৫–১০ ভাগ সময় ব্যয় হয় মাইটোটিক ফেজের জন্য। স্তন্যপায়ীদের কোষ চক্র মাইটোটিক দশা ১–১.৫ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এভাবেই ইন্টারফেজ → M-ফেজ → ইন্টারফেজ চক্রাকারে চলতে থাকে।

অধুনা কোষ চক্রকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়; যথা– (ক) ইন্টারফেজ, (খ) মাইটোসিস (নিউক্লিয়াসের বিভাজন) এবং (গ) সাইটোকাইনেসিস (সাইটোপ্লাজমের বিভাজন)।

ইন্টারফেজ এবং M. phase এর মধ্যে পার্থক্য

ইন্টারফেজ	M-phase
১। এটি কোষ বিভাজনের প্রস্তুতি দশা।	১। এটি কোষের প্রকৃত বিভাজন দশা।
২। কোষচক্রের ৯০–৯৫% সময় এখানে ব্যয় হয়।	২। কোষ চক্রের ৫–১০% সময় এখানে ব্যয় হয়।
৩। এ দশায় কোষীয় সংগঠনের বৃদ্ধি এবং সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটে।	৩। এ দশায় কোষীয় সংগঠনের বিস্তার ও বিভাজন ঘটে।
৪। এ দশায় বংশগতীয় বস্তু ক্রোমাটিন হিসেবে থাকে।	৪। এ দশায় বংশগতীয় বস্তু ক্রোমোসোম হিসেবে থাকে।

মাইটোসিস (Mitosis) [DAT:21-22,20-21]

সম্পূর্ণ বিভাজন প্রক্রিয়া দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত; যথা– (i) **ক্যারিওকাইনেসিস** (Karyokinesis) বা **মাইটোসিস**—মাইটোসিস প্রক্রিয়া চলাকালে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ও (ii) **সাইটোকাইনেসিস** (Cytokinesis)—মাইটোসিসের শেষ দিকে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন। [MAT:19-20]

(i) ক্যারিওকাইনেসিস (Karyokinesis) : মাইটোসিস বলতে মূলত ক্যারিওকাইনেসিসকেই বোঝানো হয়ে থাকে। মাইটোসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস থেকে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হওয়াকে **ক্যারিওকাইনেসিস** বলে।

মাইটোসিস-এর পর্যায়সমূহ

কোষ বিভাজন একটি অবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তাই একে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা সঠিক নয়। তবুও বর্ণনা ও ধারাবাহিকতার সুবিধার জন্য মাইটোসিসকে প্রধানত **পাঁচটি** দশা বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। পর্যায়গুলো নিম্নরূপ :

(১) প্রোফেজ (Prophase) বা আদ্যপর্যায় (গ্রিক শব্দ *pro* = প্রাক + phase = পর্যায় বা দশা) : মাইটোসিস-এর প্রথম পর্যায়কে প্রোফেজ বলে। এটি মাইটোসিসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়। এ পর্যায়ে কোষের নিউক্লিয়াস আকারে বড়ো হয়। নিউক্লিয়াস, বিশেষ করে ক্রোমোসোমগুলোতে জল-বিয়োজন (dehydration) আরম্ভ হয়। ক্রমাগত জল-বিয়োজনের ফলে ক্রোমোসোমগুলো সংকুচিত হতে থাকে, ফলে ক্রোমোসোমগুলো ক্রমাগত খাটো ও মোটা হয়, রং ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং স্পষ্ট হতে স্পষ্টতরভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এ পর্যায়ের শেষের দিকে নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলপের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। **সাইক্লিন ডিপেনডেন্ট কাইনেজ** (Cdk) কর্তৃক কতক প্রোটিনের ফসফোরাইলেশনের কারণে ক্রোমোসোমের সংকোচন শুরু হয় এবং কতক প্রোটিনের ফসফোরাইলেশনের কারণে নিউক্লিয়ার এনভেলপের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে।

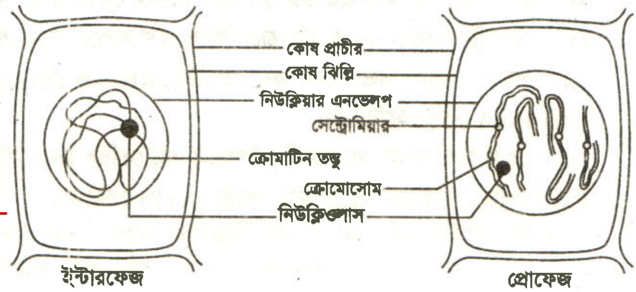

চিত্র ২.৩ : মাইটোসিস-এর ইন্টারফেজ ও প্রোফেজ পর্যায়।

মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ পর্যায়ে **প্রতিটি ক্রোমোসোম সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত লম্বালম্বিভাবে (অনুদৈর্ঘ্যে) দুটি সূত্রে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি সূত্রকে ক্রোমাটিড বলা হয়**। ক্রোমোসোমগুলো প্রোফেজ পর্যায়ে ক্রোমাটিডে বিভক্ত হলেও আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সাধারণত অবিভক্তই মনে হয়। এ পর্যায়ে স্পিন্ডল তন্তু সৃষ্টির সূচনা ঘটে। প্রাণিকোষে সেন্ট্রিওল থেকে স্পিন্ডল তন্তুর সৃষ্টি হলেও উদ্ভিদকোষে মাইক্রোটিউবিউলস থেকে (সাধারণত উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রিওল থাকে না) স্পিন্ডল তন্তুর সৃষ্টি হয়।

(২) প্রো-মেটাফেজ (Pro-metaphase) বা প্রাক-মধ্যপর্যায় (গ্রিক শব্দ *pro* = প্রাক + *meta* = মধ্য + phase = পর্যায় বা দশা) : প্রোফেজ পর্যায়ের পরবর্তী এবং মেটাফেজ পর্যায়ের অগ্রবর্তী পর্যায়কে প্রো-মেটাফেজ বলে। এটি স্বল্পস্থায়ী পর্যায়। প্রোফেজের একেবারে শেষদিকে উদ্ভিদকোষে কতগুলো তন্তুময় প্রোটিনের সমন্বয়ে দু'মেরুযুক্ত **স্পিন্ডল যন্ত্রের** (spindle apparatus) সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ের প্রথম দিকেই স্পিন্ডল যন্ত্রের তন্তুগুলোর আঘাতে নিউক্লিয়ার এনভেলপ বিলুপ্ত হতে থাকে এবং এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ে নিউক্লিওলাসেরও বিলুপ্তি ঘটে। প্রো-মেটাফেজ পর্যায়ে উদ্ভিদকোষে তন্তুময় প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। স্পিন্ডল যন্ত্রের দু'মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে **ইকুয়েটর** বা **বিষুবীয় অঞ্চল** বলা হয়। স্পিন্ডল যন্ত্রের তন্তুগুলো এক মেরু হতে অপর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। এদেরকে **স্পিন্ডল ফাইবার** (spindle fibre) বলা হয়। প্রো-মেটাফেজ পর্যায়ে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডল যন্ত্রের নির্দিষ্ট তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয়। এসময় ক্রোমোসোম একটু আন্দোলিত হয় যাকে **ক্রোমোসোমীয় নৃত্য** বলা হয়ে থাকে। আসলে ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে যেতে থাকে। ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্তকারী তন্তুকে **ট্র্যাকশন ফাইবার** (traction fibre) বলা হয়। ক্রোমোসোমগুলো এ সময় বিষুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত হতে থাকে। (প্রাণিকোষে স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি ছাড়াও পূর্বে বিভক্ত সেন্ট্রিওল দু'মেরুতে অবস্থান করে এবং দুমেরু হতে অ্যাস্টার তন্তু বিচ্ছুরিত হয়।)

Mitotic centre : কোষের এ অঞ্চল মাইটোসিসের জন্য মাইক্রোটিউবিউলস ব্যবস্থা করে। প্রাণিকোষে সেন্ট্রোসোম mitotic centre হিসেবে কাজ করে।

স্পিন্ডল ফাইবার সেন্ট্রোমিয়ারের কাইনেটোকোরের মটর প্রোটিনে সংযুক্ত হয়। এ প্রোটিন ATP ভেঙ্গে ADP ও Pi সৃষ্টি করে এবং শক্তি নির্গত করে। এ শক্তি খরচ করে ক্রোমোসোম মাইক্রোটিউবিউলস ধরে চলতে থাকে।

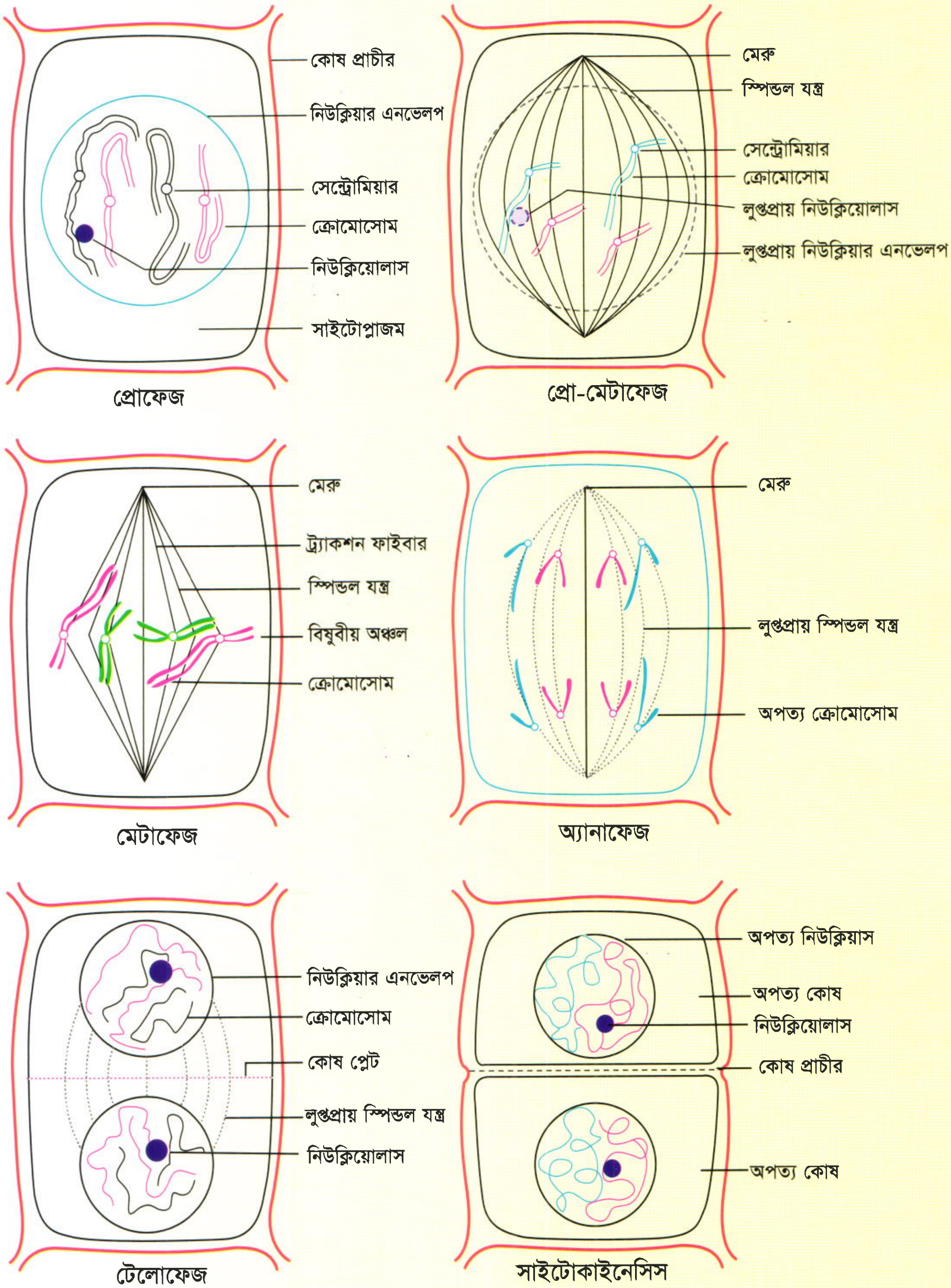

চিত্র : মাইটোসিস এর ধাপসমূহ

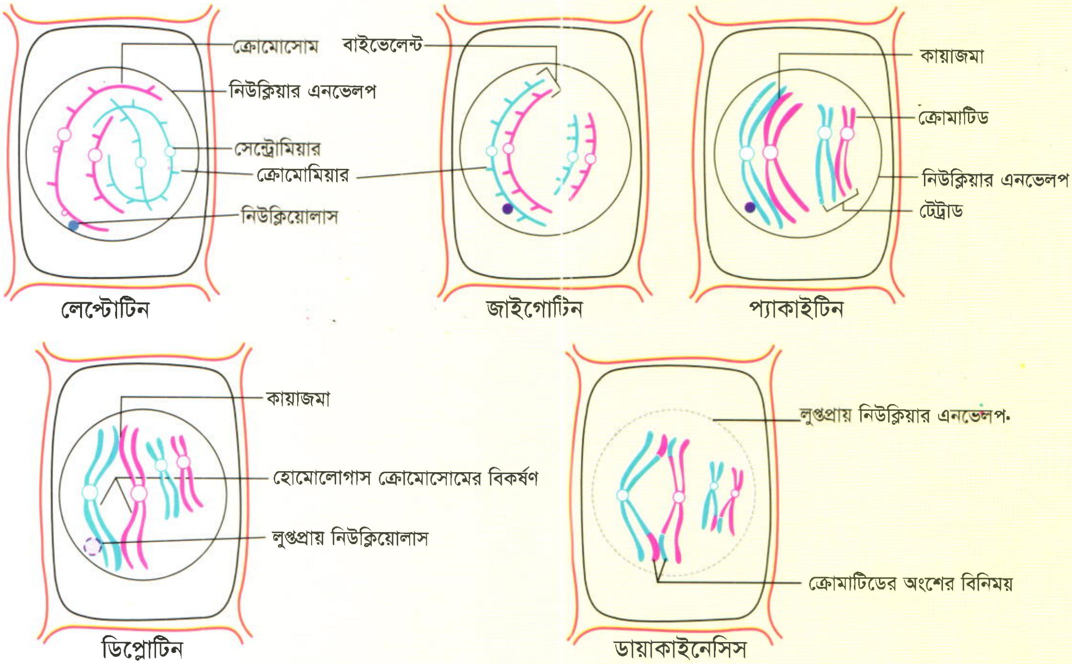

চিত্র : মায়োসিসের প্রোফেজ-১ এর ধাপসমূহ

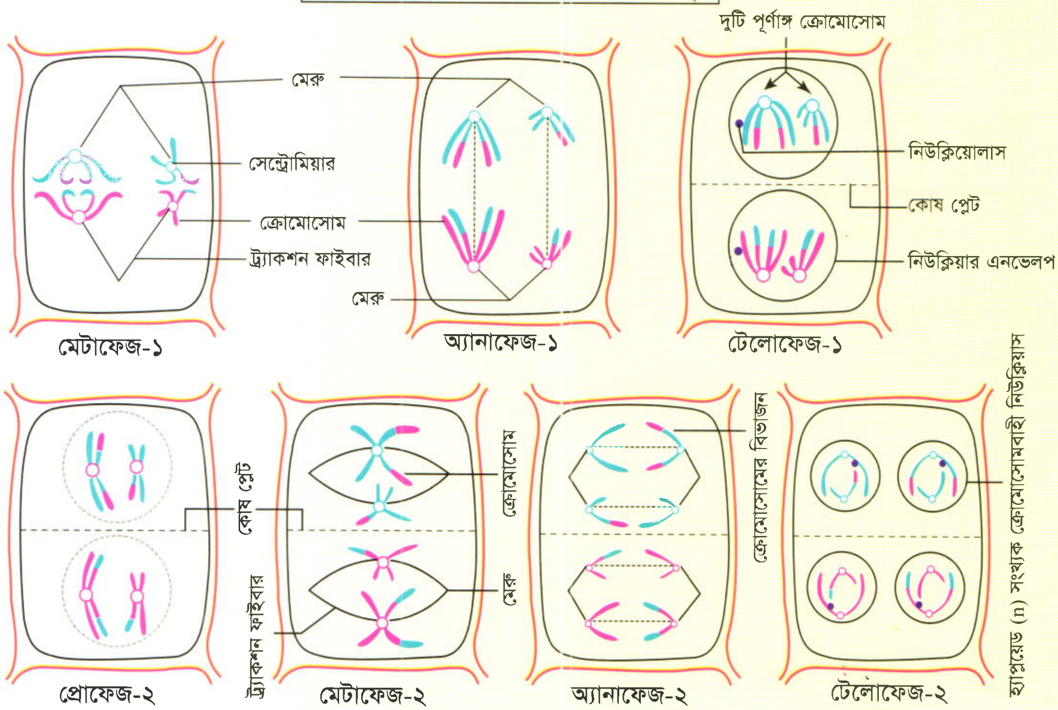

চিত্র : মায়োসিসের মেটাফেজ-১ থেকে টেলোফেজ-২ পর্যন্ত ধাপসমূহ

• RMDAC

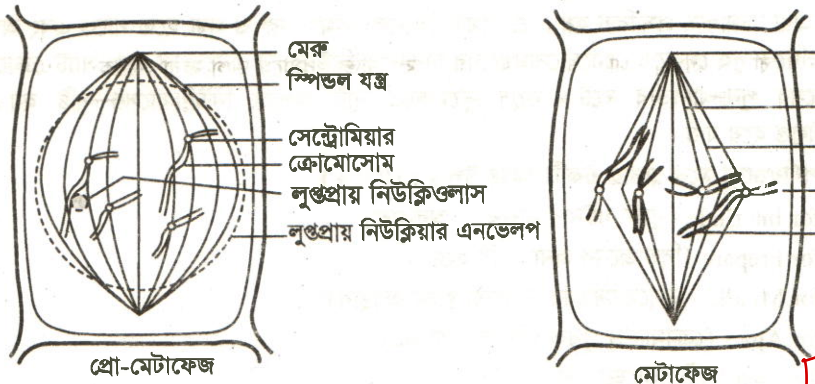

[DAT:18-19, MAT: 22-23]

চিত্র ২.৪ : মাইটোসিস-এর প্রো-মেটাফেজ এবং মেটাফেজ পর্যায়।

(৩) মেটাফেজ (Metaphase) বা মধ্যপর্যায় (গ্রিক শব্দ *meta* = মধ্য + phase = পর্যায় বা দশা) : এ পর্যায়ের প্রথমেই সমস্ত ক্রোমোসোম স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করে। স্পিন্ডল যন্ত্রের দু'মেরুর মধ্যবর্তী স্থানকে **বিষুবীয়** বা **নিরক্ষীয় অঞ্চল** বলা হয়। **কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে ক্রোমোসোমের বিন্যস্ত হওয়াকে মেটাকাইনেসিস** বলে। এ পর্যায়ে ক্রোমাটিডগুলো সবচেয়ে বেশি মোটা, খাটো ও স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রোমোসোমের খাটো ও মোটা হওয়াকে বলা হয় **কন্ডেনসেশন** (Condensation)। একটি অতিমাত্রায় কয়েলিং (coiling) প্রক্রিয়ায় এটি হয়ে থাকে তাই একে বলা হয় **সুপার কয়েলিং**। সুপার কয়েলিং প্রক্রিয়ায় ক্রোমোসোম খাটো ও মোটা হয়। এ পর্যায়ে কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা, আকার ও আকৃতি নির্ণয় করা যায়। নিউক্লিয়ার এনভেলপ ও নিউক্লিওলাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত থাকে। মেটাফেজ পর্যায়ের শেষ ভাগে প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ার সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য সেন্ট্রোমিয়ার সৃষ্টি করে।

(৪) অ্যানাফেজ (Anaphase) বা গতিপর্যায় (গ্রিক শব্দ *ana* = গতি + phase = পর্যায় বা দশা) : সেন্ট্রোমিয়ার পৃথক হওয়ার সাথে সাথে অ্যানাফেজ পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ে অপত্য ক্রোমোসোমসমূহ বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরুমুখী চলতে শুরু করে। সেন্ট্রোমিয়ারের পূর্ণ বিভক্তির ফলে প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি অপত্য ক্রোমোসোমে পরিণত হয় এবং প্রতিটি অপত্য ক্রোমোসোম এদের নিকটস্থ মেরুর দিকে ধাবিত হয়। অপত্য ক্রোমোসোমের মেরু অভিমুখী চলনে সেন্ট্রোমিয়ারই অগ্রগামী থাকে এবং বাহুদ্বয় অনুগামী হয়, ফলে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোমগুলো ইংরেজি V (মেটাসেন্ট্রিক), L (সাবমেটাসেন্ট্রিক), J (অ্যাক্রোসেন্ট্রিক) ও I (টেলোসেন্ট্রিক) অক্ষরের মতো দেখায়। **অপত্য ক্রোমোসোমগুলো মেরুর কাছাকাছি পৌঁছালেই অ্যানাফেজ তথা গতিপর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।**

[MAT:18-19]

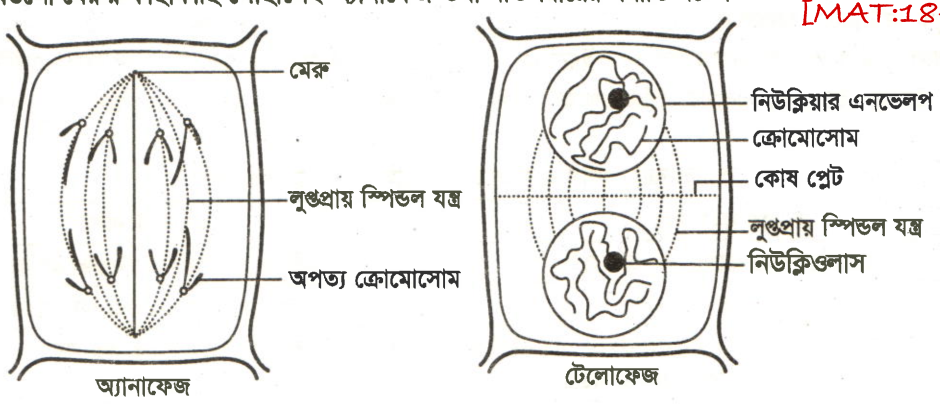

চিত্র ২.৫ : মাইটোসিস-এর অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ পর্যায়।

(৫) টেলোফেজ (Telophase) বা অন্তপর্যায় (গ্রিক শব্দ *telo* = শেষ + phase = পর্যায় বা দশা) : কোষ বিভাজনের এ পর্যায়ে অপত্য ক্রোমোসোমসমূহ দুই বিপরীত মেরুতে স্থির অবস্থান নেয় এবং ক্রোমোসোমগুলোতে আবার জলযোজন

(hydration) ঘটে। ফলে এরা ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়। ক্রোমোসোমগুলো ক্রমশ সরু ও লম্বা হতে থাকে এবং অস্পষ্ট হতে থাকে। এ পর্যায়ের শেষের দিকে দুই মেরুতে ক্রোমোসোমগুলোর চারদিকে নিউক্লিয়ার এনভেলপ এবং স্যাট ক্রোমোসোমের গৌণ কুঞ্চনে নিউক্লিওলাসের পুনঃআবির্ভাব ঘটে। ফলে দু'মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। স্পিন্ডল ফাইবারগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মাইটোসিসের প্রধান পর্যায়গুলো মনে রাখার একটি সহজ উপায় : IPMAT

Interphase **I** is for Interlude (দুটো ঘটনার মাঝখানে অবকাশ)
Prophase **P** is for Prepare (বিভাজনের জন্য তৈরি হওয়া)
Metaphase **M** is for Middle (ক্রোমোসোমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান)
Anaphase **A** is for Apart (ক্রোমাটিড পৃথক হয়ে সরে যাওয়া)
Telophase **T** is for Two (দুটি কোষের জন্য)

(ii) সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis) : টেলোফেজ পর্যায়ের শেষের দিকে সাইটোকাইনেসিস আরম্ভ হয়। বিভাজনরত কোষের সাইটোপ্লাজম দু'ভাগে বিভক্ত হওয়াই **সাইটোকাইনেসিস**। উদ্ভিদকোষে সাইটোকাইনেসিস ঘটে কোষপ্লেট ও কোষ প্রাচীর সৃষ্টির মাধ্যমে। উদ্ভিদকোষে স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চল ক্রমশ প্রশস্ত হয়ে কোষ প্রাচীরকে স্পর্শ করে। সূত্রগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে আসা ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট এবং ক্ষুদ্র ভেসিকল মিলিত হয়ে কোষপ্লেট তৈরি করে। বিষুবীয় অঞ্চলেই লাইসোসোমের ন্যায় ফ্র্যাগমোসোম জমা হয় এবং পরে এরা মিলিত হয়ে **প্লাজমালেমা** (plasmalema) নামক ঝিল্লির সৃষ্টি করে। এরা কোষপ্লেট সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কোষপ্লেটের ওপর সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন ও অন্যান্য দ্রব্য জমা হয়ে কোষ প্রাচীর গঠন করে। কোষ প্রাচীর গঠনের ফলে মাতৃকোষটি পরবর্তীতে দু'ভাগে ভাগ হয়ে দুটি অপত্য কোষের জন্ম হয়।

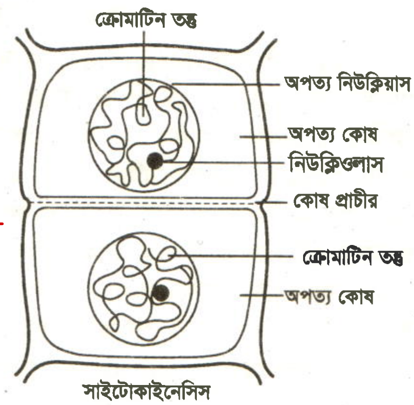

চিত্র ২.৬ : সাইটোকাইনেসিস প্রক্রিয়া।

[প্রাণীর ক্ষেত্রে স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর কোষঝিল্লিটি গর্তের ন্যায় ভেতরের দিকে ঢুকে যায় এবং এ গর্ত সব দিক হতে ক্রমান্বয়ে গভীরতর হয়ে মাঝখানে একত্রে মিলিত হয়, ফলে কোষটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। প্রোটিন actin এবং myosin কোষঝিল্লির খাঁজ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।]

সাইটোকাইনেসিস না হলে (এবং ক্যারিওকাইনেসিস চলতে থাকলে) একই কোষে বহু নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় **মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন** (free nuclear division)। ডাবের পানি মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজনের ফসল। কোনো কোনো শৈবাল, ছত্রাক ও প্রাণিকোষে ক্যারিওকাইনেসিস ঘটে কিন্তু সাইটোকাইনেসিস ঘটে না। এর ফলে একটি কোষে বহু নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। এ ধরনের উদ্ভিদকোষকে **সিনোসাইটিক** (coenocytic) এবং প্রাণিকোষকে **প্লাজমোডিয়াম** (plasmodium) বলে।

ক্যারিওকাইনেসিস ও সাইটোকাইনেসিস এর মধ্যে পার্থক্য

ক্যারিওকাইনেসিস	সাইটোকাইনেসিস
১। এ পদ্ধতিতে কোষের নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে।	১। এ পদ্ধতিতে কোষের সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে।
২। জটিল পদ্ধতি এবং দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।	২। অপেক্ষাকৃত সরল পদ্ধতি এবং কম সময়ের প্রয়োজন।
৩। সমগ্র প্রক্রিয়াটি পাঁচটি দশা, যথা-প্রোফেজ, প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ-এ বিভক্ত।	৩। একে কোনো পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় না।
৪। নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।	৪। সাইটোপ্লাজম সমান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়।
৫। নিউক্লিয়াসের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।	৫। কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।
৬। ক্যারিওকাইনেসিস সাইটোকাইনেসিসের আগে ঘটে।	৬। সাইটোকাইনেসিস ক্যারিওকাইনেসিসের পরে ঘটে।

VVI

মাইটোসিসের গুরুত্ব বা তাৎপর্য বা প্রয়োজনীয়তা (Significance of Mitosis)

জীবদেহে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো।

১। দেহ গঠন ও দৈহিক বৃদ্ধি : বহুকোষী জীবে জাইগোট নামক একটি মাত্র কোষের মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বহুকোষী জীবদেহ গঠিত হয় এবং এর দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে।

২। বংশবৃদ্ধি : কতক এককোষী সুকেন্দ্রিক (eukaryotic) জীবে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি ঘটে (যেমন- *Chlamydomonas*)।

৩। জননাঙ্গ সৃষ্টি ও জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি : মাইটোসিস বিভাজনের ফলেই বহুকোষী জীবের জননাঙ্গ সৃষ্টি হয়, ফলে বংশবৃদ্ধির ক্রমধারা বজায় রাখতে পারে। জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে এ প্রক্রিয়া আবশ্যক।

৪। নির্দিষ্ট আকার-আয়তন রক্ষা : এ বিভাজন প্রক্রিয়ার ফলে কোষের স্বাভাবিক আকার, আকৃতি, আয়তন ইত্যাদি গুণাগুণবজায় থাকে।

৫। নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্য রক্ষা : সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ (অঙ্গাণু) ও রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে নিউক্লিয়াস কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের কারণে প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যকার পরিমাণগত ও নিয়ন্ত্রণগত ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

৬। ক্রোমোসোমের সংখ্যার সমতা রক্ষা : মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কারণে দেহের সব দেহকোষে সমসংখ্যক ও সমগুণ সম্পন্ন ক্রোমোসোম থাকে।

৭। ক্ষতস্থান পূরণ : বহুকোষী জীবদেহে সৃষ্ট যেকোনো ক্ষতস্থান মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পূরণ হয়। [MAT : 21-22]

৮। ক্রমাগত ক্ষয়পূরণ : জীবকোষে কিছু কিছু কোষ আছে যাদের আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট। এসব কোষ বিনষ্ট হলে মাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের পূরণ ঘটে।

৯। পুনরুৎপাদন : কিছু কিছু অতিপ্রয়োজনীয় কোষের জীবনকাল অতি সীমিত (যেমন- মানুষের লোহিত রক্তকোষ, কর্নিয়ার বাইরের কোষ)। এগুলো ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে এ কোষগুলোর পুনরুৎপাদন ঘটে।

১০। গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা : এ প্রকার বিভাজনের ফলে জীবজগতের গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

১১। অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস-এর কুফল : অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস-এর ফলে টিউমার, ক্যান্সার সৃষ্টি ইত্যাদি হয়।

অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস

কোষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন ফ্যাক্টর দ্বারা মাইটোসিস নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কারণে এ নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর হলে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস ঘটে থাকে, ফলে **টিউমার ও ক্যান্সার** সৃষ্টি হয়। ক্যান্সার অর্থ হলো 'crab' অর্থাৎ কাঁকড়া। ক্যান্সার কোষ আশপাশে ছড়িয়ে গেলে কাঁকড়ার সাঁড়াসি পায়ের মতোই দেখায়। ক্যান্সার কোষে সাইক্লিন-CDK এর নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়ে যায়। P^{53} নামক প্রোটিন সাধারণত কোষকে বিভাজন হতে বিরত রাখায় ভূমিকা রাখে। এটি defective হলে (মানুষের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক কোষেই defective P^{53} আছে) কোষ চক্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। মানুষের অধিক হারে ক্যান্সার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবত এটি একটি কারণ। কোষ বিভাজনের জন্য কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর কাজ করে। ক্যান্সার কোষ তাদের গ্রোথ ফ্যাক্টর নিজেরাই তৈরি করে নেয়, অথবা বিভাজনের জন্য এদের কোনো গ্রোথ ফ্যাক্টর লাগে না। কোষ চক্র নিয়ন্ত্রণকারী দুধরনের প্রোটিন হচ্ছে–প্রোটিন কাইনেজ ও সাইক্লিন। টিউমার সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় **Oncogenesis**। কোষ চক্র বিনষ্টকারী জিন হলো Oncogene. যেসব রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে তা হলো Mutagens। মিউটাজিনিক পদার্থই Carcinogenic (ক্যান্সার সৃষ্টিকারক) হয়। দেহের বিভিন্ন অংশে টিউমার ছড়িয়ে পড়া হলো Metastasis। বিভিন্ন প্রকার প্যাপিলোমা ভাইরাস ক্যান্সার তৈরি করে। এ ভাইরাসের B_6 ও B_7 জিন দুটি ক্যান্সার তৈরি করে।

কোষের মৃত্যু : বহুকোষী জীবদেহে প্রতিদিন অনেক কোষের মৃত্যু ঘটে। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তা পূরণ করতে হয়। মানবদেহে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কোষের মৃত্যু ঘটে দুটি উপায়ে কোষে মৃত্যু ঘটে। একটি হলো **Necrosis**, অপরটি হলো **Apoptosis.**

MAT: 24-25

i. **Necrosis :** পুষ্টির অভাব হলে অথবা বিষাক্ত দ্রব্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোষ মরে যায়।

ii. **Apoptosis :** এটি হলো কোষের জেনেটিক্যালি নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু। কোনো কোষ জীবদেহ বা অঙ্গের জন্য এখন প্রয়োজন নেই তাই এদের ধ্বংস হতে হয়। যেমন মানুষের ভ্রূণাবস্থায় পাতলা টিস্যু দিয়ে হাতের সকল আঙ্গুল লাগানো থাকে। পরে মাঝখানের টিস্যু ধ্বংসের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে পাঁচটি আঙ্গুল পৃথক হয়। একটি কোষ যত বেশি দিন বাঁচবে ততই তা ক্ষতিগ্রস্ত (damage) হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় যা থেকে সহজেই ক্যান্সার হতে পারে। তাই এদের ধ্বংস বা মৃত্যু হওয়া দরকার। এটি সাধারণত আমাদের রক্ত এবং অন্ত্রের এপিথেলিয়াল কোষের ব্যাপারে প্রযোজ্য, কারণ এরা প্রতিনিয়ত উচ্চমাত্রার বিষাক্ত পদার্থে উন্মুক্ত হয়। আমাদের দেহে প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ কোষের মৃত্যু হয়, তার অধিকাংশই রক্ত কোষ ও অন্ত্রের এপিথেলিয়াম লাইনিং-এর কোষ।

মাইটোটিক ইনডেক্স (Mitotic index) : কোনো টিস্যুর মোট কোষ সংখ্যা এবং মাইটোসিসরত কোষ সংখ্যার অনুপাত হলো মাইটোটিক ইনডেক্স (MI)।

$$MI = \frac{\text{মাইটোসিসরত কোষ সংখ্যা}}{\text{মোট কোষ সংখ্যা}}$$

চিকিৎসকের জন্য MI প্রয়োজন পড়ে। MI থেকে চিকিৎসক অনুমান করতে পারেন টিউমার কত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাবে এবং এর জন্য কী ধরনের ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন। উচ্চ MI বলে দেয় এটি দ্রুত বর্ধনশীল টিউমার।

(READING)

অ্যামাইটোসিস ও মাইটোসিসের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অ্যামাইটোসিস	মাইটোসিস
১। দশা বা পর্যায়	এটি সরল প্রকৃতির। কোষ বিভাজনে-এর কোনো দশা বা পর্যায় নেই।	এটি তুলনামূলকভাবে জটিল ও ধারাবাহিক গতিশীল প্রক্রিয়া। এর বিভিন্ন দশা রয়েছে।
২। নিউক্লিয়াসের বিভাজন	এ বিভাজনে নিউক্লিয়াস সরাসরি বিভাজিত হয়।	এ বিভাজনে নিউক্লিয়াস বিভিন্ন দশার মাধ্যমে বিভাজিত হয়।
৩। বিভাজন প্রক্রিয়া	এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম প্রায় একত্রে বিভাজিত হয়।	এক্ষেত্রে প্রথমে নিউক্লিয়াসের (ক্যারিও-কাইনেসিস) এবং পরে সাইটোপ্লাজমের (সাইটোকাইনেসিস) বিভাজন ঘটে।
৪। ফলাফল	এর মাধ্যমে এককোষী জীবেরা বংশবিস্তার ঘটায়, দৈহিক বৃদ্ধিতে এর কোনো ভূমিকা নেই।	এর মাধ্যমে এককোষী জীবদের বংশবিস্তার এবং বহুকোষী জীবদেহে বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ প্রভৃতি ঘটে।
৫। বিভাজনের প্রকৃতি	এ বিভাজনকে প্রত্যক্ষ বিভাজন বলে।	এ বিভাজনকে পরোক্ষ বিভাজন বলে।
৬। উদাহরণ	ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি এককোষী জীবদেহে অ্যামাইটোসিস দেখা যায়।	উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে মাইটোসিস দেখা যায়।

৩। মায়োসিস বা হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন

(Meiosis or Reductional Cell Division)

মায়োসিস কোষ বিভাজন ডিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষে (অথবা হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদে জাইগোটে) ঘটে থাকে। এ বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস একটি জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে দু'বার বিভক্ত হয় এবং বিভক্তির ফলে সৃষ্ট চারটি কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। তাই এ প্রকার কোষ বিভাজনকে **মায়োসিস বা হ্রাসমূলক কোষ বিভাজন বলে**। এ প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস দু'বার এবং ক্রোমোসোম একবার বিভক্ত হয়। **যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াস পর পর দু'বার এবং ক্রোমোসোম মাত্র একবার বিভাজিত হয়ে মাতৃকোষের ক্রোমোসোমের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোমযুক্ত চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে তাকে মায়োসিস কোষ বিভাজন বলে।** গ্রিক *Meious* (to lessen-হ্রাস করা) হতে Meiosis শব্দের উদ্ভব ঘটে।

সহজভাবে বলা যায়, যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষ থেকে চারটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয় এবং নতুন সৃষ্ট কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায় তা-ই মায়োসিস।

আবিষ্কার ও নামকরণ : **বেনেডিন** (E. V. Beneden) এবং **হাউসার** (Houser) *Ascaris* কৃমির গ্যামিটে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন ১৮৮৩ সালে। **স্ট্রাসবুর্গার** (Strasburger) ১৮৮৮ সালে পুষ্পক উদ্ভিদের জনন মাতৃকোষের ক্রোমোসোমে হ্রাসমূলক বিভাজন লক্ষ্য করেন। ১৯০৫ সালে **ফার্মার** (J. B. Farmer) ও **মুর** (J. E. Moore) সর্বপ্রথম হ্রাসমূলক বিভাজনকে Miosis (মিয়োসিস বা মিওসিস) বলেন। **Boveri** (বোভেরী) সর্বপ্রথম গোলকৃমির (Round worm) জননাঙ্গে মায়োসিস কোষ বিভাজন প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তীতে গ্রিক মূল শব্দের (meioum= to lessen) ওপর ভিত্তি করে এর বানান করা হয় Meiosis অর্থাৎ **মায়োসিস**। **এখন এটি মায়োসিস হিসেবেই উচ্চারিত হয়।**

কোথায় হয় ? মায়োসিস সর্বদা জনন মাতৃকোষে (meiocyte) সম্পন্ন হয়। কখনো দৈহিক কোষে হয় না এবং সর্বদাই 2n সংখ্যক ক্রোমোসোমবিশিষ্ট কোষে হয়। **নিম্নশ্রেণির হ্যাপ্লয়েড জীবে মায়োসিস হয় নিষেকের পর জাইগোটে (2n), আর উচ্চশ্রেণির ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিস হয় নিষেকের পূর্বে জনন মাতৃকোষ হতে গ্যামিট সৃষ্টিকালে।** জীব অনুযায়ী মায়োসিসের সময়কাল ভিন্ন হয়। যেমন—

১। ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিস ঘটে গ্যামিট গঠনের ঠিক পূর্বে অর্থাৎ যখন শুক্রাণু– মাতৃকোষ থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় বা ডিম্বাণু– মাতৃকোষ থেকে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়। এ ধরনের মায়োসিসকে **টার্মিনাল** (terminal) মায়োসিস বলে।

২। সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মায়োসিস পরাগধানীর মধ্যে মাইক্রোস্পোর (microspore) বা পুংরেণু গঠনের সময় এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে মেগাস্পোর (megaspore) বা স্ত্রীরেণু গঠনের সময় ঘটে। এ ধরনের মায়োসিসকে **স্পোরিক** (sporic) মায়োসিস বলে।

৩। কয়েক প্রকার ছত্রাক ও শৈবালের দেহে মায়োসিস নিষেকের ফলে সৃষ্ট জাইগোট গঠনের পরে ঘটে। এ প্রকার মায়োসিসকে **জাইগোটিক** (zygotic) মায়োসিস বলে।

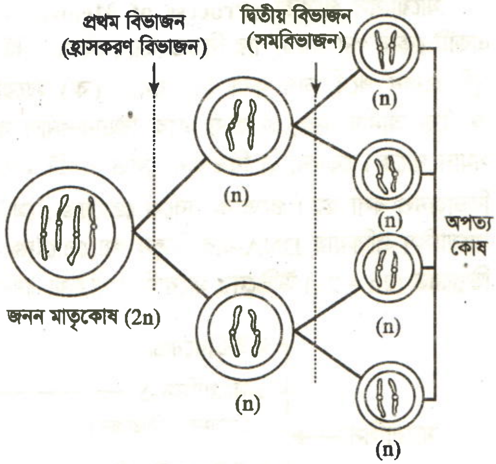

চিত্র ২.৭ : মায়োসিসের প্রথম বিভাজনে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস ও দ্বিতীয় সমবিভাজনে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টির চিত্ররূপ

জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় মায়োসিসের অবদান

উচ্চশ্রেণির জীবে মায়োসিসের ফলে একটি জনন মাতৃকোষ হতে চারটি জনন কোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেক কোষে মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। আমরা জানি, দুটি জননকোষ (পুং জননকোষ এবং স্ত্রী জননকোষ) একসাথে মিলিত হয়ে **জাইগোট** সৃষ্টি করে। জাইগোট পরে বার বার মাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে একটি ভ্রূণ এবং ভ্রূণের কোষগুলো আরও বিভাজিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি করে। কাজেই জননকোষগুলোতে ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পেয়ে জনন মাতৃকোষের অর্ধেক না হলে তাদের যৌন মিলনের ফলে সৃষ্ট জীবে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। হ্যাপ্লয়েড জীবে (যেমন–শৈবাল) দুটি গ্যামিটের যৌন মিলনের ফলে সৃষ্ট জাইগোটেও ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। যেহেতু ক্রোমোসোমই জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন (gene) বহন করে, সেহেতু ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেলে সন্তান-সন্ততি আর তার পিতা-মাতার গুণসম্পন্ন হবে না এবং প্রত্যেকটি প্রজাতিতে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে। পরিণামে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। **ডিপ্লয়েড জীবে গ্যামিট সৃষ্টিকালে জনন মাতৃকোষে এবং হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটে মায়োসিস হয় বলেই প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থাকে এবং জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়।**

মায়োসিসের বৈশিষ্ট্য : মায়োসিসের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১। ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিস সাধারণত জনন মাতৃকোষে হয়ে থাকে।

২। এ ধরনের কোষবিভাজনে নিউক্লিয়াস দু'বার বিভক্ত হয় কিন্তু ক্রোমোসোম মাত্র একবার বিভক্ত হয়। ফলে নতুন সৃষ্ট কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক হয়।

৩। প্রোফেজ-১ দীর্ঘস্থায়ী বিধায় একে ৫টি উপ-পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে।

৪। হোমোলোগাস ক্রোমোসোম জোড়া বেঁধে বাইভেলেন্ট সৃষ্টি করে।

৫। কায়াজমা সৃষ্টি ও ক্রসিংওভার হয় বলে হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে **'জিন'** বিনিময় ঘটে।

৬। একটি মাতৃকোষ (2n) হতে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়।

৭। ক্রোমোসোমের স্বতন্ত্র বিন্যাস ঘটে।

৮। ক্রসিংওভার ও ক্রোমোসোমের স্বতন্ত্র বিন্যাস ঘটে বলে এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কোষগুলো কখনো মাতৃকোষের সমগুণ সম্পন্ন হয় না।

৯। মায়োসিস শেষে সৃষ্ট নতুন কোষে নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। বংশগতিতে বিশেষত প্রকরণ সৃষ্টিতে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। **মায়োসিস হলো জীবসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির একটি প্রধান উপায়।**

মায়োসিস প্রক্রিয়া (Process of Meiosis) : মায়োসিস একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মায়োসিস প্রক্রিয়ায় একটি কোষ পর পর দু'বার বিভক্ত হয়। কোষ, নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোমের বিভক্তির ওপর ভিত্তি করে মায়োসিস প্রক্রিয়াকে দুটি প্রধান পর্বে ভাগ করা হয়; যথা– **(ক) মায়োসিস-১** এবং **(খ) মায়োসিস-২**। মায়োসিস-১-এ ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেকে আনীত হয়, এ জন্য একে **রিডাকশনাল বা হ্রাসমূলক** বিভাজনও বলা হয়। মায়োসিস-২-এ ক্রোমোসোম সংখ্যা সমান থাকে। কেননা এ বিভাজন মূলত একটি মাইটোটিক বিভাজন প্রক্রিয়া। এজন্য একে **ইকোয়েশনাল বা সমীকরণিক** বিভাজনও বলা হয়। প্রত্যেক পর্বকে প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ–এ চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। মায়োসিস প্রক্রিয়ায় DNA-এর দ্বিত্বন হয় প্রোফেজ-১ এর পূর্বে। পলিপ্লয়েড উদ্ভিদে মায়োসিস অত্যন্ত জটিল বলে এখানে ডিপ্লয়েড (2n = 2x) উদ্ভিদের মায়োসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

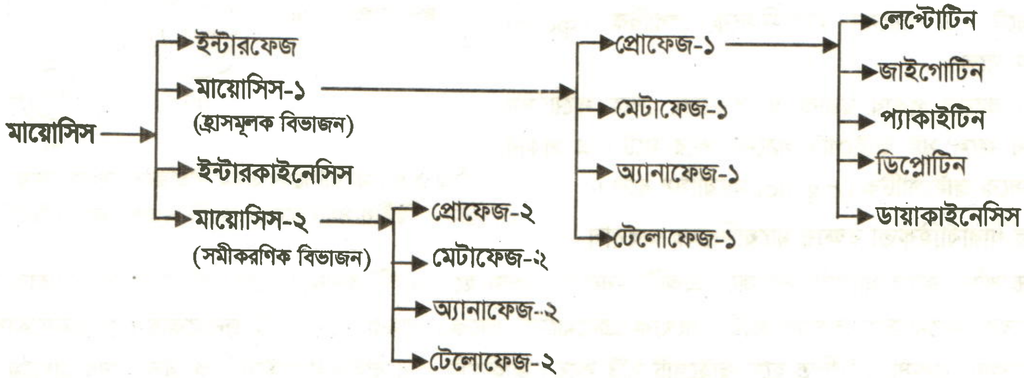

(ক) মায়োসিস-১ (Meiosis-1) বা প্রথম মায়োটিক বিভাজন (First Meiotic Division)

মায়োসিস কোষ বিভাজনে মায়োসিস-১-ই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ পর্যায়েই ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেকে হ্রাস পায় এবং সমসংস্থ ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশের পারস্পরিক বিনিময় (ক্রসিংওভার) ঘটে। মায়োসিস-১-কে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়; যথা– প্রোফেজ-১, মেটাফেজ-১, অ্যানাফেজ-১ ও টেলোফেজ-১। পর্যায়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

(১) প্রোফেজ-১ (Prophase-1) : মায়োসিস-১ এর প্রথম পর্যায় হলো প্রোফেজ-১। প্রোফেজ-১ পর্যায়টি অনেক দীর্ঘ হয়। মানুষের শুক্রাশয়-এ মায়োটিক প্রোফেজ-এ সময় লাগে এক সপ্তাহ, বিভাজনটি সম্পন্ন হতে সময় লাগে প্রায় এক মাস। প্রোফেজ শুরু হওয়ার আগেই DNA প্রতিলিপিত হয়, তবে দৃষ্টিগোচর হয় না। এ পর্যায়টি অত্যন্ত জটিল ও তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী বিধায় একে লেপ্টোটিন, জাইগোটিন, প্যাকাইটিন, ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিস–এই পাঁচটি উপ-পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রোফেজ-১ এর উপ-পর্যায়গুলো নিম্নরূপ :

(ক) লেপ্টোটিন (Leptotene-গ্রিক শব্দ *leptos* = fine, thin- চিকন, পাতলা; + *tene* = thread- সুতা বা তন্তু) : নিউক্লিয়াসের জলবিয়োজনের মাধ্যমেই শুরু হয় লেপ্টোটিন উপ-পর্যায়। ক্রমাগত জলবিয়োজনের ফলে চিকন সুতার ন্যায় ক্রোমোসোমগুলোও ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও পুরু হতে থাকে এবং অধিকতর রঞ্জক ধারণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। ফলে

ক্রোমোসোমগুলো আলোক অণুবীক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয় এবং ক্রোমোসোমে বহু ক্রোমোমিয়ার (স্থানীয়ভাবে DNA কয়েলিং এর জন্য মোটা ব্যান্ড হিসেবে লক্ষ্যণীয়) দেখা যায়। ক্রোমোসোমগুলো অবিভক্ত ও দীর্ঘ থাকে। জলবিয়োজন ও ক্রোমোসোম সংকোচন চলতে থাকে। [প্রাণিকোষে এ উপ-পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ারগুলো সাধারণত নিউক্লিয়ার এনভেলপের সন্নিকটে এক স্থানে এসে জড়ো হওয়ায় ক্রোমোসোমগুলোকে একত্রে একটি ফুলের তোড়ার মতো দেখায়। তাই অনেক সময় একে **বুকে** (bouquet) বলা হয় (বিজ্ঞানী ডার্লিংটন)। প্রাণিকোষে ক্রোমোসোমের **পোলারাইজড** বিন্যাস ঘটে।]

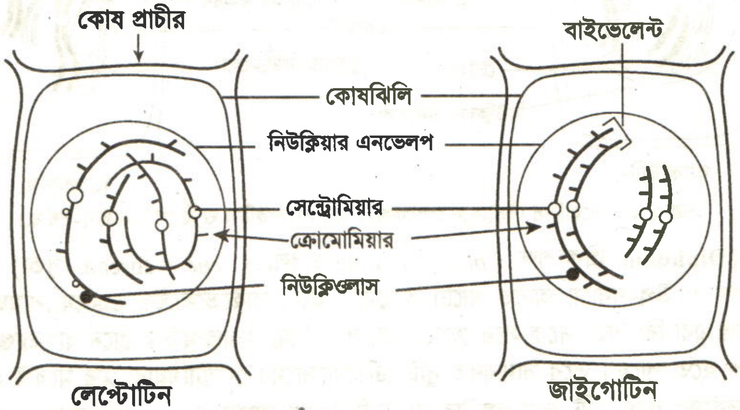

চিত্র ২.৮ : মায়োসিস বিভাজনে প্রোফেজ-১ এর লেপ্টোটিন ও জাইগোটিন উপ-পর্যায়।

(খ) জাইগোটিন (Zygotene-গ্রিক শব্দ *zygos* = yoke-জোয়াল, জোড়া; + *tene* = thread- সুতা) : এ উপ-পর্যায়ে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম* (একটি 'মাতা' হতে আগত এবং অন্যটি 'পিতা' হতে আগত) একটি জোড়ার সৃষ্টি করে। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণই এ জোড়া সৃষ্টির কারণ। জোড়া সৃষ্টি কার্য ক্রোমোসোমদ্বয়ের একপ্রান্ত হতে আরম্ভ হয়ে অন্যপ্রান্তে শেষ হতে পারে, অথবা সেন্ট্রোমিয়ারদ্বয়ের মধ্যে আরম্ভ হয়ে দু'দিকে ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে পারে, অথবা স্থানে স্থানে আরম্ভ হতে পারে। **দুটি হোমোলোগাস (সমসংস্থ) ক্রোমোসোমের মধ্যে জোড় সৃষ্টি হওয়াকে সিন্যাপসিস (synapsis) বলে**। প্রতিটি জোড়বাঁধা ক্রোমোসোম জোড়াকে (যুগলকে) **বাইভেলেন্ট** (bivalent) বলে। কোষে যতগুলো ক্রোমোসোম থাকবে তার অর্ধেক সংখ্যক বাইভেলেন্ট সৃষ্টি হবে। নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলপ তখনো দেখা যায়। প্রাণিকোষের ক্ষেত্রে সেন্ট্রিওলে বিভক্তির সূচনা ঘটে।

(গ) প্যাকাইটিন (Pachytene-গ্রিক শব্দ *pachys* = thick-মোটা, পুরু ; + *tene* = thread-সুতা) : ক্রমাগত সংকোচনের ফলে এ উপ-পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলোকে আরও খাটো ও মোটা দেখা যায়। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম বাইভেলেন্টের প্রতিটি ক্রোমোসোমকে সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত অনুদৈর্ঘ্যে দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত দেখা যায়, অর্থাৎ প্রতি বাইভেলেন্টে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার এবং চারটি ক্রোমাটিড থাকে। এ অবস্থাকে **টেট্রাড** বলে। প্যাকাইটিনের পূর্বে প্রতিটি ক্রোমোসোমের দুটি করে ক্রোমাটিড দৃষ্টিগোচর হয় না। **একই ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিডকে সিস্টার ক্রোমাটিড** বলে এবং **একই জোড়ার দুটি ভিন্ন ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডকে নন-সিস্টার ক্রোমাটিড** বলে। এ উপ-পর্যায়ের শেষের দিকে বাইভেলেন্টের যেকোনো দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড সম্ভবত একই স্থানে ভেঙে গিয়ে পুনরায় একটির সাথে অন্যটির জোড়া লাগে। ফলে ঐ জোড়ার স্থানে একটি ইংরেজি 'X' আকৃতির বা ক্রস চিহ্নের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। **দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের 'X' আকৃতির বা ক্রস চিহ্নের মতো জোড়াস্থলকে একবচনে কায়াজমা** (Gk. *Chiasma* = cross) **এবং বহুবচনে কায়াজমাটা** বলে। নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে পরস্পর অংশের বিনিময়কে **ক্রসিং ওভার** বা **ক্রস ওভার** বলে। কোনো কোনো বাইভেলেন্টে (বিশেষ করে যদি খাটো হয়) কায়াজমা একবারেই উৎপন্ন না হতে পারে; আবার কোনো কোনো বাইভেলেন্টে (বিশেষ করে যদি দীর্ঘ

(DAT: 17-18)

*ডিপ্লয়েড জীবে আকার, আকৃতি, ক্রোমোমিয়ারের অবস্থান ও সংখ্যা প্রভৃতি দিক হতে দুটি ক্রোমোসোম একই রকম থাকে। এদের একটিকে অপরটির হোমোলোগ (সমসংস্থ) বলা হয় এবং একত্রে দু'টিকে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম বলা হয়। দুটি হোমোলোগের যেকোনো নির্দিষ্ট অবস্থানে অবস্থিত জিন দুটি (এলিল) একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে। সমরূপ ক্রোমোমিয়ারের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে।

হয়) একাধিকও হতে পারে। কায়াজমাটা সৃষ্টির ফলে যে ক্রসিংওভার হয় তাতে ক্রোমোসোমে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পর্যায়েও নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলপ দেখা যায়।

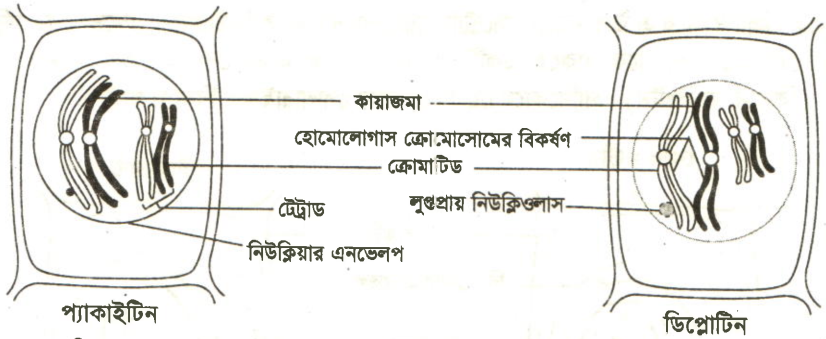

চিত্র ২.৯ : মায়োসিস বিভাজনে প্রোফেজ-১ এর প্যাকাইটিন ও ডিপোটিন উপ-পর্যায়।

(ঘ) ডিপ্লোটিন (**Diplotene**-গ্রিক শব্দ *diplos* = double-ডাবল; + *tene* = thread- সুতা) : ক্রমাগত সংকোচনের ফলে ক্রোমোসোমগুলো এ উপ-পর্যায়ে আরও খাটো ও মোটা হয়। বাইভেলেন্টের ক্রোমোসোমদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষণ শুরু হয়। ফলে এরা বিপরীত দিকে সরে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু কায়াজমাটার স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ বিকর্ষণ একই সঙ্গে কয়েক স্থানে শুরু হতে পারে। তবে সাধারণত দুটি ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ারদ্বয়ের মধ্যেই প্রথম এবং ব্যাপকভাবে বিকর্ষণ শুরু হয়। বিকর্ষণের ফলে দুটি কায়াজমাটার মধ্যবর্তী অংশে **লুপের** (loop) সৃষ্টি হয়। কায়াজমাটাগুলো স্পষ্ট হয় এবং ক্রমান্বয়ে প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে। কায়াজমার প্রান্তের দিকে সরে যাওয়াকে **প্রান্তীয়করণ** (terminalization) বলে। দুই বা ততোধিক বাহু পরস্পর আবর্তনের (rotatory movement) ফলে পাশাপাশি লুপ ৯০° কোণ করে অবস্থান করে। একটি মাত্র কায়াজমা থাকলে এটি ১৮০° হতে পারে।

(ঙ) ডায়াকাইনেসিস (**Diakinesis**-গ্রিক *Dia* = across- অপর পাশে, বিপরীত দিকে; *kinesis*- সমাবেশ, চলন) : এ উপ-পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলো আরও খর্বাকৃতি ও মোটা হয়। প্রান্তীয়করণ তখনও চলতে থাকে। বাইভেলেন্টের প্রতি ক্রোমোসোমের ওপর ধাত্র জমা হয় বলে তখন আর ক্রোমাটিডে বিভক্ত দেখা যায় না। এক সময় বাইভেলেন্টগুলো নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রস্থল হতে পরিধির দিকে চলে আসে। এ উপ-পর্যায়ের শেষ দিকে নিউক্লিওলাস অদৃশ্য হয়ে যায় এবং নিউক্লিয়ার এনভেলপ-এর অবলুপ্তি ঘটে এবং প্রাণিকোষে সেন্ট্রিওল মেরুতে পৌঁছে যায়।

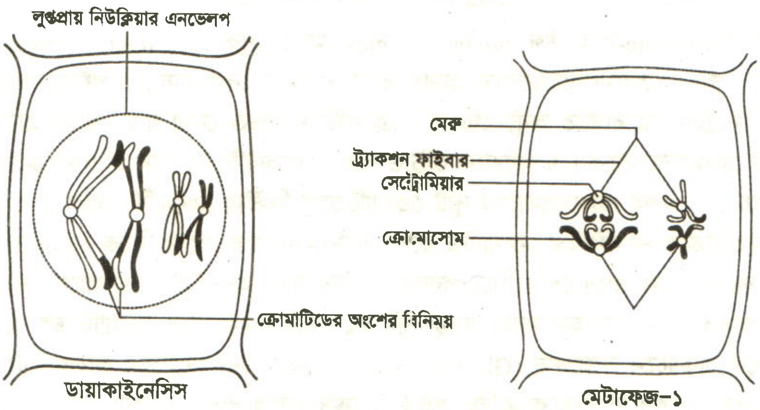

চিত্র ২.১০ : মায়োসিস বিভাজনে প্রোফেজ-১ এর ডায়াকাইনেসিস ও মেটাফেজ-১ পর্যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীদেরকে পাঁচটি দলে ভাগ করে দিতে হবে। প্রত্যেক দলকে প্রোফেজ-১ এর পাঁচটি উপ-পর্যায়ের যেকোনো একটি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। পরদিন ক্লাসে প্রত্যেক দল তাদের জন্য নির্দিষ্ট উপ-পর্যায় উপস্থাপন করবে। পোস্টার পেপারে একটি চার্টও করা যেতে পারে।

(২) মেটাফেজ-১ (Metaphase-1) : বাইভেলেন্টের প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ার স্ব-স্ব মেরুর দিকে এবং বিষুবীয় রেখা হতে সমদূরে অবস্থান করে। কতিপয় ট্র্যাকশন ফাইবারের সাথে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্ত হয়। **মাইটোটিক মেটাফেজের মতো এ পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় না।** ক্রোমোসোমের মধ্যে লুপ সৃষ্টি হয়। ক্রোমোসোমগুলো আরও খাটো ও মোটা হয়। বাইভেলেন্টের ক্রোমোসোমদ্বয় ট্র্যাকশন ফাইবারের টানে পৃথক হতে থাকলে এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

(৩) অ্যানাফেজ-১ (Anaphase-1) : এ পর্যায়ে এসে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পৃথক হয়ে যায় এবং বাইভেলেন্টের দুটি ক্রোমোসোম (দুটি ক্রোমাটিড নয়) বিপরীতমুখী দুটি মেরুর দিকে ধাবিত হয়। ক্রোমোসোম সূত্রের সংকোচন, কাণ্ডদেহের প্রসারণ ও অন্যান্য কারণে ক্রোমোসোমের মেরুমুখী চলন ঘটে। এরূপ চলনকালে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী এবং বাহুদ্বয় অনুগামী হয়। ফলে ক্রোমোসোমগুলোকে ইংরেজি V (মেটাসেন্ট্রিক), L (সাবমেটাসেন্ট্রিক), J (এক্রোসেন্ট্রিক) এবং I (টেলোসেন্ট্রিক) অক্ষরের মতো দেখায়। ট্র্যাকশন ফাইবারের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেতে থাকে।

উভয় মেরুতে প্রতিটি বাইভেলেন্টের **একটি অবিভক্ত পূর্ণাঙ্গ ক্রোমোসোম পৌঁছে বলে** প্রতি মেরুতে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতি মেরুতে ক্রোমোসোম সংখ্যা দাঁড়ায় **$2n$ এর পরিবর্তে n।**

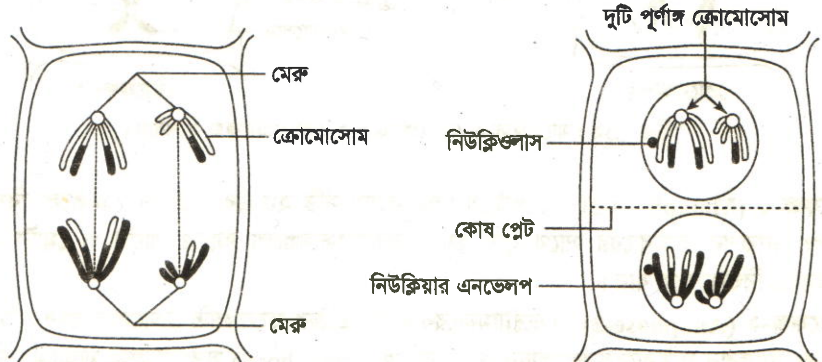

চিত্র ২.১১ : মায়োসিস-এর অ্যানাফেজ-১ এবং টেলোফেজ-১ পর্যায়।

(৪) টেলোফেজ-১ (Telophase-1) : টেলোফেজ-১ হলো মায়োসিস-১ এর শেষ পর্যায়। এ পর্যায়ে মেরুতে অবস্থিত n সংখ্যক ক্রোমোসোমের চারদিকে আবার নিউক্লিয়ার এনভেলপ এবং অভ্যন্তরে নিউক্লিওলাসের আবির্ভাব ঘটে। নিউক্লিয়াসে জলযোজন ঘটে, ফলে ক্রোমোসোমগুলো ক্রমান্বয়ে সরু হতে থাকে। কাজেই রঞ্জন ধারণক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ক্রমান্বয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। প্রজাতির বিভিন্নতা অনুসারে টেলোফেজ-১ পর্যায়ে সাইটোকাইনেসিস ঘটতে পারে অর্থাৎ কোষের বিষুবীয় অঞ্চলে কোষপ্লেট সৃষ্টির মাধ্যমে কোষস্থ সাইটোপ্লাজম সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষে পরিণত হতে পারে। **অথবা**, কোষপ্লেট সৃষ্টি না হয়েই মায়োসিস-২ এর প্রোফেজ পর্যায় শুরু হয়ে যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, মায়োসিসের টেলোফেজ-১ শেষে যে দুটি অপত্যকোষ সৃষ্টি হয় তার প্রতিটিতে n সংখ্যক ক্রোমোসোম ($2n$ সংখ্যক ক্রোমেসোমের পরিবর্তে) থাকে। অনেক প্রজাতিতে টেলোফেজ-১ ঘটে না।

ইন্টারকাইনেসিস (Interkinesis) বা সাইটোকাইনেসিস-১

মায়োসিস প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভক্তির অন্তর্বর্তীকালীন বা মধ্যবর্তী সময়কে **ইন্টারকাইনেসিস** বলে। এ সময়ে প্রয়োজনীয় RNA, প্রোটিন ইত্যাদি সংশ্লেষিত হয়। DNA-র প্রতিরূপ সৃষ্টি হয় না।

(খ) মায়োসিস-২ (Meiosis-2) বা দ্বিতীয় মায়োসিস বিভাজন

মায়োসিস-২ এর প্রধান তাৎপর্য হলো দুটি কোষ হতে চারটি কোষের উৎপত্তি। এটি মূলত মাইটোসিস বিভাজন। মাইটোসিসের সময় DNA অণুর যে প্রতিরূপ সৃষ্টি হয় তা এখানে প্রয়োজন হয় না, কারণ প্রক্রিয়াটি প্রোফেজ-১ ধাপের

আগেই সম্পন্ন হয়ে যায়। মায়োসিস-২-কে প্রোফেজ-২, মেটাফেজ-২, অ্যানাফেজ-২ এবং টেলোফেজ-২ এ চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

(১) প্রোফেজ-২ (Prophase-2) : জলবিয়োজনের ফলে ক্রোমোসোমগুলো পুনরায় সংকুচিত হয়। ফলে খাটো ও মোটা হয়, রঞ্জক ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম হতেই ক্রোমোসোমগুলোকে ক্রোমাটিডে বিভক্ত দেখা যায়। এ পর্যায়ের শেষ দিকে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার এনভেলপ-এর বিলুপ্তি ঘটে বা অদৃশ্য হয়ে যায়।

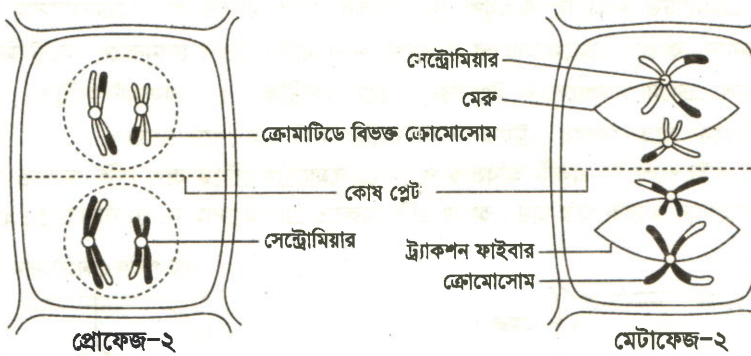

চিত্র ২.১২ : মায়োসিস-২ এর প্রোফেজ-২ এবং মেটাফেজ-২ পর্যায়।

(২) মেটাফেজ-২ (Metaphase-2) : এ পর্যায়ে স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি হয় এবং ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করে এবং ট্র্যাকশন ফাইবারের সাথে যুক্ত হয়। ক্রোমোসোমগুলো আরও খাটো ও মোটা হয়। শেষ পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ার একেবারে বিভক্ত হয়ে যায়।

(৩) অ্যানাফেজ-২ (Anaphase-2) : সেন্ট্রোমিয়ারের পূর্ণ বিভক্তির ফলে প্রতি ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিড সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায় এবং ট্র্যাকশন ফাইবারের সংকোচন ও কাণ্ডদেহের (stem body) সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্রোমাটিডগুলো ধীরে ধীরে বিপরীত মেরুতে পৌঁছায়। মেরুমুখী চলনকালে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমাটিডগুলোকে V, L, J এবং I আকৃতির দেখায়।

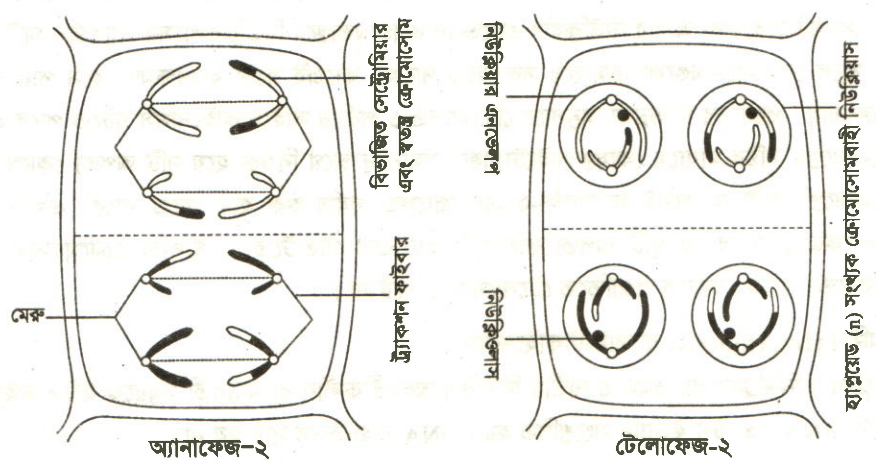

চিত্র ২.১৩ : মায়োসিস-২ এর অ্যানাফেজ-২ এবং টেলোফেজ-২ পর্যায়।

(৪) টেলোফেজ-২ (Telophase-2) : টেলোফেজ-২ হলো মায়োসিস-২ প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়। মেরুতে ক্রোমাটিড তথা ক্রোমোসোমগুলো স্থির হয় এবং এদের চারদিকে নিউক্লিয়ার এনভেলপের আবির্ভাব ঘটে এবং স্যাট ক্রোমোসোমে

নিউক্লিওলাস সৃষ্টি হয়; ফলে দুটি পৃথক নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়। নিউক্লিয়াসে জলযোজন ঘটে, ক্রোমোসোমগুলো সম্প্রসারিত ও সরু হয় এবং রঞ্জক ধারণ ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে, ফলে আর দেখা যায় না।

সাইটোকাইনেসিস-২ : দুটি নিউক্লিয়াসের মাঝখানে কোষঝিল্লি এবং উদ্ভিদকোষে কোষঝিল্লি ছাড়াও কোষপ্রাচীর গঠন হয় এবং সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস তার চারপাশে সাইটোপ্লাজম, কোষঝিল্লি ও কোষপ্রাচীর সহযোগে একটি স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয়। **মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজন শেষে একটি মাতৃকোষ হতে চারটি কোষের সৃষ্টি হয় এবং প্রতি কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়।** সৃষ্ট চারটি কোষ সমগুণ সম্পন্ন হয় না।

মায়োসিসের গুরুত্ব (বা তাৎপর্য বা প্রয়োজনীয়তা) VVI

জীবজগতে মায়োসিসের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, অধিকাংশ জীবের যৌন জনন প্রক্রিয়া এ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এর ফলে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন জীব জন্মলাভ করে। তবে নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। মায়োসিসের গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। **জননকোষ সৃষ্টি :** মায়োসিসের ফলে জননকোষ (গ্যামিট) উৎপন্ন হয়, তাই যৌন জননক্ষম জীবে মায়োসিস না ঘটলে বংশবৃদ্ধি অসম্ভব।

২। **ক্রোমোসোম সংখ্যা ধ্রুব রাখা :** প্রজাতিতে বংশানুক্রমে ক্রোমোসোম সংখ্যা ধ্রুব (constant) রাখা কেবলমাত্র এ প্রক্রিয়ার জন্যই সম্ভব হচ্ছে। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদে জাইগোটে এবং ডিপ্লয়েড উদ্ভিদে জনন মাতৃকোষে মায়োসিস না ঘটলে পিতা-মাতা হতে সন্তান-সন্ততিতে ক্রমাগতভাবে পুরুষানুক্রমে ক্রোমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণ, চারগুণ, আটগুণ, ষোলগুণ—এভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জীবজগতে একটি আমূল পরিবর্তন কবেই ঘটে যেতো এবং পরিণামে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যেতো।

৩। **প্রজাতির স্বকীয়তা ঠিক রাখা :** ক্রোমোসোম সংখ্যা সঠিক রাখার মাধ্যমে বংশানুক্রমে প্রতিটি প্রজাতির স্বকীয়তা রক্ষিত হচ্ছে।

৪। **বৈচিত্র্যের সৃষ্টি :** যৌন প্রজননসম্পন্ন কোনো দুটি জীবই হুবহু এক রকম হয় না। পৃথিবীর প্রায় সাত'শ কোটি মানুষ একই প্রজাতিভুক্ত হয়েও একজন অন্যজন থেকে ভিন্নতর। মায়োসিস প্রক্রিয়ায় গ্যামিটে ক্রোমোসোমের স্বাধীন বিন্যাস এবং ক্রসিংওভারের ফলে পৃথিবীতে এ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে।

৫। **অভিব্যক্তি :** মায়োসিস আনে বৈচিত্র্য, আর বৈচিত্র্য আনে অভিব্যক্তির ধারা ও প্রবাহ।

৬। **গ্যামিট সৃষ্টি ও বংশবৃদ্ধি :** ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় গ্যামিট। আর গ্যামিটের মিলনের মাধ্যমেই যৌন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি ঘটে।

৭। **জনুঃক্রম :** যে সকল জীবের জীবনচক্রে জনুঃক্রম আছে সেখানে মায়োসিস প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

৮। **মেন্ডেলের সূত্র :** মেন্ডেলের সূত্রের ব্যাখ্যা দেয়া মায়োসিস ছাড়া সম্ভব নয়।

ক্রসিংওভার (Crossing over)

মায়োসিস-১ এর প্যাকাইটিন উপ-পর্যায়ে এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোসোমের দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড-এর মধ্যে অংশের বিনিময় হওয়াকে ক্রসিংওভার বলে। ক্রসিংওভারের ফলে ক্রোমোসোমের জিনসমূহের মূল বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে এবং লিঙ্কড জিনসমূহের মধ্যে নতুন সমন্বয় (combination) তৈরি হয়। **থমাস হান্ট মর্গান** (Thomas Hunt Morgan, 1866–1945) ১৯০৯ সালে ভূট্টা উদ্ভিদে প্রথম ক্রসিংওভার সম্পর্কে ধারণা দেন। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

ক্রসিংওভারের কৌশল বা প্রক্রিয়া

(i) প্রথমে দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড একই স্থান বরাবর ভেঙে যায় (**Endonuclease** এনজাইম এর কারণে)।

(ii) পরে একটির অংশের সাথে অপরটির অন্য অংশ পুনরায় জোড়া লাগে **ligase**-এনজাইমের প্রভাবে। ফলে কায়াজমা (X আকৃতি) সৃষ্টি হয়।

(iii) শেষ পর্যায়ে প্রান্তীয়করণের মাধ্যমে ক্রোমাটিডের বিনিময় শেষ হয়। ক্রসিংওভারের ফলে ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে, সাথে সাথে জিনেরও বিনিময় ঘটে (যেহেতু জিন ক্রোমোসোমেই বিন্যস্ত থাকে)। জিন-এর বিনিময়ের ফলে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিনিময় হয়, ফলে জীবে চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে।

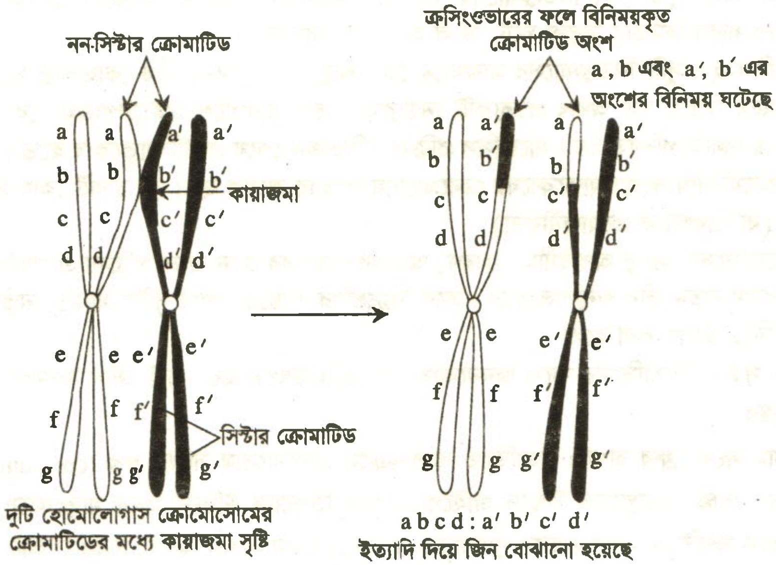

চিত্র ২.১৪ : এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোসোমের দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিংওভার।

ক্রসিংওভারের গুরুত্ব বা তাৎপর্য : কিছু সংখ্যক নিম্নশ্রেণির জীব ছাড়া সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে ক্রসিংওভার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ক্রসিংওভারের গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। ক্রসিংওভারের ফলে দুটি ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে, ফলে জিনগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

২। জিনগত পরিবর্তন সাধনের ফলে সৃষ্ট জীবে বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

৩। বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলে আসে বৈচিত্র্য, সৃষ্টি হয় নতুন পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতা, আবার কখনো সৃষ্টি হয় নতুন প্রজাতি।

৪। ক্রসিংওভারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করা যায়। এভাবেই ফসলি উদ্ভিদের ক্রমাগত উন্নতি সাধন করা হয়।

৫। কৃত্রিম উপায়ে ক্রসিংওভার ঘটিয়ে বংশগতিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব। কাজেই প্রজননবিদ্যায় ক্রসিংওভারের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

৬। গবেষণার ক্ষেত্রেও ক্রসিংওভারের গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, ক্রোমোসোম দেহে জিনের রেখাকার বিন্যাস/অবস্থান প্রমাণে বা ক্রোমোসোম ম্যাপিং-এ ক্রসিংওভার বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়।

৭। ক্রোমোসোমে জিনের অবস্থান নির্ণয়।

৮। জেনেটিক ম্যাপ তৈরি করা।

৯। ক্রোমোসোমে জিনের নতুন বিন্যাসের ফলে জেনেটিক ভ্যারিয়েশন সৃষ্টি হয়।

মাইটোসিস ও মায়োসিসের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মাইটোসিস	মায়োসিস
১। সংঘটন স্থান	জীবের দেহকোষে সংঘটিত হয়। ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।	জীবের জনন মাতৃকোষে সংঘটিত হয়। ফলে গ্যামিট তৈরি হয়।
২। অপত্যকোষের সংখ্যা	মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্যকোষের সৃষ্টি হয়।	মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্যকোষের সৃষ্টি হয়।
৩। অপত্যকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা	এ বিভাজনে উৎপন্ন অপত্যকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার সমান থাকে।	অপত্যকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়।

পার্থক্যের বিষয়	মাইটোসিস	মায়োসিস
৪। ইন্টারফেজ পর্যায়	মাইটোসিসের পূর্বের ইন্টারফেজ পর্যায়টি দীর্ঘস্থায়ী।	মায়োসিসের পূর্বের ইন্টারফেজ পর্যায়টি ক্ষণস্থায়ী।
৫। সিন্যাপসিস ও বাইভেলেন্ট	সমসংস্থ (হোমোলোগাস) ক্রোমোসোমগুলোর মধ্যে আকর্ষণ না থাকার ফলে সিন্যাপসিস ঘটে না। ফলে বাইভেলেন্ট তৈরি হয় না।	সমসংস্থ ক্রোমোসোমগুলোর পারস্পরিক আকর্ষণের কারণে সিন্যাপসিস ঘটে এবং বাইভেলেন্ট তৈরি হয়।
৬। ক্রসিংওভার	ক্রসিংওভার ঘটে না। ফলে জিনের সজ্জাবিন্যাসের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।	ক্রসিংওভার ঘটে। ফলে জিনের সজ্জাবিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে।
৭। বিবর্তন ও জনুঃক্রম	বিবর্তন ও জনুঃক্রমের সাথে মাইটোসিসের কোনো সম্পর্ক নেই।	ক্রসিংওভারের ফলে জীবের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়, যা বিবর্তন ও জনুঃক্রমের পথকে সুগম করে।
৮। ক্রোমোমিয়ার	সাধারণত প্রোফেজ ক্রোমোসোমে ক্রোমোমিয়ার দেখা যায় না।	সাধারণত প্রোফেজ ক্রোমোসোমে ক্রোমোমিয়ার দেখা যায়।
৯। পর্যায় মধ্যক দশা	নিউক্লিয়াসের পর্যায় মধ্যক দশা দীর্ঘস্থায়ী।	নিউক্লিয়াসের পর্যায় মধ্যক দশা স্বল্পস্থায়ী।
১০। সেন্ট্রোমিয়ার	মেটাফেজে সেন্ট্রোমিয়ারসহ ক্রোমোসোম অনুদৈর্ঘ্যে বিভক্ত হয়।	মেটাফেজ-১ এ সেন্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত থাকে।
১১। DNA রেপ্লিকেশন	DNA রেপ্লিকেশন ইন্টারফেজ দশায় সম্পন্ন হয়।	DNA রেপ্লিকেশন প্রোফেজ দশায় ঘটে।
১২। নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম এর বিভাজন	নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোম একবার বিভক্ত হয়।	নিউক্লিয়াস দু'বার ও ক্রোমেসোম একবার বিভক্ত হয়।
১৩। সংঘটিত	হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড এবং পলিপ্লয়েড যেকোনো কোষেই হতে পারে।	কখনো হ্যাপ্লয়েড কোষে হয় না।
১৪। মেন্ডেলের সূত্র	ব্যাখ্যা করা যায় না।	ব্যাখ্যা করা যায়।

ক্রোমোসোম ও জিন-এর আচরণগত মিল

ক্রোমোসোম	জিন
১। ডিপ্লয়েড কোষে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম জোড়া হিসেবে অবস্থান করে।	১। ডিপ্লয়েড কোষে দুটি অ্যালিলিক জিন জোড়া হিসেবে অবস্থান করে।
২। গ্যামিট সৃষ্টিকালে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম জোড়া ভেঙ্গে পৃথক গ্যামিটে যায়।	২। গ্যামিট সৃষ্টিকালে অ্যালিলিক জিন জোড়া ভেঙ্গে পৃথক গ্যামিটে যায়।
৩। গ্যামিট গঠনের সময় ক্রোমোসোমসমূহ স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়।	৩। গ্যামিট গঠনের সময় জিনসমূহ একে অপরের প্রভাবহীনভাবে স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়।
৪। দুটি গ্যামিটের মিলনে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পুনরায় জোড়ার সৃষ্টি করে।	৪। দুটি গ্যামিটের মিলনে অ্যালিলিক জিন একসাথে আসে।
৫। ক্রোমোসোম সকল অবস্থায় তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।	৫। জিনসমূহ সকল অবস্থায় তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

ব্যবহারিক : সম্ভব হলে পেঁয়াজ মূলের অগ্রভাগের স্লাইড করে অণুবীক্ষণযন্ত্রের উচ্চক্ষমতার অবজেক্টিভ-এ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। স্লাইডে মাইটোসিস বিভাজনের বিভিন্ন ধাপ পর্যবেক্ষণ করে খাতায় সুন্দর করে আঁকতে হবে।
মাইটোসিস-এর বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়ের স্লাইড কিনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পর্যায়ের সহজে দৃশ্যমান সুন্দর স্লাইড কিনে তা শিক্ষার্থীদেরকে দেখাতে হবে। স্লাইডগুলো পর্যবেক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীরা মাইটোসিস-এর বিভিন্ন পর্যায় তাদের ব্যবহারিক খাতায় আঁকবে। স্লাইড না পাওয়া গেলে পোস্টার পেপারে মাইটোসিস-এর বিভিন্ন পর্যায়ের সুন্দর চিত্র এঁকে একটি চার্ট প্রস্তুত করতে হবে।

বিশেষ বক্তব্য : বালিতে একটি পেঁয়াজ স্থাপন করে ২/১ দিন পানি দিলে মূল গজাবে। একটি ওয়াচ গ্লাসে কিছু অ্যাসিটোকারমাইন রং এবং ১-২ ড্রপ নর্মাল HCl যোগ করে তাতে পেঁয়াজ মূল রেখে কয়েকবার তাপ দিলে মূলের অগ্রভাগ কালো এবং নরম হবে। পরে কালো ও নরম অগ্রভাগ স্লাইডে নিয়ে কাভার স্লিপ উপরে দিয়ে আস্তে চাপ দিলে মূলের অগ্রভাগের কোষগুলো সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হবে এবং কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায় দেখা যাবে। **পেঁয়াজ মূলে ১৬টি ক্রোমোসোম থাকে।** পাশের চিত্রে পেঁয়াজ মূলের মাইটোসিস বিভাজনের কয়েকটি পর্যায় দেখানো হলো। (উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢা. বি. এর সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স ল্যাবে (১৯৬৯) এ চিত্রটি করা হয়।)

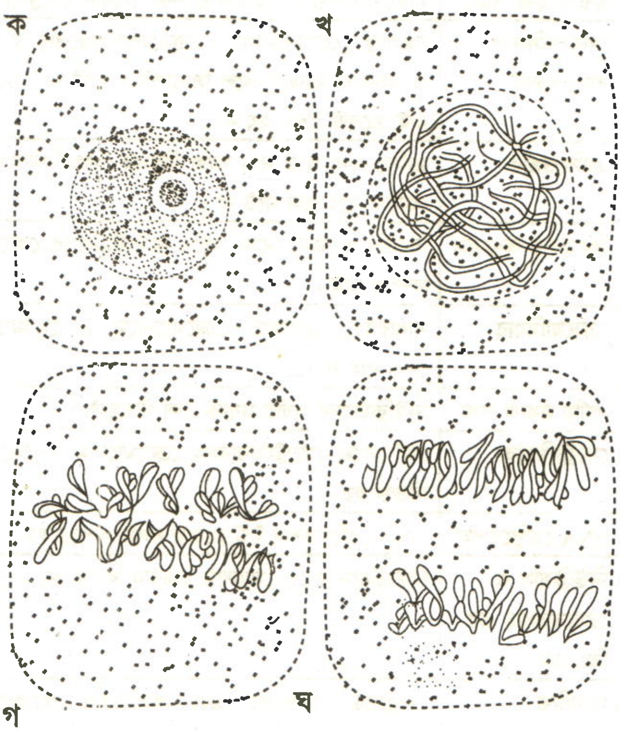

চিত্র ২.১৫ : পেঁয়াজ মূলের মাইটোসিস-এর বিভিন্ন পর্যায় (ক) ইন্টারফেজ, (খ) প্রোফেজ, (গ) মেটাফেজ, (ঘ) অ্যানাফেজ পর্যায়গুলো স্লাইড দেখে হাতে আঁকা।

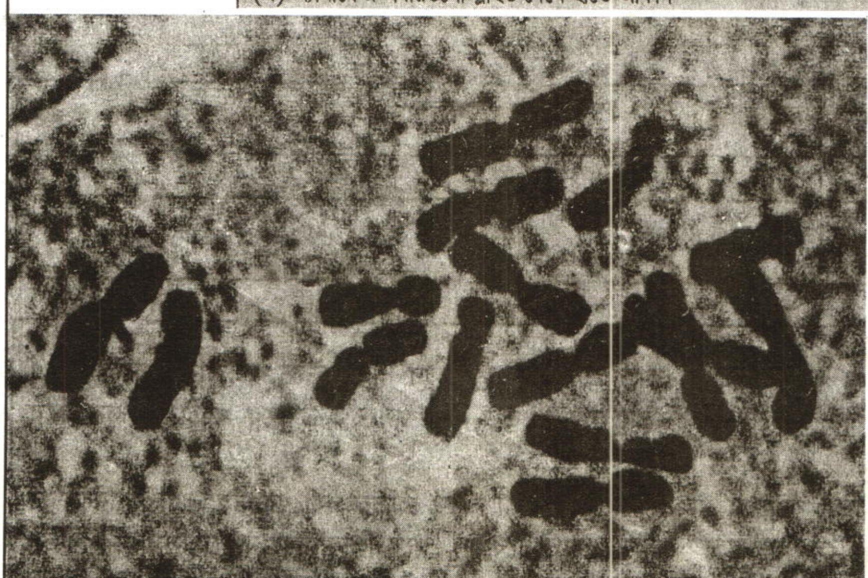

শিক্ষার্থীগণ ১৬টি ক্রোমোসোম গুনে দেখবে। শিক্ষকের সহায়তায় সেন্ট্রোমিয়ার অনুযায়ী ১৬টি ক্রোমোসোমের আকৃতি আঁকতে পারবে।

চিত্র ২.১৬ : পেঁয়াজ মূলের মাইটোসিস-এর মেটাফেজ পর্যায়ের মাইক্রো ফটোগ্রাফ। সাইটোলজি ল্যাব ; ঢা. বি. (২০১৩)

সার-সংক্ষেপ

ক্রসিংওভার : ক্রসিংওভার হলো দুটি ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময়। প্যাকাইটিন উপ-পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে দুটি অংশে বিভক্ত হয়, এর প্রতিটিকে বলা হয় ক্রোমাটিড। একই ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিডকে বলা হয় সিস্টার ক্রোমাটিড। প্যাকাইটিন উপ-পর্যায়ে একজোড়া ক্রোমোসোম এক সাথে থাকে, তাই এক জোড়া ক্রোমোসোমে ৪টি (দুই জোড়া) ক্রোমাটিড থাকে। একই জোড়ার দু'টি ভিন্ন ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডকে বলা হয় নন-সিস্টার ক্রোমাটিড। ক্রসিংওভার হয় দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে। ক্রসিংওভারের মাধ্যমে দুটি ক্রোমোসোমের দুটি ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে। ক্রসিংওভারের ফলেই মাতা-পিতার মিশ্র বৈশিষ্ট্য সন্তানে প্রকাশ পায়।

সিন্যাপসিস : মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ পর্যায়ের জাইগোটিন উপ-পর্যায়ে দুটি করে ক্রোমোসোম (এদেরকে বলা হয় হোমোলোগাস ক্রোমোসোম; এর একটি মাতা হতে আগত এবং অপরটি পিতা হতে আগত) জোড়া করে অবস্থান নেয়। দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মাঝে এরূপ জোড় হওয়াকে বলা হয় সিন্যাপসিস। হোমোলোগাস জোড়াকে বলা হয় বাইভেলেন্ট। সিন্যাপসিস ঘটাই মায়োসিসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এখান থেকেই হ্রাসমূলক বিভাজন তথা ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হওয়ার সূচনা হয়।

সাইটোকাইনেসিস : কোষ বিভাজনের মুখ্য উদ্দেশ্য কোষকে বিভক্তকরণ ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ। কিন্তু নিউক্লিয়াসের বিভাজনই এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কোষের বড়ো অংশই সাইটোপ্লাজম, কাজেই কোষ বিভাজনের শেষ পর্যায়ে কোষের সাইটোপ্লাজমও বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি কোষের সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্যকোষে অবস্থান করাই সাইটোকাইনেসিস অথবা সাইটোপ্লাজমের বিভক্তিই সাইটোকাইনেসিস। সাইটোপ্লাজম ভাগ না হলে কেবল নিউক্লিয়াসের বিভক্তির মাধ্যমে কোষ বিভাজন সমাপ্ত হবে না এবং ফলপ্রসূ হবে না।

কোষচক্র : বিভাজনযোগ্য কোষ সবসময়ই বিভক্ত হতে থাকে। এ বিভক্তির কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায় চক্রাকারে চলতে থাকে। কোষ বিভক্ত হওয়ার আগে একটু বিশ্রাম নেয়, তারপর কোষস্থ DNA রেপ্লিকেট হয়, এরপর আবার বিশ্রাম নেয় এবং শেষ পর্যন্ত কোষ বিভাজন হয়। বিশ্রাম, রেপ্লিকেশন, আবার বিশ্রাম—এ কাজগুলো চক্রাকারে চলতে থাকে। বিভাজন ছাড়া বাকি তিনটিকে বলা হয় প্রস্তুতি পর্যায়। কোষ বিভাজন পর্যায় এবং বিভাজনের প্রস্তুতি পর্যায় পর্যায়ক্রমে চক্রাকারে চলতে থাকে এবং এ চক্রকেই বলা হয় কোষচক্র।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১। বিভাজনের মাধ্যমে মাতৃকোষ থেকে অপত্যকোষ (বিভাজনের ফলে সৃষ্ট নতুন কোষ) সৃষ্টি হয়।

২। Walter Flemming ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে সামুদ্রিক স্যালামান্ডার কোষে প্রথম কোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন।

৩। কোষ বিভাজন তিন প্রকার; যথা— অ্যামাইটোসিস, মাইটোসিস, মায়োসিস।

৪। মাইটোসিসকে সমীকরণিক বিভাজনও বলা হয়।

৫। একটি কোষের সৃষ্টি, এর বৃদ্ধি ও বিভাজন—এ তিনটি পর্যায় যে চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় কোষ চক্র।

৬। একটি জেনেটিক প্রোগ্রাম দ্বারা কোষচক্র নিয়ন্ত্রিত হয়।

৭। সাইক্লিন এবং সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেজ (cdk) যৌগ কোষচক্রের জন্য অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা প্রদান করে।

৮। কোষের একটি বিভাজনসম্পন্ন হওয়ার পর থেকে পরবর্তী বিভাজন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত অবস্থাকে বলা হয় ইন্টারফেজ। অর্থাৎ একটি মাইটোসিস দশা থেকে পরবর্তী মাইটোসিস দশার মধ্যবর্তী সময় হলো ইন্টারফেজ অবস্থা।

৯। স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে ক্রোমোসোমের বিন্যস্ত হওয়াকে বলা হয় **মেটাকাইনেসিস**।

১০। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলা হয় **ক্যারিওকাইনেসিস** এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে বলা হয় **সাইটোকাইনেসিস**।

১১। ক্রোমোসোমের খাটো ও মোটা হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় **কনডেনসেশন** এবং DNA-অণুর যে জটিল কয়েলিং প্রক্রিয়ায় কনডেনসেশন ঘটে থাকে তাকে বলা হয় **সুপারকয়েলিং**।

১২। কোনো টিস্যুর মোট কোষ সংখ্যা এবং মাইটোসিস বিভাজনরত কোষ সংখ্যার অনুপাতকে বলা হয় **মাইটোটিক ইনডেক্স**।

১৩। কোষচক্রে সাইক্লিন CDK-এর নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়ে গেলে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস হয়, এর ফলে টিউমার ও ক্যান্সার সৃষ্টি হয়।

১৪। কোষে p53 নামক প্রোটিন defective হলে কোষচক্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং টিউমার ও ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৫। কোষচক্র বিনষ্টকারী জিন হলো **Oncogene**।

১৬। মায়োসিস কোষ বিভাজনে 2n কোষ হতে n (হ্যাপ্লয়েড) কোষ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেকে হ্রাস পায়।

১৭। মায়োসিস বিভাজনের প্রোফেজ-১ এর লেপ্টোটিন উপপর্যায়ে **ক্রোমোমিয়ার (স্থানীয়ভাবে** DNA কয়েলিং-এর ফলে সৃষ্ট মোটা ব্যান্ড) দৃষ্টিগোচর হয়।

১৮। মায়োসিস বিভাজনের প্রোফেজ-১ এর জাইগোটিন উপ-পর্যায়ে দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে জোড় সৃষ্টি হয়, যাকে **সিন্যাপসিস** বলে। প্রতিটি জোড়বাঁধা ক্রোমোসোমকে **বাইভেলেন্ট** বলে।

১৯। মায়োসিস বিভাজনের প্রোফেজ-১ এর প্যাকাইটিন উপ-পর্যায়ে প্রতিটি বাইভেলেন্টের ২টি ক্রোমোসোমই সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত দৈর্ঘ্য বরাবর দুটি ক্রোমাটিড-এ বিভক্ত হয়। এর ফলে প্রতিটি বাইভেলেন্টে ৪টি ক্রোমাটিড থাকে (এবং ২টি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।)

২০। একই ক্রোমোসোমের ২টি ক্রোমাটিডকে **সিস্টার ক্রোমাটিড** বলে। একই জোড়ার দুটি ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডকে **নন-সিস্টার ক্রোমাটিড** বলে।

২১। দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিড একই স্থানে ভেঙ্গে গিয়ে একটির সাথে অপরটি পুনরায় সংযুক্ত হয়। নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের এ সংযুক্তি স্থান ক্রস চিহ্নের মতো হয় যাকে **কায়াজামা** (বহু বচনে কায়াজমাটা) বলে।

২২। নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময়কে **ক্রসিংওভার** (ক্রসওভার) বলে।

২৩। ক্রসিংওভারের ফলে মাতৃ ও পিতৃ ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশের বিনিময় ঘটে এবং জিন বিন্যাসের পরিবর্তন হয়।

২৪। মায়োসিস বিভাজনের মেটাফেজ-এ ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত থাকে (মাইটোসিস বিভাজনের মেটাফেজ-এ সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত থাকে)।

২৫। মায়োসিস বিভাজনের অ্যানাফেজ-১ এ প্রতি মেরুতে এক একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রোমোসোম পৌছে। ফলে প্রতি মেরুতে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক হয় অর্থাৎ 2n এর পরিবর্তে n সংখ্যক হয়।

২৬। ডিপ্লয়েড জীবে মায়োসিসের মাধ্যমে জননকোষ (গ্যামিট) সৃষ্টি হয়।

২৭। মাইটোসিস-এর প্রোফেজ পর্যায়ে নিউক্লিয়াস আকারে বড়ো হয় এবং ক্রোমোসোমগুলোতে জল বিয়োজন শুরু হয়।

২৮। প্রো-মেটাফেজ পর্যায়ের শেষের দিকে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার এনভেলপ-এর বিলুপ্তি ঘটে।

২৯। স্পিন্ডল যন্ত্রের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানকে ইকুয়েটর বা বিষুবীয় অঞ্চল বলা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) :

১। কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে অবস্থান করে?

(ক) প্রোফেজ (খ) মেটাফেজ (গ) টেলোফেজ (ঘ) অ্যানাফেজ

২। মাইটোসিস অ্যানাফেজ-এর বৈশিষ্ট্য হলো—

(i) অপত্য ক্রোমোসোম সৃষ্টি

(ii) অপত্য ক্রোমোসোমগুলো মেরুমুখী চলতে শুরু করা

(iii) নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার এনভেলপ উপস্থিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

উন্নতজাতের ফসলি উদ্ভিদ 'ইরি' উৎপাদনে কোষ বিভাজনের ভূমিকা রয়েছে।

৩। উদ্দীপকের উদ্ভিদটি উৎপাদনে কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ের ভূমিকা রয়েছে ?

(ক) লেপ্টোটিন (খ) জাইগোটিন (গ) ডিপ্লোটিন (ঘ) প্যাকাইটিন

৪। উদ্দীপকের উদ্ভিদটি উন্নত কেন ?

(ক) ক্রসিংওভারের জন্য (খ) সিন্যাপসিসের জন্য

(গ) প্রান্তীয়করণের জন্য (ঘ) মেটাকাইনেসিসের জন্য

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (খ)	২। (ক)	৩। (ঘ)	৪। (ক)

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

১। উদ্দীপকটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

'A' কোষটি চারটি ক্রোমোসোমধারী যা বিভাজিত হয়ে দুটি কোষ তৈরি করে, প্রতি কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা 'A' এর সমান। 'B' কোষটি 'A' কোষের মতো ক্রোমোসোমধারী কিন্তু বিভাজিত হয়ে চারটি কোষ তৈরি করে যার ক্রোমোসোম সংখ্যা 'B' এর অর্ধেক।

(ক) বাইভেলেন্ট কী ?

(খ) কোষ বিভাজনে সাইটোকাইনেসিসের প্রয়োজন কেন ?

(গ) উদ্দীপকের 'A' ও 'B' কোষ দুটির বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(ঘ) উদ্দীপকের 'B' কোষটি বিভাজনের ফলে অপত্যকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হলো কেন ? ব্যাখ্যা করো।

২। যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি জীবের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়। কিন্তু সবধরনের কোষে এ বিভাজন হয় না। এ ধরনের বিভাজন জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

(ক) সিন্যাপসিস (Synapsis) কী?

(খ) প্রান্তীয়করণ (Terminalization) বলতে কী বুঝ?

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাজনে কীভাবে জীবে নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে?

(ঘ) 'জীবকুলের অস্তিত্ব রক্ষায় এ বিভাজন বিশেষ ভূমিকা পালন করে'—উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

৩। প্রকৃতিতে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড জীব বিদ্যমান রয়েছে। ডিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষে ও হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটে যে বিভাজন ঘটে তাতে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। এ ধরনের বিভাজন (বংশগতিতে) নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

(ক) ইন্টারকাইনেসিস কী?

(খ) কোষচক্র বলতে কী বুঝ?

(গ) উক্ত (উদ্দীপকে বর্ণিত) বিভাজন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করো।

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত বিভাজন প্রক্রিয়ায় কেন ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস পায়—তা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো।

একাদশ অধ্যায়

জীবপ্রযুক্তি

BIOTECHNOLOGY

প্রধান শব্দসমূহ :
টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাসমিড, ইনস্যুলিন, জিনোম সিকোয়েন্সিং

নতুন শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক শ্রেণিতে জীবপ্রযুক্তি, টিস্যুকালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বাস্তবক্ষেত্রে এসব প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে তোমরা সংক্ষিপ্তভাবে জেনেছো। এ অধ্যায়ে উক্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—	পাঠ পরিকল্পনা	
❖ টিস্যুকালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ।	পাঠ ১	জীবপ্রযুক্তি
❖ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ধাপসমূহ।	পাঠ ২ ও ৩	টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার
❖ জিন ক্লোনিং-এর ব্যাখ্যা।	পাঠ ৪	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
❖ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি।	পাঠ ৫	রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি
❖ জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ।	পাঠ ৬	জিন ক্লোনিং
❖ জীবপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা।	পাঠ ৭	জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার
❖ জীবপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্পর্ক বিশ্লেষণ।	পাঠ ৮	জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন
	পাঠ ৯	জিনোম সিকোয়েন্সিং ও এর প্রয়োগ
	পাঠ ১০	জীব নিরাপত্তার বিধানসমূহ

বায়োটেকনোলজি তথা জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও প্রয়োগমুখী শাখা। বায়োটেকনোলজি (জীবপ্রযুক্তি) শব্দটি আজ থেকে বহু পূর্বে ১৯১৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন **হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী কার্ল এরেকি** (Karl Ereky)। Biology এবং Technology শব্দ দু'টির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে Biotechnology নামক বিশেষ অর্থবোধক শব্দটি।

বর্তমান বিশ্বউন্নয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। বলা হয়ে থাকে এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে দেশ যতটা উন্নত সে দেশ অর্থনীতি, যোগাযোগ ও শক্তিতে ততটা উন্নত। কিন্তু সব প্রযুক্তিই জীবপ্রযুক্তি নয়। মাটি দিয়ে ইট তৈরিও একটি প্রযুক্তি, মাটির গভীর থেকে তেল, গ্যাস ওঠানোও প্রযুক্তিনির্ভর, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বে মুহূর্তেই যোগাযোগ স্থাপন, মোবাইল ফোনের নানাবিধ ব্যবহার ইত্যাদি সবই প্রযুক্তিনির্ভর। কিন্তু এগুলো জীবপ্রযুক্তি নয়।

উত্তম ব্যাকটেরিয়া প্রকরণ নির্বাচন করে উত্তম গুণমানের **দই তৈরি করা একটি সহজ জীবপ্রযুক্তি। অ্যালকোহল তৈরিও একধরনের জীবপ্রযুক্তি। এগুলো প্রাচীনতম জীবপ্রযুক্তি।** ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করে পচনশীল জৈববস্তু থেকে বায়োগ্যাস তৈরি এক ধরনের জীবপ্রযুক্তি। গবেষণাগারে ছোটো একখণ্ড ভাজক টিস্যু থেকে হাজার হাজার চারা তৈরি করার প্রযুক্তি হলো আধুনিক জীবপ্রযুক্তি। ১৯৭০ দশকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি তথা জিন-প্রকৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পর জীবপ্রযুক্তি বিষয়টি নতুনমাত্রা লাভ করেছে।

জীবপ্রযুক্তির পরিধি (Scope of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তির পরিধি ক্রমেই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে, এটি ক্রম সম্প্রসারণশীল। মনে হচ্ছে আগামী দিনের জীববিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও বিশ্বসভ্যতা জীবপ্রযুক্তিনির্ভর হয়ে যাবে। আগামী দিন হবে জীবপ্রযুক্তির যুগ। ইদানিং জীবপ্রযুক্তির পরিধি ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নলিখিত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।

(i) **ব্লু বায়োটেকনোলজি (Blue Biotechnology) :** এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির জলীয় ও সামুদ্রিক প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

(ii) **গ্রিন বায়োটেকনোলজি (Green Biotechnolog) :** এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

(iii) **রেড ও হোয়াইট বায়োটেকনোলজি (Red & White Biotechnology) :** এর দ্বারা চিকিৎসাক্ষেত্রের বায়োটেকনোলজির প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

জীবপ্রযুক্তি কী?

কোলম্যান (১৯৬৮) এর মতে, **জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারোপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি হলো জীবপ্রযুক্তি।**
জীবপ্রযুক্তির আরো কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হলো :

- **মানবকল্যাণে জীবের প্রযুক্তিগত ব্যবহারের কলা-কৌশলকে জীবপ্রযুক্তি বলে।**
- জীবপ্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানভিত্তিক এবং কৌশলগত মূলনীতির মাধ্যমে জৈব উপকরণের সাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সেবামূলক কার্য সম্পাদন।
- **মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে জৈবনিক প্রতিনিধিদের, যেমন–অণুজীব বা কোষীয় উৎপাদনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে জীবপ্রযুক্তি বলে।**

জীবপ্রযুক্তির অবদান/গুরুত্ব (Importance of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তির বহু পদ্ধতি ইতোমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে এবং প্রয়োগ হচ্ছে। নিচে কয়েকটি **বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে** আলোচনা করা হলো।

১। **জিন প্রযুক্তিতে :** (i) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে (মানুষের) ভাইরাস জীবাণু শনাক্তকরণ। (ii) বিভিন্ন প্রকার জিনগত ব্যাধি শনাক্তকরণ ও রোগ নিরাময়। (iii) বিভিন্ন জীবাণু প্রয়োগে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার। (iv) বিভিন্ন টিউমার কোষকে নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদন ও সঠিক স্থানে প্রেরণ।

২। **এনজাইম প্রযুক্তিতে :** (i) উন্নতমানের এনজাইম উৎপাদন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে এনজাইমের ব্যবহার। (ii) প্রাকৃতিক প্রোটিনের চেয়ে উন্নত পেপটাইড, নির্দিষ্ট ওষুধ, সঞ্চয়ী প্রোটিন প্রভৃতি **জৈবযৌগের** উৎপাদন।

৩। **কৃষিক্ষেত্রে :** (i) উদ্ভিদকোষ, টিস্যু ও অঙ্গের কালচার। (ii) সালোকসংশ্লেষণে বেশি সক্ষম, নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন। (iii) রোগ-পতঙ্গ-বালাই **প্রতিরোধী উদ্ভিদ** জাত উৎপাদন। (iv) বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী সুস্থ ও সবল **গবাদিপশু উদ্ভাবন**। (v) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন গবাদিপশুর দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে ওষুধ উৎপাদন। [MAT:14-15]

৪। **চিকিৎসাশাস্ত্রে :** (i) বিভিন্ন জটিল রোগের **প্রতিষেধক** এবং রোগব্যাধি শনাক্তকরণের জন্য **অ্যান্টিবডি উৎপাদন**। (ii) ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত **ইনসুলিন** ও **ইন্টারফেরনসহ** নানা ধরনের হরমোন উৎপাদন। (iii) মানুষের **বৃদ্ধি হরমোন** উৎপাদন। (iv) মস্তিষ্কে, হৃদপিণ্ডে ও ফুসফুসে রক্ত জমাট প্রতিরোধক উপাদান উৎপাদন। (v) বর্তমানে বায়োফার্মের মাধ্যমে হরমোন, অ্যান্টিজেন ও ভিটামিন তৈরিকরণ।

৫। **শিল্পক্ষেত্রে :** (i) শিল্পক্ষেত্রে অণুজীববিদ্যার জ্ঞানকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন **ওষুধের গুণগত ও পরিমাণগত** উৎপাদন বাড়ানো। (ii) **জৈবশক্তি** উৎপাদন। (iii) অণুজীব থেকে খাদ্য উৎপাদন।

৬। **পরিবেশ রক্ষায় :** (i) কলকারখানায় নির্গত রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রশমন ঘটানোর জন্য অণুজীবের ব্যবহার। (ii) মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য ও জঞ্জাল ধ্বংস ও **পরিবেশ নির্মল** করার কাজে অণুজীবের ব্যবহার। (iii) জিন ব্যাংক স্থাপন করে **জীববৈচিত্র্য** রক্ষা।

উদ্ভিদ টিস্যু কালচার (Plant tissue culture)

উদ্ভিদের যেকোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন-**শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচি পাতা** বা পাপড়ি ইত্যাদি) **বিচ্ছিন্ন করা কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত** (sterile) **অবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধিকরণ** (এবং পূর্ণাঙ্গ চারাউদ্ভিদ সৃষ্টি) **করাকে টিস্যু কালচার বলে**। অর্থাৎ গবেষণাগারে কোনো টিস্যুকে পুষ্টি মাধ্যমে **কালচার করাই হলো টিস্যু কালচার**। বহু পূর্ব থেকেই এ ধরনের ধারণা অনেকে পোষণ করতেন। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী Morgan (1901) **সর্বপ্রথম মত প্রকাশ** করেন যে, প্রতিটি সজীব উদ্ভিদ কোষেরই একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে। এ ক্ষমতাকে তিনি **টটিপোটেন্সি** (Totipotency) বলে অভিহিত করেন। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করা হয় এজন্য একে **মাইক্রোপ্রোপাগেইশন** বলা হয়। আবার এ প্রক্রিয়ায় কোনো উদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন **প্রজন্ম** বা **ক্লোন** তৈরি করা হয় বলে

একে **ক্লোনিং প্রযুক্তি**ও বলা হয়। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে মাতৃউদ্ভিদ হতে পৃথকীকৃত অংশকে **এক্সপ্লান্ট** বলা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত নতুন চারাকে **অণুচারা** (Plantlet) বলা হয়। **জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী Gottlieb Haberlandt (1902-)-কে টিস্যু কালচারের জনক** বলা হয়। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম টিস্যু কালচার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতিকে **In-vitro কালচারও** বলা হয়। In-vitro মানে কোষের বাইরে, In-vibo মানে কোষের ভেতরে। কারণ এ প্রক্রিয়াটি কাচপাত্রের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। ১৯৩০ এর দশকে ফরাসি বিজ্ঞানী Gautheret (১৯৩৯), আমেরিকান বিজ্ঞানী White (১৯৩৯) এবং অপর একজন ফরাসি বিজ্ঞানী Nobercourt (১৯৩৯) পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের টিস্যু নির্দিষ্ট পুষ্টি মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ীভাবে আবাদ করতে সক্ষম হন।

টিস্যু কালচার, জীবপ্রযুক্তির একটি নতুন শাখা হলেও ইতোমধ্যে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজনন, উন্নত উদ্ভিদ প্রকরণ উৎপাদন এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই বিশেষ অবদান রাখতে শুরু করেছে।

টিস্যু কালচার গবেষণাগার : টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রাথমিক কার্যক্রমের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গবেষণাগার (Laboratory) আবশ্যক, যেখানে ৩টি কক্ষ থাকবে।

(i) একটিতে সাধারণ কার্যক্রম (যেমন- মিডিয়াম প্রস্তুতকরণ, সংগৃহীত উদ্ভিদাংশ পরিষ্কারকরণ, অটোক্লেভ করা প্রভৃতি) সম্পন্ন করা হয়।

(ii) একটিতে ল্যামিনার এয়ার ফ্লো সমন্বিত ইনোকুলেশন চেম্বার, যেখানে কালচার উপযোগী অংশগুলো জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কালচার ভেসেলে প্রবিষ্ট করানো হয়।

(iii) একটিতে কালচার চেম্বার, যেখানে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোক তীব্রতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং এ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কালচার ভেসেল সংরক্ষিত থাকে, যা থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কালচারকৃত উদ্ভিদাংশের বৃদ্ধি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।

টিস্যু কালচারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি : ওয়াশিং বাকেট, নিক্তি (balance), P^H মিটার, অটোক্লেভ, অণুবীক্ষণযন্ত্র, মাইক্রোটোম, রেফ্রিজারেটর, ল্যামিনার এয়ার ফ্লো কেবিনেট, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, শ্যাকার, ব্লেন্ডার প্রভৃতি।

কাচের উপকরণ : টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, আয়তনিক ফ্লাস্ক, বিকার, পেট্রিডিস, মাপচোঙ, পিপেট, খাঁজযুক্ত কাচদণ্ড, বোতল ইত্যাদি।

রাসায়নিক দ্রব্য : কালচার মিডিয়াম তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের অজৈব লবণ, বৃদ্ধি হরমোন, ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, চারকোল ঈস্ট, অ্যালকোহল, স্পিরিট, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি।

অন্যান্য উপকরণ : কাঁচি, চিমটা, সার্জিক্যাল ব্লেড, সিকেটিয়ার, স্পেচুলা, ফিল্টার পেপার, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, প্লাস্টিকের পাত্র ইত্যাদি।

জীবাণুমুক্ত পরিবেশ : টিস্যু কালচার এর জন্য একটি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশ দরকার। ব্যবহার্য সব উপকরণ জীবাণুমুক্ত করা প্রাথমিক কাজ। কালচার মিডিয়াম কোনোভাবে সংক্রামিত হলে মিডিয়াম (মাধ্যম) আর ব্যবহার করা যায় না। কালচার মিডিয়ামের পাত্র ও অন্যান্য কাচের জিনিসপত্র গরমবায়ু ওভেনে ১৬০° সেলসিয়াস থেকে ১৮০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১-২ ঘণ্টা রেখে নির্বীজ (Sterilize) করা হয়। ফরসেপস, নিডল, স্কালপেল ইত্যাদি উপকরণ বার্নারে গরম করে ৯৫% অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

টিস্যু কালচারের প্রকারভেদ : টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে; যেমন— কক্ষমুকুল কালচার (axillary bud culture), মেরিস্টেম কালচার, মাইক্রোপ্রোপাগেশন, ক্যালাস কালচার-এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন, দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ উৎপাদন (somatic embryogenesis), পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন, প্রোটোপ্লাস্ট কালচার ইত্যাদি।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির (প্রযুক্তির) ধাপসমূহ : নিম্নলিখিত ধাপে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বর্ণনা করা যায় :

১। মাতৃউদ্ভিদ বা এক্সপ্লান্ট নির্বাচন : এক্সপ্লান্ট হলো ঐ উদ্ভিদাংশ, টিস্যু কালচারে ব্যবহারের জন্য যাকে কোনো উদ্ভিদ থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। কাজেই এক্সপ্লান্ট নির্বাচন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত কাণ্ডের শীর্ষমুকুল, পার্শ্বমুকুল এক্সপ্লান্ট হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়। পর্ব বা পাতার শীর্ষও ব্যবহৃত হয়। যে উদ্ভিদ থেকে এক্সপ্লান্ট নেয়া হয় বা হবে সেটি হলো **মাতৃউদ্ভিদ**। মাতৃউদ্ভিদটি অবশ্যই নীরোগ ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে। টিস্যু কালচারের জন্য সুস্থ, নীরোগ ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ থেকে টিস্যু সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত টিস্যুকে **এক্সপ্লান্ট** (explant) বলে।

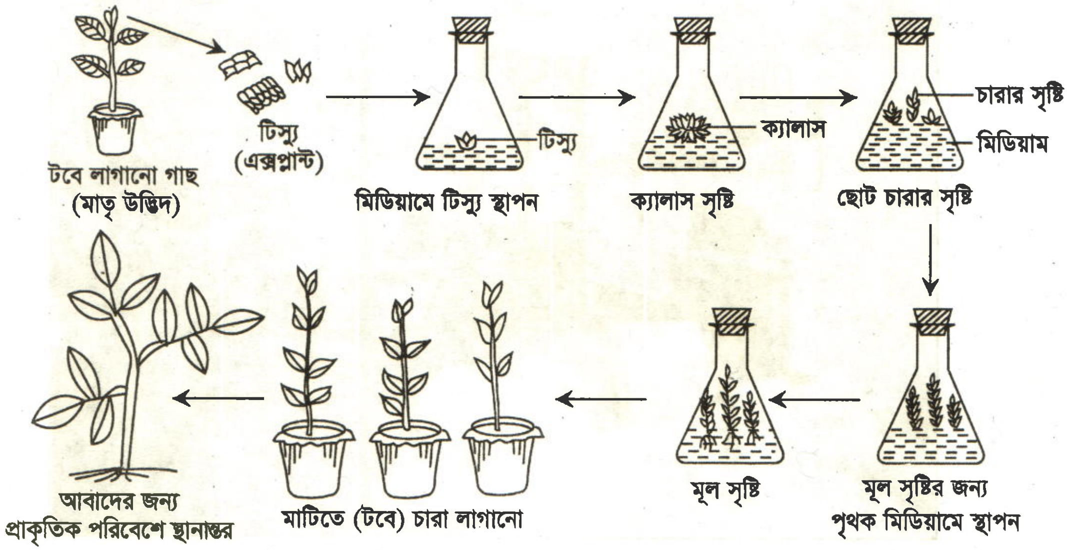

চিত্র ১১.১ : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার ক্রমিক পর্যায় বা ধাপসমূহ।

২। কালচার মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি : টিস্যু কালচার কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি কালচার মিডিয়াম তৈরি করা আবশ্যক। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন হয় তার সমন্বয়ে এ মিডিয়াম প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মুখ্য ও গৌণ উপাদান (macro and micro elements), ভিটামিন, সুকরোজ (২–৪%), ফাইটোহরমোন প্রভৃতি এ মিডিয়ামে থাকা প্রয়োজন। মাধ্যমকে ঘন করতে জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন— অ্যাগার, সঠিক মাত্রায় মেশাতে হয়। মৌলিক উপাদানসমৃদ্ধ আবাদ মাধ্যমকে **ব্যাসাল মিডিয়াম বলে। মিডিয়ামের** pH ৫.৫–৫.৮ এর মধ্যে রাখা হয়।

৩। জীবাণুমুক্তকরণ বা নির্বীজকরণ : কালচার মিডিয়ামে থাকে পুষ্টি উপাদান, ফলে এতে সহজেই জীবাণু জন্মাতে পারে। কিন্তু কালচার করার জন্য মিডিয়াম এবং এক্সপ্লান্ট সবই জীবাণুমুক্ত থাকা আবশ্যক। তাই মিডিয়ামকে কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা টেস্টটিউবে ঢেলে নির্বীজকৃত তুলা দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয় যাতে বায়ু ঢুকতে না পারে। এরপর পাত্রটিকে নির্বীজকরণ যন্ত্র (autoclave) দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। মিডিয়ামকে অটোক্লেভ যন্ত্রে নির্দিষ্ট তাপ (১২১° সে.), চাপ (১৫ পাউন্ড) ও সময় (২০ মিনিট) রাখা হয়। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে গবেষণাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে এক্সপ্লান্ট থেকে অণুচারা তৈরির পদ্ধতিই হলো **ইন-ভিট্রো কালচার।**

৪। মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট বা টিস্যু স্থাপন : এক্সপ্লান্টকে নির্বীজ করে (সাথে হাত, চিমটা ইত্যাদিকে অ্যালকোহল দিয়ে নির্বীজ করতে হয়) সম্পূর্ণ নির্বীজ অবস্থায় কাচপাত্রে রাখা মিডিয়ামে স্থাপন করা হয়।

৫। ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি : মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট তথা টিস্যু স্থাপনের পর পাত্রটিকে একটি বৈদ্যুতিক আলো (৩,০০০–৫,০০০ লাক্স বা ১০০০–৩০০০ লাক্স), তাপমাত্রা (১৭°–২০° সে.) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৭০–৭৫%)

নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখা হয়। কয়েকদিন পর টিস্যুটি বার বার বিভাজিত হয়ে একটি কোষীয় মণ্ডে পরিণত হয়। মণ্ড হলো অবয়বহীন অবিন্যস্ত টিস্যুগুচ্ছ। এক্সপ্লান্ট মিডিয়ামে স্থাপন করার পর আলো ও তাপ নিয়ন্ত্রিত করে রাখলে যে অবয়বহীন অবিন্যস্ত টিস্যুগুচ্ছ সৃষ্টি হয় তা হলো **ক্যালাস**। ক্যালাস থেকে এক সময় অসংখ্য মুকুল সৃষ্টি হয়।

চিত্র ১১.১.১ : একটি টিস্যু কালচার ও বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার (আংশিক)

৬। মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর ও চারা উৎপাদন : মুকুলগুলোকে সাবধানে কেটে নিয়ে মূল উৎপাদনকারী মিডিয়ামে রাখা হয় এবং সেখানে প্রতিটি মুকুল, মূল সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ চারাগাছে পরিণত হয়।

৭। চারা টবে স্থানান্তর : উপযুক্ত সংখ্যক সুগঠিত মূল সৃষ্টি হলে পূর্ণাঙ্গ চারাগাছ কালচার করা পাত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে ধীর প্রক্রিয়ায় সাবধানতার সাথে টবে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারাগাছ উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৮। প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর : টবসহ চারাগাছকে কিছুটা আর্দ্র পরিবেশে রাখা হয়, তবে রোপিত চারাগাছগুলো কক্ষের বাইরে রেখে মাঝে মাঝে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পূর্ণাঙ্গ চারাগাছগুলো সজীব ও সবল হয়ে ওঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, টিস্যু কালচার প্রযুক্তিকে বর্তমানে অনেক ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রয়োগ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যভেদে টিস্যু কালচার বিভিন্ন রকম হয়। কী ধরনের উদ্ভিদ থেকে কোন প্রকৃতি ও আকারের টিস্যু ব্যবহার করতে হবে এবং কী ধরনের কালচার মিডিয়াম ব্যবহার করা হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কালচারের উদ্দেশ্যের ওপর। ওপরে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি প্রয়োগভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

কাজ : টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপসমূহ ক্রমধারায় পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করো।

উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ভূমিকা/প্রয়োগ (Application of tissue culture technology)

টিস্যু কালচার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রজননবিদরা অনেক সাফল্যও অর্জন করেছেন। নিচে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হলো।

১। হুবহু মাতৃ-গুণাগুণসম্পন্ন চারা উৎপাদন বা মাইক্রোপ্রোপাগেশন : যেসব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না (যেমন- থুজা, সাগর কলা) সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারাগাছ (planlet) উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।

ফুল, ফল বা শস্য উৎপাদনকারী কোনো ভালো জাতের উদ্ভিদ থেকে যদি অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করা প্রয়োজন হয় তবে ঐ ভালোজাতের একটি উদ্ভিদ থেকে টিস্যু নিয়ে কালচার করে অনেক সংখ্যক চারাগাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এভাবে উৎপাদিত চারাগাছসমূহ হুবহু এদের মাতৃ-উদ্ভিদের মতো হয়ে থাকে। কাজেই একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ উৎপাদন করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর প্রক্রিয়া। অতি ক্ষুদ্র টিস্যু থেকে বহু চারা উৎপাদনের এ পদ্ধতি **মাইক্রোপ্রোপাগেশন** নামেও পরিচিত।

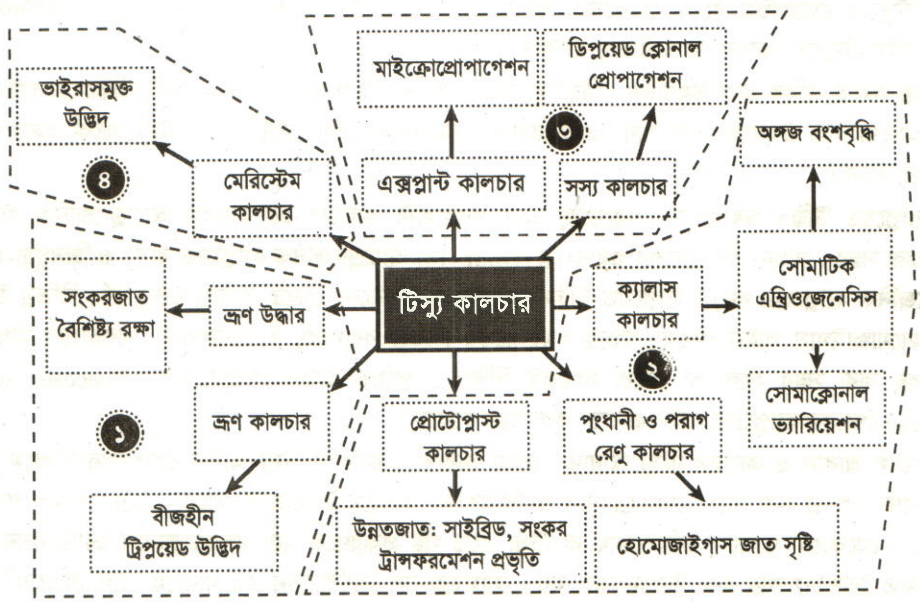

চিত্র ১১.২ : টিস্যু কালচারের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ

২। রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টি : টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে রোগমুক্ত চারা উৎপাদন করা যায়। আলু, আখ প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৩। চারা উৎপাদন : যেসব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারা গাছ উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।

৪। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণে : বর্তমানে অনেক বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ স্বল্প সময়ে উল্লিখিত উদ্ভিদ থেকে চারাগাছ উৎপাদন করা এ প্রযুক্তি ব্যবহারেই সম্ভব।

৫। ভ্রূণ কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন : টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক হলো ভ্রূণকালচার। ভ্রূণকালচারের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশেষ করে আন্তঃপ্রজাতি সংকরের ক্ষেত্রে ভ্রূণ পূর্ণতা লাভ না করায় সংকর উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে সংকরায়নের পর ভ্রূণ কালচার করা হয়। ফলে ভ্রূণ আর নষ্ট হয় না এবং পরবর্তীতে এ ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন করে। এভাবে উৎপাদিত সংকর উদ্ভিদের সাহায্যে উন্নতজাত উদ্ভাবন করা সম্ভব।

৬। সংকর উদ্ভিদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রোটোপ্লাস্ট মিলন (ফিউশন) : এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রোটোপ্লাস্ট সংযুক্তি ও তা থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংকর উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ সংকরায়নের ক্ষেত্রে

পুং ও স্ত্রীগ্যামিটের মিলন ঘটে। পুংগ্যামিটে সাইটোপ্লাজম খুবই কম থাকে এবং তা স্ত্রীগ্যামিটের বাইরে রয়ে যায়। কিন্তু প্রোটোপ্লাস্টের মিলনে **সোমাটিক হাইব্রিড** তৈরি হলে সেখানে দুটি প্রজাতির সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে (নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে না)। দুটো উদ্ভিদের শুধু সাইটোপ্লাজমের মিলনে সৃষ্ট উদ্ভিদকে হাইব্রিড না বলে **সাইব্রিড** (cybrid) বলা হয়। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের মাধ্যমেই সাইটোপ্লাজমের বিশেষ গুণ স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থানান্তর ঘটিয়ে নতুন জাতের উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। আলু ও টম্যাটো উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন করে সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদের নাম দেয়া হয়েছে **পোম্যাটো**। সোমাটোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন। [MAT:17-18]

৭। মেরিস্টেম কালচার : মেরিস্টেম কালচার টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক। উদ্ভিদের শীর্ষমুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে **মেরিস্টেম** বলে। মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারাগাছ সাধারণত রোগমুক্ত হয়ে থাকে, কারণ মেরিস্টেম টিস্যুতে কোনো রোগ-জীবাণু থাকে না।

৮। অল্প সময়ে অধিক চারা উৎপাদন : টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোনো একটি উদ্ভিদের সামান্য টিস্যু থেকে অল্পসময়ে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় চন্দ্রমল্লিকার একটি ছোট্ট অঙ্গজ টিস্যু থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৯। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন : পরাগরেণু এবং **পরাগধানী** কালচার-এর মাধ্যমে অ্যান্ড্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন–চীন দেশের **গুয়ান-18 (Guan-18, অ্যান্ড্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড ধান) ও জিনঘুয়া-1 (Ginghua-1, অ্যান্ড্রোজেনিক হ্যাপ্লয়েড গম)**। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হলে তা থেকে সহজেই ঈপ্সিত ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। Poaceae, Solanaceae ও Brassicaceae গোত্রের হ্যাপ্লয়েড লাইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

১০। কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ : কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ কৌশলের মাধ্যমে উৎপন্ন দৈহিক ভ্রূণ থেকে বীজ উৎপন্ন করা যায়। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উন্নতজাত যেমন– AdhI নামক গম উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। **যেকোনো আবাদি উদ্ভিদকোষ বা টিস্যু হতে সৃষ্ট প্রকরণকে বলে সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন।** এর মাধ্যমে উন্নত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব উৎপন্ন করা হয়। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী, পেস্টিসাইড প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। **আবাদি গ্যামিট কোষ হতে উৎপন্ন ক্লোনীয় প্রকরণকে বলে গ্যামিটোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন।**

১১। দ্রুত ক্লোন সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবিস্তার : একই দাতা উদ্ভিদের কোষ নিয়ে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অসংখ্য উদ্ভিদ ক্লোন তৈরি করা যায়। এভাবে সুন্দর ফুলদায়ী অনেক অর্কিড প্রজাতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১২। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি : প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সব ক্ষেত্রে উদ্ভিদে সংযোজন করা সম্ভব হয় না। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে নানা ধরনের অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে সংগৃহীত জিন আবাদকৃত ভ্রূণ বা কোষে প্রবেশ করিয়ে চাহিদা মতো জিনোম তৈরি করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে এ ধরনের কোষ বা ভ্রূণ হতে পূর্ণাঙ্গ **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** সৃষ্টি করা যায়। আগাছারোধী, পতঙ্গরোধী, উন্নত পুষ্টিমানসম্পন্ন ফসলী উদ্ভিদ যেমন– আলু, টমেটো, তামাক, তুলা, সয়াবিন, **স্বর্ণধান** (golden rice) ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনে এক বিরাট বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছে।

১৩। ভ্রূণ উদ্ধার : দুটি ভিন্ন প্রজাতির সংকরায়নে সৃষ্ট F_1 অপত্য প্রায়শই বন্ধ্যা হয়। এমন বন্ধ্যা উদ্ভিদের ভ্রূণ গঠিত হলে তা মারা যায় বা তা থেকে কোনো বীজ উৎপন্ন হয় না। এমন সংকর উদ্ভিদ থেকে ভ্রূণ উদ্ধার করে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করে (Culture medium) স্বতন্ত্র উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়।

১৪। দেহজ ভ্রূণ সৃষ্টি : এ পদ্ধতির সাহায্যে পৃথক একেকটি দেহকোষ থেকে পুষ্টি মাধ্যমে একেকটি ভ্রূণ সৃষ্টি করা যায়। গাজর, আলফা-আলফা প্রভৃতি গাছের এ প্রক্রিয়ায় অল্প জায়গায় অসংখ্য ভ্রূণ তৈরি করা যায়।

[MAT:22-23]

১৫। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : মালয়েশিয়ায় Oil palm এর টিস্যু কালচার করা হচ্ছে। এ দেশটি পাম তেল বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বিভিন্ন দেশে (যেমন- থাইল্যান্ড) অর্কিডের টিস্যু কালচার করা হয় এবং অর্কিড ফুল রপ্তানি করে এসব দেশ কোটি কোটি টাকা আয় করে।

বাংলাদেশে টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রয়োগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে আশির দশকের প্রথম দিক থেকে টিস্যু কালচার কাজের সূত্রপাত হয় এবং বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগেই টিস্যু কালচার কাজ শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এ কাজ প্রসার লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে বেশ কিছু উদ্ভিদ নিয়ে টিস্যু কালচার গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

(১) বিভিন্ন প্রকার দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন।

(২) কলার চারা উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষক পর্যায়ে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত চারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা রোগ প্রতিরোধক্ষম বলে উৎপাদনও ভালো।

(৩) চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশান প্রভৃতি ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

(৪) কদম, জারুল, ইপিল ইপিল, বক ফুল, সেগুন, নিম প্রভৃতি কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

(৫) বিভিন্ন প্রকার ডালজাতীয় ফসল ও বাদামের টিস্যু কালচার।

(৬) পাটের ভ্রূণ কালচার ও চারা উৎপাদন।

(৭) টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে গোল আলুর রোগমুক্ত বীজ **মাইক্রোটিউবার** উৎপাদন। [MAT:21-22]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারেও টিস্যু কালচার বিষয়ক উন্নতমানের গবেষণা চলছে। উন্নতমানের বেলের চারা উৎপাদন এদের একটি সাফল্যজনক কাজ। শীতপ্রধান দেশের স্ট্রবেরী ফলের গাছকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী জার্মপ্লাজম উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে আবাদকরণ করা হচ্ছে। আকাশমনি উদ্ভিদের দ্রুতবর্ধনশীল ও কম সময়ে অধিকতর কাঠ উৎপাদনক্ষম চারা উৎপাদন এবং তরমুজের চারা উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঁঠালের চারা উৎপাদনসহ আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে। তন্মধ্যে রোগমুক্ত গোল আলুর মাইক্রোটিউবার (আলুবীজ) উৎপাদন এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ। গোলাপ, গ্লাডিওলাস, লালপাতা ও নানাধরনের অর্কিডের চারা উৎপাদন। ইপিল-ইপিল, মেহগনি ও কেলিকদম ইত্যাদি কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন। বর্তমানে শীতপ্রধান দেশের স্ট্রবেরি ফলের গাছকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী করে জার্ম-প্লাজম উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে আবাদকরণ করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে দেশি ও বিদেশি নানা প্রকার অর্কিডের চারা উৎপাদন, মুগ কলাই ও মাষ কলাই ডালের রোগ প্রতিরোধক্ষম চারা উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বর্তমানে বহু প্রাইভেট সংস্থা (NGO) তথা ব্র্যাক কর্তৃক *Stevia* (স্টেভিয়ার পাতা চিনির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়), প্রশিকার বিদেশি অর্কিড ও গোলআলুর রোগমুক্ত বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন ও বিপণন বাংলাদেশে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রসার এবং সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ : নিচে টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো :

Reading

সুবিধাসমূহ

১। একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বহু চারা সৃষ্টি করা যায়।

২। সহজে রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৩। ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়া যায়।

৪। সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুত করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫। কলমে অক্ষম উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

৬। অল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন।

৭। উদ্ভিদের যেকোনো টিস্যু থেকে চারা উৎপাদন।

৮। অতি সস্তায় বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন।

৯। বিদেশি জাতের উদ্ভিদ থেকে দেশি আবহাওয়া উপযোগী জাত সৃষ্টি করা।

১০। যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না সেগুলোর চারা প্রাপ্তি ও স্বল্প খরচে দ্রুত সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।

১১। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ পুনঃউৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অসুবিধাসমূহ

১। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হলো মূল্যবান যন্ত্রপাতি যেমন— ল্যামিনার ফ্লো, অটোক্লেভ ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ। এগুলো মূল্যবান হলেও অনেক সময় পাওয়া যায় না।

২। কোনো কারণে যদি মাল্টিপ্লিকেশনের সময় প্রাথমিক অবস্থায় আবাদকৃত টিস্যু জীবাণু দ্বারা (ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক) আক্রান্ত হয় তবে বহুসংখ্যক সম্ভাবনাময় চারা নষ্ট হয়ে যায়।

৩। সঠিকভাবে টিস্যু কালচার বা মাইক্রোপ্রোপাগেশনের কাজ করার জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হয়।

৪। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো বেশ ক্ষুদ্রাকৃতির হওয়ায় এদের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বেশ অসুবিধা হয়ে থাকে।

৫। উৎপন্ন চারাগুলো মাতৃ-উদ্ভিদের গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে না।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি

Genetic Engineering and Recombinant DNA Technology

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জীববিজ্ঞানের একটি নবীনতম ও প্রয়োগমুখী শাখা। এর মূল লক্ষ্য কোনো কাঙ্ক্ষিত 'জিন' স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নতমানের নতুন জীবপ্রকরণ সৃষ্টি করা। **কোনো জীবকোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্যকোনো জীবকোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করা বা নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA-তে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয়**। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে DNA অণুর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের জীবকে বলা হয় **GMO** (Genetically Modified Organism) বা **GEO** (Genetically Engineered Organism) বা **ট্রান্সজেনিকস্** (TO = Transgenic Organism)। মানুষের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়াতে (*E. coli*) প্রবেশ করিয়ে এখন ঐসমস্ত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ইনসুলিন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে সায়েন্স ফিকশন লেখক Jack Williamson তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Dragon's Island-এ সর্বপ্রথম Genetic engineering শব্দটি ব্যবহার করেন।

একটি জীবের কোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত DNA-অংশ রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কেটে নিয়ে অন্য জীবের কোষের DNA এর সাথে সংযুক্ত করার ফলে যে নতুন (মিশ্রিত) DNA উৎপন্ন হয় তাকে **Recombinant DNA** বলে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য যে পদ্ধতি বা টেকনোলজি প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় **রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি** (recombinant DNA technology)। এ সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জিন প্রকৌশলগত যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA-তে কাঙ্ক্ষিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে। এ পদ্ধতি প্রয়োগে কোনো সুনির্দিষ্ট জিনসহ DNA অণুর অংশকে কোষের বাইরে ছেদন করে ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়। এভাবে গঠিত নতুন জিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হয়। **একে জিন ক্লোনিং বলা** হয়। এভাবে ক্লোন করা জিনটি চাহিদা অনুসারে ব্যবহার করা হয়, যেমন— (i) প্রয়োজনীয়

পরিমাণ প্রোটিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন করা এবং (ii) অন্য কাঙ্ক্ষিত জীবে বিশেষ করে উদ্ভিদে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন করা। পরবর্তীতে এ জীবে নতুন জিনের বহিঃপ্রকাশকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এর শুরু, কিন্তু ইতোমধ্যেই মানব সমাজ এর থেকে লাভবান হতে শুরু করেছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ও ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন প্রক্রিয়া অণুজীবের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উল্লিখিত অণুজীবসমূহের মধ্যে *E. coli*, *Agrobacterium tumefaciens* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ছোটো বৃত্তাকার DNA অণু থাকে। অতিরিক্ত এই বৃত্তাকার DNA-কে বলা হয় **প্লাসমিড** (plasmid)। প্লাসমিড-এর মাধ্যমে নতুন জিন-এর সন্নিবেশন এবং সন্নিবেশিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

প্লাসমিড (Plasmid) : ব্যাক্টেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও যে বৃত্তাকার দ্বিসূত্রক DNA অণু থাকে তাকে প্লাসমিড বলে। Laderberg (1952) *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাসমিডের সন্ধান পান। প্লাসমিডের DNA অণু স্বাধীনভাবে অনুলিপন (replicate) করতে পারে। মূল ক্রোমোসোমের বাইরে একটি অতিরিক্ত ও ক্ষুদ্রাকার DNA (ক্রোমোসোম) হিসেবে অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াতে প্লাসমিড অবস্থিত। এদের সংখ্যা কোষ প্রতি ১—১০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

প্লাসমিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

চিত্র ১১.৩ : *Agrobacterium tumefaciens* এর প্লাসমিড DNA।

১। প্লাসমিড বৃত্তাকার (চক্রাকার) দ্বি-সূত্রক DNA অণু।
২। এর আণবিক ভর প্রায় $10^6 - 200 \times 10^6$ dalton.
৩। প্লাসমিড অল্পসংখ্যক জিন ধারণ করে থাকে।
৪। রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা আদর্শ প্লাসমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে ফেলা যায়।
৫। এরা কনজুগেশনের মাধ্যমে সহজেই অন্য ব্যাকটেরিয়ায় সঞ্চালিত হতে পারে।
৬। কোনো কোনো প্লাসমিডের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন— colicin, vibriocin ইত্যাদি।
৭। প্লাসমিডের DNA অণু স্বাধীনভাব অনুলিপন (replicate) করতে পারে।

প্লাসমিডের প্রকারভেদ : প্লাসমিড প্রধানত তিন প্রকার; যথা—

(i) F এবং F´ প্লাসমিড : এসব প্লাসমিড একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে জেনেটিক উপাদান স্থানান্তর করার জন্য দায়ী। F(fertility) ও F´-প্লাসমিড ব্যাকটেরিয়া দেহে Pili তৈরি করে, যা তাদের যৌনজননে সাহায্য করে।

(ii) R-প্লাসমিড : এসব প্লাসমিডে অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতাসম্পন্ন জিন থাকে। R_6-প্লাসমিড ৬টি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

(iii) কোল প্লাসমিড : যেসব প্লাসমিডে **কোলিসিন** (Colicin) উৎপাদনকারী জিন থাকে তাদেরকে **কোল প্লাসমিড** বলে। কোলিসিন এক ধরনের প্রোটিন যা সংবেদনশীল *E. coli* কোষকে ধ্বংস করতে পারে। কোল প্লাসমিডের সমতুল্য আরেক ধরনের প্লাসমিড আছে যাতে **ভিব্রিওসিন** (Vibriocin) উৎপাদনকারী জিন থাকে। ভিব্রিওসিন সংবেদনশীল *Vibrio cholerae* কোষকে ধ্বংস করে দেয়।

প্লাসমিডের ব্যবহার : আণবিক বংশগতিবিদ্যার (molecular genetics) গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্লাসমিড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন ক্লোনিং ইত্যাদি কজে প্লাসমিড অত্যন্ত উপযোগী **বাহক** (vector) হিসেবে কাজ করে। প্লাসমিড DNA ব্যবহার করে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গিয়েছে; যেমন, মানুষের ইনসুলিন জিন ক্লোনিং, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA (টারগেট DNA) নির্বাচন।

(খ) একটি বাহক নির্বাচন, যার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডটি প্রতিস্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্লাসমিড DNA কে ব্যবহার করা হয়।

(গ) টার্গেট এবং বাহকের DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম নির্বাচন। উভয় ক্ষেত্রে একই এনজাইম ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) ছেদনকৃত DNA খণ্ডসমূহ (কাঙ্ক্ষিত DNA ও বাহক) DNA লাইগেজ এনজাইম দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।

(ঙ) কাঙ্ক্ষিত DNA সহ বাহক DNA-এর অনুলিপনের জন্য একটি পোষক (host) নির্বাচন (যেমন- *E. coli*)।

(চ) কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট DNA-এর বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন।

(ছ) রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাসমিড ব্যবহার করা হয়ে থাকলে, রিকম্বিনেন্ট DNA কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর করানো।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে কাঙ্ক্ষিত জিনকে *Agrobacterium* দ্বারা স্থানান্তর করানো।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ :

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন ও পৃথকীকরণ : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম পদক্ষেপ হলো কাঙ্ক্ষিত DNA অণু নির্বাচন। নির্বাচনের পর কাঙ্ক্ষিত জীবের কোষ থেকে DNA-কে পৃথক করতে হবে। প্রথমে কোষকে **লাইসিস** (lysis) করা হয় এবং কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত **প্রোটিন, শর্করা, লিপিড প্রভৃতি অণু হতে** DNA অণুকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়। এ DNA-এর সাথে কিছু পরিমাণ RNA ও প্রোটিন মিশ্রিত থাকে। পরবর্তীতে **সিজিয়াম ক্লোরাইড** বা সুকরোজ গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউজের মাধ্যমে উক্ত মিশ্রণকে নির্দিষ্ট ব্যান্ড আকারে পৃথক করা হয় এবং কাঙ্ক্ষিত DNA ব্যান্ডকে পৃথকভাবে আহরণ করে নেয়া হয়। বর্তমানে সিলিকা নির্ভর কিট ব্যবহার করে এ কাজটি অনেক সহজে করা যায়।

রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction enzyme) : যে এনজাইম প্রয়োগ করে DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স-এর একটি অংশ কেটে নেয়া যায় ঐ এনজাইমকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলে। এদেরকে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ (endonucleases)ও বলা হয়। এরা DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স, যাকে **রেস্ট্রিকশন সাইট (restriction site বা recognition site)** বলা হয়, তা কেটে দিতে সক্ষম। এ ধরনের এনজাইম প্রাকৃতিকভাবেই ব্যাকটেরিয়া কোষে বিদ্যমান থাকে। এদের কাজ হলো ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণকারী ভাইরাল DNA কেটে দেয়া। স্বাভাবিকভাবে এরা ভাইরাল DNA কেটে থাকে, তবে যেকোনো উৎস থেকে পাওয়া যেকোনো DNA সূত্রের নিউক্লিওটাইডের ঐ একই সিকোয়েন্স (রেস্ট্রিকশন সাইট) সমান দক্ষতার সাথে কাটতে সক্ষম।

প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ কমপক্ষে একটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন করে থাকে। শত শত প্রকার ব্যাকটেরিয়া কোষে শত শত ধরনের রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন হয়। এরা DNA সূত্র কাটার জন্য নিজস্ব সিকোয়েন্স শনাক্ত করতে পারে এবং ঐ রেস্ট্রিকশন সাইট কেটে দিতে পারে।

(খ) ভেক্টর (বাহক) DNA নির্বাচন : কাঙ্ক্ষিত DNA-এর প্রয়োজনীয় অংশ বহন করার জন্য একটি বাহক (vector) নির্বাচন করতে হয়। ব্যাকটেরিয়াতে অবস্থিত প্লাসমিড-DNA-কে কাঙ্ক্ষিত DNA বহন করার জন্য বাহক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ বাহক প্লাসমিড DNA-কে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন (modify) করে নেয়া হয়। যেমন— (i) কাঙ্ক্ষিত DNA থেকে রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন তৈরি করতে চাইলে বাহকের ভেতর কাঙ্ক্ষিত DNA-র ৫'-প্রান্তে প্রোমোটার ও ৩'-প্রান্তে টারমিনেটর সিকোয়েন্স যোগ করতে হয়। (ii) কাঙ্ক্ষিত DNA-কে উদ্ভিদকোষে প্রতিস্থাপন করতে হলে কাঙ্ক্ষিত DNAটি *Agrobacterium tumefaciens*-এর Ti-প্লাসমিডের T-DNA-র ভেতরে প্রোমোটার ও টারমিনেটরসহ স্থাপন করতে হয়। (iii) সাধারণভাবে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য হলে সাধারণ প্লাসমিডে স্থাপন করতে হয়।

(গ) কাঙ্ক্ষিত DNA-কে নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) ছেদন : সুনির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত DNA-এর নির্দিষ্ট অংশকে খণ্ড করা হয়। **একই এনজাইম** প্রয়োগ করে বাহক DNA তেও (যেমন-*A. tumefaciens*-এর Ti প্লাসমিড DNA) ছেদন করে নেয়া হয় (চিত্র : ১১.৪, ১১.৫)।

[কাঙ্ক্ষিত DNA-ই এ সংক্রান্ত DNA খণ্ড বহন করে। বিভিন্ন জীবের জন্যই লাইব্রেরি আছে, যেমন— *E. coli* লাইব্রেরি, মানব জিনোম লাইব্রেরি ইত্যাদি। এখন আবার কমপ্লিমেন্টারি DNA **(cDNA)** লাইব্রেরিও আছে। cDNA হলো mRNA-এর কমপ্লিমেন্টারি কপি। যেসব জিন বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম সে সব জিন cDNA লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। একজন গবেষক cDNA লাইব্রেরি থেকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড পেতে পারেন। **DNA হাইব্রিডাইজেশন প্রোব** (কাঙ্ক্ষিক DNA সিকোয়েন্সের সম্পূরক একক খণ্ডক রেডিওঅ্যাকটিভ DNA খণ্ড) ব্যবহার করে (কারণ এ প্রোব কাঙ্ক্ষিত DNA-এর সাথে হাইব্রিডাইজ করবে) লাইব্রেরি থেকে ক্লোন শনাক্ত করে PCR-এর মাধ্যমে সে কাঙ্ক্ষিত সিকোয়েন্স খণ্ড বের করে আনা যাবে। বর্তমানে **জিন মেশিনের** (automated chemical Synthesis apparatus) সাহায্যে সহজেই DNA হাইব্রিডাইজেশন প্রোব ও PCR-এ ব্যবহৃত প্রাইমার তৈরি করা যায়।]

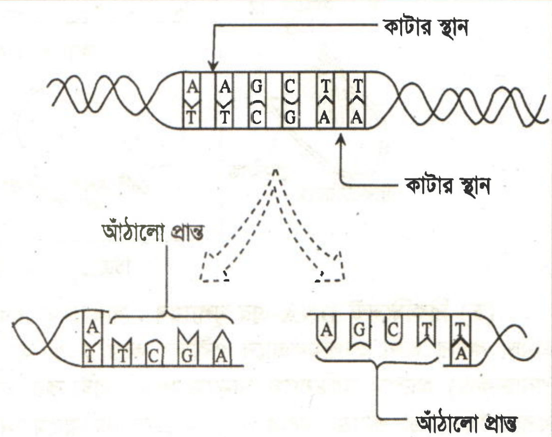

চিত্র ১১.৪ : রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে DNA কর্তন।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক রেস্ট্রিকশন এনজাইম পৃথক করা হয়েছে; যেমন— Eco RI (*Escherichia coli* Ry 13), Hind III (*Haemophilus influenzae* Rd), Bam HI (*Bacillus amyloliquefaciens* H) প্রভৃতি। রেস্ট্রিকশন এনজাইমসমূহ DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সাজান পদ্ধতির (specific base sequences) অংশকে কেটে দেয় এবং একই রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা প্লাসমিডের ঐ একই বেস সিকোয়েন্সবিশিষ্ট অংশকে কাটা যায়। সাধারণত এরা ৪–৬ জোড়া বেস অংশ কেটে থাকে। রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে DNA অণু কর্তনের **সূক্ষ্ম ছুরিকা (molecular scissors-আণবিক কাঁচি বা বায়োলজিক্যাল নাইফ)** হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম ও এদের রেস্ট্রিকশন স্থান নিচে দেখানো হলো : DAT:21-22;17-18

এনজাইম	**রেস্ট্রিকশন স্থান**	**এনজাইম**	**রেস্ট্রিকশন স্থান**
Bam HI	G ⌊GATCC CCTAG⌉ G	Hpa II	C⌊ CGG GGC⌉ C
Hind III	A ⌊AGCTT TTCGA ⌉ A	Mbo I	⌊GATC CTAG⌉
Eco RI	G ⌊AATTC CTTAA⌉ G		

└─┐ দিয়ে DNA অণুর কাটার স্থান দেখানো হয়েছে।

(ঘ) ছেদনকৃত কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে বাহক প্লাসমিড DNA-তে স্থাপন : প্লাসমিড DNA হতে বের করে নেয়া অংশের ফাঁকা স্থানে **কাঙ্ক্ষিত** DNA খণ্ডকে প্রতিস্থাপন করা হয়। DNA-ligase এনজাইম ব্যবহার করে **কাঙ্ক্ষিত** DNA খণ্ডকে প্লাসমিড DNA-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। ফলে প্লাসমিড DNA-টি **কাঙ্ক্ষিত** DNA খণ্ড বহন করে। **কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড প্লাসমিড DNA-তে সংযুক্ত হবার ফলে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি হলো।**

(ঙ) পোষক (host) নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড DNA পোষককোষে প্রবেশ করানো : রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে পরে কোনো পোষক ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া অন্য প্লাসমিড গ্রহণ করে না। **ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ করে heat shock-এর মাধ্যমে বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করলে প্লাসমিড গ্রহণ করতে পারে।** প্লাসমিড গ্রহণ করলে ঐ ব্যাকটেরিয়ামকে **ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়াম** (transformed bacterium) **বলে।** পরবর্তীতে ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডটিও **সংখ্যাবৃদ্ধি করে বলে একে ক্লোনিংও বলা হয়।** DNA অনুপ্রবেশের অন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি হলো **Electroporation**।

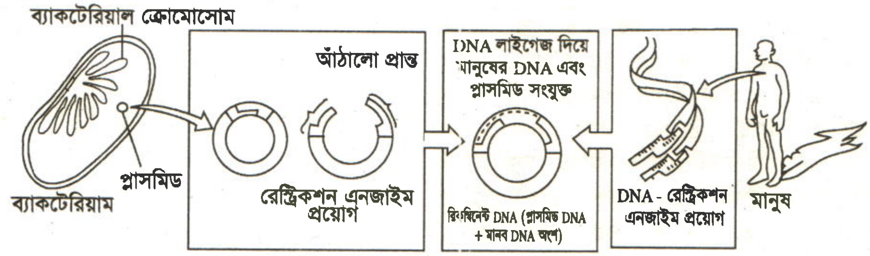

চিত্র ১১.৫ : রিকম্বিনেন্ট DNA সৃষ্টি।

(চ) রিকম্বিনেন্ট DNA-এর মূল্যায়ন : সাধারণত রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার কাজটি সফলভাবে হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA যুক্ত ঐ ব্যাকটেরিয়াম (পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকৃত) অ্যাগার মিডিয়ামে জন্মিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এক্ষেত্রে পোষক ব্যাকটেরিয়া recombinant plasmid বহন করছে কিনা তা শনাক্ত করার জন্য অ্যাগার মিডিয়ামে নির্দিষ্ট antibiotic ব্যবহার করতে হয় কারণ বাহক প্লাসমিডে ঐ antibiotic এর resistance gene রয়েছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA কাঙ্ক্ষিত জিন বহন করছে কিনা তা শনাক্তকরণ : এটি করা হয় (i) PCR পদ্ধতিতে, (ii) Restriction digestion-এর মাধ্যমে এবং (iii) জেনেটিক প্রোব-এর মাধ্যমে। **জেনেটিক প্রোব** (genetic probe) device মেটাল ডিটেক্টর-এর তুলনীয় একটি উপায়। জেনেটিক প্রোব হলো রেডিও অ্যাকটিভলি চিহ্নিত টার্গেট জিনের (কাঙ্ক্ষিত জিনের) পরিপূরক এক স্ট্র্যান্ডবিশিষ্ট DNA বা mRNA।

(ছ) রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাসমিড ব্যবহার করে থাকলে ঐ DNA-কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর করতে হয়।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রবেশ করানো : কাঙ্ক্ষিত জিনসমৃদ্ধ কোনো কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে হলে কাঙ্ক্ষিত জিনকে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে *Agrobacterium tumefacians*-এর মাধ্যমে বা অন্য পদ্ধতিতে স্থানান্তর করতে হবে এবং পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় ঐ কোষ থেকে নতুন ও কাঙ্ক্ষিত জিনসহ নতুন প্রকৃতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। এরূপ উদ্ভিদকে **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** (transgenic plant) বলে। **এখানেই টিস্যু কালচারের সাথে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সম্পর্ক।**

Implanta পদ্ধতি ব্যবহার করে সরাসরি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। *Arabidopsis* উদ্ভিদের পুষ্পমঞ্জরীকে *Agrobacterium* সাসপেনসনে নির্দিষ্ট সময় ডুবিয়ে রেখেও সহজে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় টিস্যু কালচারের দরকার পড়ে না।

সফল জেনেটিক মডিফিকেশনের জন্য রিকম্বিনেন্ট DNA কে অবশ্যই একটি কোষে (উদ্ভিদ) প্রবেশ করাতে হবে এবং অবশ্যই ঐ রিকম্বিনেন্ট DNA কে কোষস্থ নিউক্লিয়াসের কোনো ক্রোমোসোমে বা ক্লোরোপ্লাস্ট DNA-এর সাথে সংযুক্ত হতে হবে।

নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষক কোষে প্রবেশ করানো হয়।

(ক) প্রত্যক্ষ ভৌতিক (Physical) প্রক্রিয়া

(i) **Electroporation :** তৈরি ইলেকট্রিক ক্ষেত্র কোষঝিল্লিতে সংকীর্ণ ছিদ্র তৈরি করে এবং রিকম্বিনেন্ট DNA কোষে প্রবেশ করে।

(ii) **Micro injection :** একটি মাইক্রোপিপেট দিয়ে কোষকে ধরে রাখা হয় এবং অন্য একটি অতিসূক্ষ্ম সূঁই দিয়ে DNA কে কোষে প্রবেশ করানো হয়।

(iii) **Biolistics (Gunshot) :** কোনো ধাতব পিণ্ডের (স্বর্ণের) উপরিতলে DNA বসিয়ে সেই পিণ্ডকে Gunshot করে উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করানো হয়।

(খ) প্রত্যক্ষ রাসায়নিক (Chemical) প্রক্রিয়া

(i) **Calcium Chloride :** কোষকে ঠাণ্ডা $CaCl_2$ দ্রবণে ইনকিউবেট করে পরে 'হিটশক' দিলে DNA কোষে প্রবেশ করে।

(ii) **Liposomes :** কৃত্রিম ভেসিকলের (Vesicle) সাথে DNA সম্পৃক্ত হয়, পরে কোষঝিল্লির সাথে ভেসিকল সংযুক্ত হয়ে যায় এবং DNA কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

(গ) ভেক্টর ব্যবহারের পরোক্ষ প্রক্রিয়া

(i) ***Agrobacterium tumefaciens*** নামক ব্যাকটেরিয়াকে ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করে এটা করা হয়। এ ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড কাঙ্ক্ষিত জিনসহ সহজেই উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করতে পারে।

(ii) **TMV:** TMV কাঙ্ক্ষিত জিনসহ এর RNA কে উদ্ভিদকোষে প্রবেশ করাতে সক্ষম। তামাক গাছে সহজে প্রবেশ করে থাকে। ব্যাকটেরিয়াতে বাইরের DNA প্রবেশ করানোকে বলা হয় *ট্রান্সফরমেশন* এবং প্লাসমিডকে প্রকৃত কোষে প্রবেশ করানোকে বলা হয় *ট্রান্সফেকশন*।

Reading

টিস্যু কালচার ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	টিস্যু কালচার	রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি
১. সংজ্ঞা	জীবদেহের বিচ্ছিন্ন করা কোনো বিভাজনক্ষম টিস্যু কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে কালচার (আবাদ) করে চারা উদ্ভিদ সৃষ্টি বা টিস্যু বৃদ্ধির (প্রাণীর ক্ষেত্রে) প্রক্রিয়াই হলো টিস্যু কালচার।	কোনো জীবের DNA-তে ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত এক বা একাধিক কাঙ্ক্ষিত জিন বা DNA খণ্ড সংযুক্ত করে সংকর (হাইব্রিড) DNA তৈরির কৌশলই হলো রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি।
২. উৎপাদন	এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা সম্ভব।	এ পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব নয়।
৩. ব্যবহার	ভাইরাস ও রোগমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়।	কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়।
৪. প্রক্রিয়া	অপেক্ষাকৃত কম জটিল প্রক্রিয়া।	অপেক্ষাকৃত বেশি জটিল প্রক্রিয়া।
৫. প্লাসমিড ব্যবহার	এক্ষেত্রে প্লাসমিডের প্রয়োজন হয় না, কারণ জিন স্থানান্তরণ বিনিময়ের কোনো সুযোগ নেই।	এক্ষেত্রে প্লাসমিডের প্রয়োজন হয়, কারণ জিন স্থানান্তর বা বিনিময়ের সুযোগ রয়েছে।
৬. জিন	এক্ষেত্রে জিন ম্যানিপুলেশন করে জীবের জিনোটাইপ পরিবর্তন করা হয় না।	এক্ষেত্রে জিন ম্যানিপুলেশন করে জীবের জিনোটাইপ পরিবর্তন করা হয়।
৭. অপত্য উদ্ভিদের ধরন	উৎপন্ন উদ্ভিদ মাতৃউদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন হয়।	উৎপন্ন জীব প্যারেন্ট জীব থেকে ভিন্নগুণসম্পন্ন হয়।

জিন ক্লোনিং (Gene Cloning)

ক্লোন (clone) শব্দের অর্থ-হুবহু প্রতিরূপ। একই জিনোটাইপবিশিষ্ট একাধিক জীব বা জীবাংশকে ক্লোন বলা হয়। একটি জবা গাছ থেকে ১০টি ডাল কেটে চারা করলে এরা হবে হুবহু একই জিনোটাইপসম্পন্ন এবং এরা হলো ক্লোন। ক্লোন মাতৃউদ্ভিদের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। সাধারণত কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ থেকে এ ক্লোনিং করা হয়। মনে করি একটি চা গাছের চা উত্তম মানের হয়, কাজেই ঐ গাছটি হলো কাঙ্ক্ষিত গাছ। ঐ গাছ থেকে ক্লোন করে বাগান বৃদ্ধি করলে পুরো বাগান থেকেই উন্নতমানের চা পাওয়া যাবে। বর্তমানে চা বাগানে ক্লোনাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

জিন ক্লোনিং হলো কোনো জীবের DNA পৃথক করে তা থেকে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কাঙ্ক্ষিত জিন চিহ্নিত করে ঐ জিনকে হুবহু কপি করা। সহজ কথায় **কোনো কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যাবৃদ্ধি করাই হলো জিন ক্লোনিং।**

একটি ক্রোমোসোমের DNA-তে অসংখ্য জিন থাকতে পারে। এর সবগুলোই কাঙ্ক্ষিত জিন নয়। কেননা, নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে, তাই প্রথমে কাঙ্ক্ষিত প্রোটিন খোঁজা হয় এবং ঐ প্রোটিন উৎপাদনকারী জিন খুঁজে বের করতে হয়। সাধারণত বিজ্ঞানিগণ জীবের DNA-এর ক্যাটালগের জিন লাইব্রেরি তৈরি করেন এবং ঐ জিন লাইব্রেরি থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন খুঁজে বের করেন।

গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করার জন্য অথবা উন্নতমানের প্রোটিন তৈরির জন্যই হোক রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির একটি উদ্দেশ্যই হলো বিশেষ জিনের বহু কপি তৈরি করা। **একটি জিনের বহু সংখ্যক হুবহু কপি তৈরি করাই হলো জিন ক্লোনিং।**

জিন ক্লোনিং-এর জন্য জিন-এর উৎস : তিনটি উৎস থেকে তা পাওয়া যায়–

i. বিনা ক্রাইটেরিয়ায় (random) তৈরি ক্রোমোসোমের খণ্ড যা ভেক্টর-এ অন্তর্ভুক্ত করা। এগুলো জিন-লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

ii. সুনির্দিষ্ট mRNA থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনে করা কমপ্লিমেন্টারি DNA।

iii. গবেষণাগারে অর্গানিক কেমিস্টগণ কর্তৃক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত DNA খণ্ড।

PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) : ১৯৮৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী Kary Mullis কোষ বহির্ভূতভাবে DNA ক্লোনিং-এর দ্রুততম এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ প্রযুক্তিকে **পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন** বা **PCR** বলা হয়।

[DAT:22-23]

একটি টেস্টটিউবে একটি জিনের বহু কপি করা যায় PCR এর মাধ্যমে। প্রথমে দ্বিসূত্রক DNA-কে ৯০° সে. তাপমাত্রায় একক সূত্রক করা হয়। DNA রেপ্লিকেশনের জন্য ৫'-প্রান্তে একটি প্রাইমার যুক্ত করা হয়। একটি আদর্শ প্রাইমার ১২ থেকে ২০ বেইস পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। DNA পলিমারেজ তখন সম্পূরক সূত্র তৈরি করে দেয়। কয়েক মিনিটেই কপি তৈরি হয় এবং অল্পসময়ে অসংখ্য কপি তৈরি হয়ে যায়। এটি খুবই সহজ একটি উপায়। সাধারণত এ সূত্র তৈরির হার ১০০০ বেস প্রতি মিনিটে। তবে বর্তমানে মিউটেশন পদ্ধতি দ্বারা এ হার আরো বাড়ানো হয়েছে, ১০০০ bp প্রতি সেকেন্ডে।

ক্লোনিং-এর প্রকারভেদ : বিভিন্ন প্রকার ক্লোনিং পদ্ধতি আছে। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

(i) DNA ক্লোনিং : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে DNA ক্লোনিং করা হয়। এটি জিন ক্লোনিং নামেও পরিচিত। কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড কেটে উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়ামের প্লাসমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়, ফলে প্লাসমিড DNAটি একটি রিকম্বিনেন্ট DNA-তে পরিণত হয়। উপযুক্ত মাধ্যমে এ রিকম্বিনেন্ট DNA যুক্ত ব্যাকটেরিয়াম আবাদ করলে অল্প সময়ে হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হবে এবং প্রতিটি ব্যাকটেরিয়ামে ঐ কাঙ্ক্ষিত জিন থাকবে। এভাবেই কাঙ্ক্ষিত জিনের অসংখ্য ক্লোন তৈরি করা হয়।

(ii) রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং : জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের DNA-এর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার কৌশল হলো রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং। ডলি নামক ভেড়ার সৃষ্টি এ পদ্ধতিতে করা হয়েছে। একটি ভেড়ার স্তন গ্রন্থি থেকে কোষ নিয়ে (একটি দাতাকোষ বা দাতা ভেড়া) তাকে আবাদ মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পরে একটি ভেড়ার ডিম্বাণু কোষ (গ্রহীতা কোষ) নিয়ে তা থেকে নিউক্লিয়াস সরিয়ে তদস্থলে দাতা কোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো হয়। ডিম্বাণুটি দাতাকোষের নিউক্লিয়াস নিয়ে বিভাজিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছায়। এ ভ্রূণ তৃতীয় একটি ভেড়ার জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। তৃতীয় ভেড়াটি নির্দিষ্ট সময় পর দাতা ভেড়ার চেহারাসম্পন্ন একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। এর নাম দেয়া হয়েছিল **ডলি** (১৯৯৬ সালে ডলির জন্ম হয়)। ডলির জন্মই রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং এর উদাহরণ। একইভাবে মানব ক্লোন করাও সম্ভব হচ্ছে।

rDNA (রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ) টেকনোলজি ও PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	rDNA (রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ) টেকনোলজি	PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন)
১। ক্লোনিং	এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিন বা DNA খণ্ডকের ক্লোনিং এবং প্রকাশ ঘটানো হয়।	এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জিন বা DNA খণ্ডকের শুধুমাত্র ক্লোনিং ঘটানো হয়।
২। সংঘটিত পদ্ধতি	এটি *In-vivo* পদ্ধতি। (সজীব কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত)	এটি *In-vitro* পদ্ধতি। (সজীব কোষের বাইরে সংঘটিত)
৩। ভেক্টরের ভূমিকা	এক্ষেত্রে ভেক্টর অত্যাবশ্যক।	এক্ষেত্রে ভেক্টর অত্যাবশ্যক নয়।
৪। উৎসেচক বা এনজাইম	rDNA টেকনোলজির প্রধান উৎসেচক রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ এবং DNA লাইগেজ।	PCR এর প্রধান উৎসেচক তাপ সহিষ্ণু DNA পলিমারেজ।
৫। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে rDNA টেকনোলজির ভূমিকা সবচেয়ে অধিক।	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে PCR এর ভূমিকা কম।

জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রয়োগ

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি বিজ্ঞান। জীবন-জীবিকার প্রায় সব ক্ষেত্রেই এ প্রযুক্তির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। এর দ্বারা জেনেটিক মডিফিকেশন ঘটানো হয়।

ক্রপ জেনেটিক মডিফিকেশনের উদ্দেশ্য [MAT: 14-15]

১। উপকারী দ্রব্য উৎপাদন (Novel products) : ফসল উদ্ভিদে এমন জিন সংযুক্তকরণ যাতে ঐ উদ্ভিদ উপকারী নতুন কোনো দ্রব্য (যা ঐ উদ্ভিদ আগে উৎপাদন করতে পারতো না) উৎপাদন করতে পারে। যেমন– তামাক গাছে হেপাটাইটিস-B ভ্যাকসিন উৎপাদন।

২। পরিবেশীয় প্রতিকূলতা উত্তরণ (Overcoming environmental resistance) : এমন জিন সংযুক্তকরণ যাতে করে লবণাক্ততা, ঠাণ্ডা (frost), খরা বা ফসলের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধকারী অন্য যেকোনো নিয়ামকের বিরুদ্ধে অধিক সহিষ্ণু হয়। যেমন— লবণাক্ততা সহিষ্ণু **'পীনাট'** উদ্ভাবন।

৩। ক্ষতিকর পোকা প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন (Pest resistance) : এমন জিন সংযুক্তকরণ যাতে করে ফসলের জন্য ক্ষতিকারক পোকা-মাকড়ের মৃত্যু ঘটাতে পারে তেমন বিষাক্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। যেমন— Bt.cotton.

৪। আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন (Herbicide resistance) : এমন জিন সংযুক্তকরণ যাতে করে আগাছানাশক প্রয়োগ করলে আগাছা মরে যাবে কিন্তু ফসলের কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন—গ্লাইফসেট প্রতিরোধী সয়াবিন উদ্ভিদ উদ্ভাবন।

নিচে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির কয়েকটি প্রায়োগিক ব্যবহার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

(A) কৃষিক্ষেত্রে : কৃষিক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন—

(ক) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ : আমেরিকান তুলা গাছে পোকার (Cotton bollworm) আক্রমণের ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ উৎপাদন হ্রাস পেতো। পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তাই ব্যবহার করতে হতো ইনসেক্টিসাইড (insecticides = পতঙ্গনাশক)। *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি **জিন** যোগ করার মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক তুলা গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ট্রান্সজেনিক তুলা গাছে পোকার জন্য বিষাক্ত প্রোটিন সৃষ্টি হয় যার ফলে এখন আর ঐ পোকার আক্রমণ ঘটে না। এর ফলে ঐ তুলার ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার পতঙ্গনাশক ব্যবহার করতে হয় না বলে উৎপাদন ব্যয় কমে গেছে এবং জমির ওপরের মাটি, পানি এবং বায়ু দূষণও হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় চাষকৃত ভুট্টার ৪০ ভাগ, তুলার ৫০ ভাগ এবং সয়াবিনের ৪৫ ভাগই ট্রান্সজেনিক প্রকরণ। বাংলাদেশেও এখন Bt cotton, গোল্ডেন রাইস, লেটব্লাইট রোগ প্রতিরোধক্ষম আলু চাষের ট্রায়াল চলছে, কৃষক পর্যায়ে এখনও দেয়া হয় নি।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক প্রক্রিয়া সফলভাবে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, পেঁপে, ভুট্টা, রাই, সূর্যমুখী, তুলা, নাশপাতি, গম, আঙ্গুর ইত্যাদি।

আগাছা নিধনকারী পদার্থ সহনশীল উদ্ভিদ

গ্লাইফসেট (Glyphosate) একটি আগাছা নিধনকারী পদার্থ যা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক ৭৮টি আগাছার মধ্যে ৭৬টি ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এটি আগাছার সাথে ফসল উদ্ভিদও নষ্ট করে ফেলে। কাজেই ফসল লাগানোর আগেই জমিতে আগাছানাশক দেয়া ভালো। কিন্তু ফসল লাগানোর পরও জমিতে পুনরায় আগাছা জন্ম নেয়, তখন অতি সাবধানে এটি ব্যবহার করতে হয়।

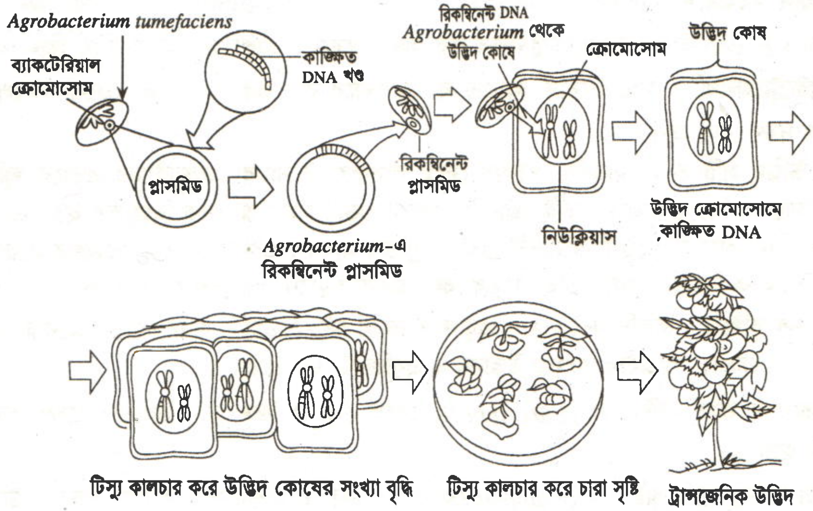

চিত্র ১১.৬ : ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি পদ্ধতি।

কতক ব্যাকটেরিয়া একটি এনজাইম তৈরি করে থাকে যা গ্লাইফসেট ভেঙ্গে দিতে পারে। বিজ্ঞানিগণ ব্যাকটেরিয়া থেকে এ জিন পৃথক করে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে তুলা ও সয়াবিন উদ্ভিদে অন্তর্ভুক্ত করে ট্রান্সজেনিক তুলা ও ট্রান্সজেনিক সয়াবিন উদ্ভিদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব ফসলের জমিতে এখন নিশ্চিন্তে **গ্লাইফসেট হার্বিসাইড** (glyphosate herbicide) প্রয়োগ করা চলে।

(খ) গুণগত মান উন্নয়নে : অস্ট্রেলিয়াতে **ভেড়া পালন** একটি উত্তম ব্যবসা। ভেড়া থেকে পাওয়া যায় পশম এবং মাংস। এরা **ক্লোভার জাতীয় ঘাস** খায়। ঐ ঘাসের প্রোটিনে সালফারের অভাব আছে। এর ফলে যে ভেড়া ক্লোভার ঘাস খায় এদের লোম নিম্নমানের হয়। লোমকে উন্নতমানের করতে হলে এদেরকে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দিতে হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে **সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী** জিন *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA-এর মাধ্যমে ক্লোভার ঘাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে কেবল ঐ ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফারসমৃদ্ধ খাদ্য দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। সূর্যমুখীর সালফার তৈরিকারী জিনসমৃদ্ধ ক্লোভার ঘাস হলো একটি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ।

(গ) সুপার রাইস (Super rice) বা গোল্ডেন রাইস (Golden rice) : বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিটামিন-A এর অভাব রয়েছে। এর ফলে কেবল বাংলাদেশেই প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত ভিটামিন-A সমৃদ্ধ খাবারের অভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। এশিয়ার লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ভাতের মাধ্যমে ভিটামিন-A এর অভাব পূরণ করতে পারলেই আমাদের সন্তানেরা আর রাতকানা বা অন্ধ হবে না। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুইডেনের বিজ্ঞানী Ingo Potrykus (1999) ও তাঁর সহযোগীরা উদ্ভাবন করেন সুপার রাইস। তাঁরা *Japonica* টাইপ ধানে, **ড্যাফোডিল** থেকে বিটা ক্যারোটিন তৈরির চারটি জিন এবং অতিরিক্ত **আয়রন** তৈরির তিনটি জিন প্রতিস্থাপন করেন। এ ধানের ভাত খেলে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ভাতপ্রিয় জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা ভিটামিন-A এর অভাবজনিত কারণে আর অন্ধ হবে না এবং মায়েরা দেহে রক্তশূন্যতার জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে রেহাই পাবে। এখন সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস চাষ শুরু হয়েছে।

(ঘ) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে : ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ফলে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, পটেটো ভাইরাস-এর **কোট প্রোটিন** (CP) জিন দিয়ে ট্রান্সফর্মেশনকৃত তামাক গাছ ভাইরাস আক্রমণ হতে নিজেকে প্রতিরোধ করছে। ইতোমধ্যে একইভাবে পেঁপের রিংস্পট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

(ঙ) নাইট্রোজেন সংবন্ধনে : বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে **'নিফ জিন'** (যা নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য দায়ী) *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা হচ্ছে 'নিফ জিন' বাহী ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত সার প্রয়োগ কমাতে বা একেবারে বন্ধ করতে পারবে। ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমবে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।

(চ) দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টিতে : জোনাকি পোকার দেহে লুসিফারেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে **'লুসিফেরিন'** নামক পদার্থ ক্ষরিত হয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। তাই জোনাকি পোকা ওড়ার সময় আলোক বিচ্ছুরিত হয়। এ লুসিফেরিন পদার্থ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন তামাক গাছে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে তামাক গাছের পাতা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। তাই রাতের বেলা অন্ধকার স্থানে এরা বেশ শোভাবর্ধক।

(ছ) বীজহীন ফল সৃষ্টিতে : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে সারা বিশ্বের অনেক দেশে বীজহীন ফল সৃষ্টি করা হচ্ছে; যেমন— জাপানে বীজহীন তরমুজ উদ্ভাবন এ প্রযুক্তিরই এক প্রতিফলন।

(জ) খরা প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি : *Bacillus subtilis* থেকে csp B জিন ভুট্টা উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে ভুট্টাকে খরা প্রতিরোধী করা সম্ভব হয়েছে।

(ঝ) লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত সৃষ্টি : *Arabidopsis* থেকে At NHXI জিন প্রবেশ করিয়ে 'পীনাট' উদ্ভিদকে লবণাক্ততা সহিষ্ণু করা সম্ভব হয়েছে।

(ঞ) ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা GM প্রাণী সৃষ্টি : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সাহায্যে ট্রান্সজিন সন্নিবেশিতকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীকে **ট্রান্সজেনিক প্রাণী বা GM প্রাণী** বলা হয়। প্রাণীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিন ট্রান্সজেনিক পদ্ধতিতে প্রধানত গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে স্থানান্তর করা হয়। এর ফলে উৎপাদিত পদার্থের বা বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সফলভাবে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন কারণে ট্রান্সজেনিক প্রাণী উৎপাদন করা হয়, যেমন—

১. গৃহপালিত পশুপাখিতে আকাঙ্ক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে অনুপ্রবেশ করানো; ২। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধ তৈরি করা; ৩। অধিক পরিমাণে দুধ, মাংস ও মাছ এবং উন্নতমানের পশম উৎপাদন; ৪। ট্রান্সজেনিক প্রাণীর দুধ, মূত্র ও রক্ত থেকে মূল্যবান প্রোটিন সংগ্রহ করা; ৫। জিনের বহিঃপ্রকাশ বা অন্য কোনো মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান করা ইত্যাদি।

(ট) ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি (Production of insect pest resistant plant) : অনেক কীট-পতঙ্গ আছে যারা ফসল উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এর ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। এরা হলো ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ অর্থাৎ insect pest। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এসব ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী ফসল উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

(i) ইউরোপিয়ান কর্নবোরার (European corn-borer) এক প্রকার মথ। এদের লার্ভা ভুট্টা গাছের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে, ফলে ভুট্টার ফলন শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পায়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে *Bacillus thuringiensis*-এর একটি জিন ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এ ক্ষতিকারক কর্নবোরার প্রতিরোধী ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। *Bacillus thuringiensis* ব্যাকটেরিয়াতে একটি প্রোটিন তৈরি হয় যা কীট-পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত, কিন্তু মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বিষাক্ত প্রোটিন তৈরিকারী 'জিন'কে ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে একটি নতুন জাত তৈরি করা হয়েছে যা পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত ঐ প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। এর ফলে ভুট্টার ঐ নতুন উদ্ভাবিত জাত কর্নবোরার দ্বারা আক্রান্ত হয় না (কর্নবোরার নিজেরাই মরে যায়)। এর ফলে ভুট্টার ফলন হ্রাস পায় না, ফলন বাড়লে অথবা ফলন হ্রাস না পেলে উৎপাদন খরচ কম পড়ে, ক্ষতিকারক রাসায়নিক ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার করতে হয় না, তাই উৎপাদন খরচ আরও কমে যায়। এছাড়া ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড বৃষ্টির পানির সাথে গড়িয়ে পুকুর, ডোবা, নদী-নালায় পড়ে জলজ ইকোসিস্টেমের যে মারাত্মক ক্ষতি করে তা থেকেও পরিবেশ রক্ষা পায়। ইনসেক্টিসাইড ছিটানো ফসল থেকে মানুষের দেহে ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড প্রবেশ করে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তা থেকেও মানুষ রক্ষা পায়।

কাজেই পতঙ্গনিরোধী ফসল উদ্ভিদ চাষে খরচ কম পড়ে, উৎপাদন বাড়ে, মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা পায়।

(ii) *Bacillus thuringiensis* (Bt) একটি মৃত্তিকাবাসী বড়ো আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মাটিতে এটি বিরাজমান আছে। গবেষণাগারে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে বায়ো-ইনসেক্টিসাইড হিসেবে ফসলে (যেমন বেগুন, ফুলকপি ইত্যাদিতে) প্রয়োগ করলে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ থেকে ফসল রক্ষা পায়, ফলন হ্রাস পায় না, পরিবেশের এবং মানবদেহেরও কোনো ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ মোটামুটি সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(iii) **স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (Sterile Insect Technique = SIT) :** এটি একটি আধুনিক জীবপ্রযুক্তি (যদিও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি নয়)। SIT হলো একটি পরিবেশবান্ধব ক্ষতিকারক পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। Edward Kripling ও Raymond Bushland ১৯৩৭ সালে এ পদ্ধতির প্রস্তাবক। ফসলে বা জমিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পতঙ্গনাশক প্রয়োগ না করে বায়োলজিক্যাল ইনসেক্ট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে ক্ষতিকর পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক পতঙ্গের পুরুষগুলোকে বন্ধ্যা করে দেয়া হয় (প্রধানত রেডিয়েশন প্রয়োগের মাধ্যমে)। এর ফলে স্ত্রী পতঙ্গসমূহ কার্যকর ডিম উৎপাদনে অক্ষম হয়, ফলে নতুন প্রজন্ম বিকশিত হতে পারে না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ক্ষতিকারক পতঙ্গটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মশা নিয়ন্ত্রণের এটি একটি কার্যকরী উপায়। আবার শাকসবজি ও ফলমূলের ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গও এ পদ্ধতিতে দমন করা সম্ভব। আমাদের দেশে এ পদ্ধতি এখনো প্রয়োগ সম্ভব না হলেও ব্রাজিল, জাপান, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতি একদিকে যেমন কৃষিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, অন্যদিকে পতঙ্গবাহিত (যেমন-মশা) রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন Insect Biotechnology গবেষণাগারে SIT নিয়ে গবেষণা চলছে।

ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও ক্লোন প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ট্রান্সজেনিক প্রাণী	ক্লোন প্রাণী
১। প্রবেশের প্রক্রিয়া	ট্রান্সজেনিক প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু বা জাইগোটে বাইরে থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানো হয়।	ক্লোন প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি অনিষিক্ত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস অপসারণ করে উক্ত অনিষিক্ত ডিম্বাণুর ভেতর (যে প্রাণীকে ক্লোন করা হবে তার) অন্য প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো হয়।
২। জিনগত পার্থক্য	বাইরে থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানোতে জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	দুটি প্রাণীর নিউক্লিয়ার জিন একত্রিত হয় না বিধায় জিনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।
৩। বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ	বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটে।	কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে না।
৪। জিনোমগত পার্থক্য	জিনোমগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।	জিনোমগত গঠন হুবহু এক।
৫। মিউটেশন বা প্রকরণ	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে।	মিউটেশন বা প্রকরণ ঘটে না।
৬। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	বাহ্যিক প্রকাশে ভিন্নতা দেখা দেয়।	বাহ্যিক প্রকাশ হুবহু একই রকম।
৭। ব্যবহার	শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা এককোষী জাইগোট ব্যবহৃত হয়।	কেবল ডিম্বাণুর খোলশ ব্যবহৃত হয়।

GMO কী ও কেন? : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization = WHO)-র সংজ্ঞানুযায়ী, যদি কোনো জীবের জেনেটিক পদার্থ (DNA) এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়, যে অবস্থায় এটি প্রাকৃতিক পরিবেশে কখনোই পাওয়া যায় না সে ধরনের জীবকে **জিনগত পরিবর্তিত জীব** (Genetically Modified Organism = GMO) বলে। প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ী, **গবেষণাগারে যে প্রক্রিয়ায় এক প্রজাতির DNA থেকে জিন সংগ্রহ করে সম্পর্কহীন ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীর জিনে কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ ঘটিয়ে জিনগত পরিবর্তিত জীবের সৃষ্টি করা হয় তাকে GMO বলে।** GMO সৃষ্টির সময় ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, কীটপতঙ্গ, প্রাণী, এমনকি মানুষ থেকেও বহিরাগত জিন আহরিত হতে পারে। জিনতত্ত্বে যেসব নির্বাচনি বংশবৃদ্ধি (Selective breeding), টিস্যু কালচার, হাইব্রিডাইজেশন ইত্যাদি অবলম্বন করা হয় তা প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয়। GMO থেকে এগুলোর পার্থক্য হচ্ছে : প্রচলিত হাইব্রিডাইজেশনে ট্রান্সজেনিক জীবের (GMO) সৃষ্টি কখনোই সম্ভব নয়।

১৯৯৫ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম GMO খাদ্য মানুষের আহারযোগ্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ শস্য তুলা ও সয়াবিন গাছ GM (Genetically Modified) বলে জানা যায়। ২০১০ সালের শেষ দিকে বিশ্বের ২৯টি দেশের ৯.৮ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার (বিশ্বের চাষযোগ্য জমির প্রায় এক-দশমাংশ) জমি GM খাদ্য চাষের আওতায় চলে আসে। বর্তমানে ৫টি দেশ (যথা– আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, আমেরিকা, কানাডা, ইন্ডিয়া) বিশ্বের প্রায় ৯০ ভাগ GM খাদ্যশস্য উৎপাদন করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রথম GM (Genetically Modified) খাদ্য ফসল

জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যে ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে GM ফসল বলে। পৃথিবী জুড়ে এখন প্রায় ৩০টি দেশ GM ফসল (Genetically Modified crop) উৎপাদন করছে। গত ২২ জানুয়ারি ২০১৪, বাংলাদেশে প্রথম একটি GM খাদ্য ফসল (Bt-বেগুন) চাষের জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এর চারটি জাত নির্বাচিত কৃষকের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

Bt-বেগুন কী? *Bacillus thuringiensis* নামক একটি সয়েল ব্যাকটেরিয়া থেকে **ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন** (Cry1Ac) বেগুনের জিনোমে অন্তর্ভুক্ত করে উৎপন্ন বেগুনের নাম দেয়া হয়েছে Bt-বেগুন।

পাটের জীবনরহস্য উদ্ভাবনকারী বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম

তোষা পাট (*Corchorus olitorius*)

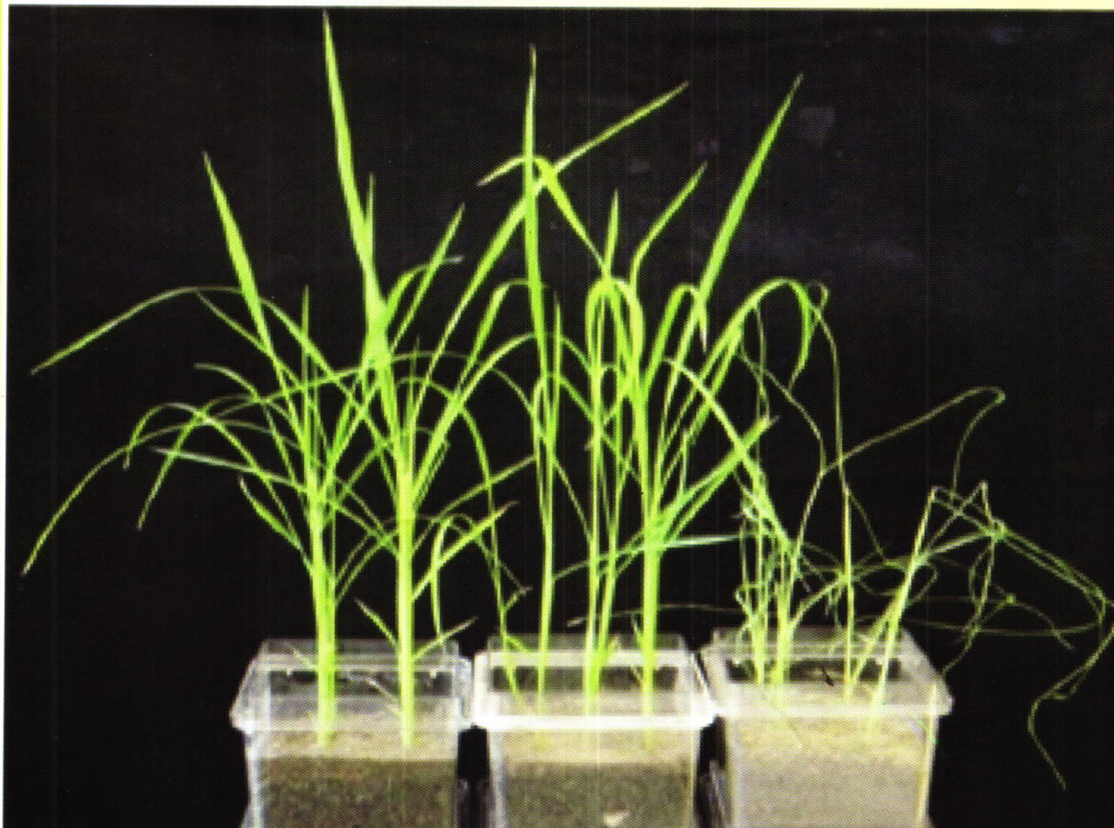

স্বাদু পানিতে সহনীয় স্বাভাবিক ধান গাছ

জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহনীয় ধান গাছ

লবণাক্ততা অসহনীয় স্বাভাবিক ধান গাছ (মৃত)

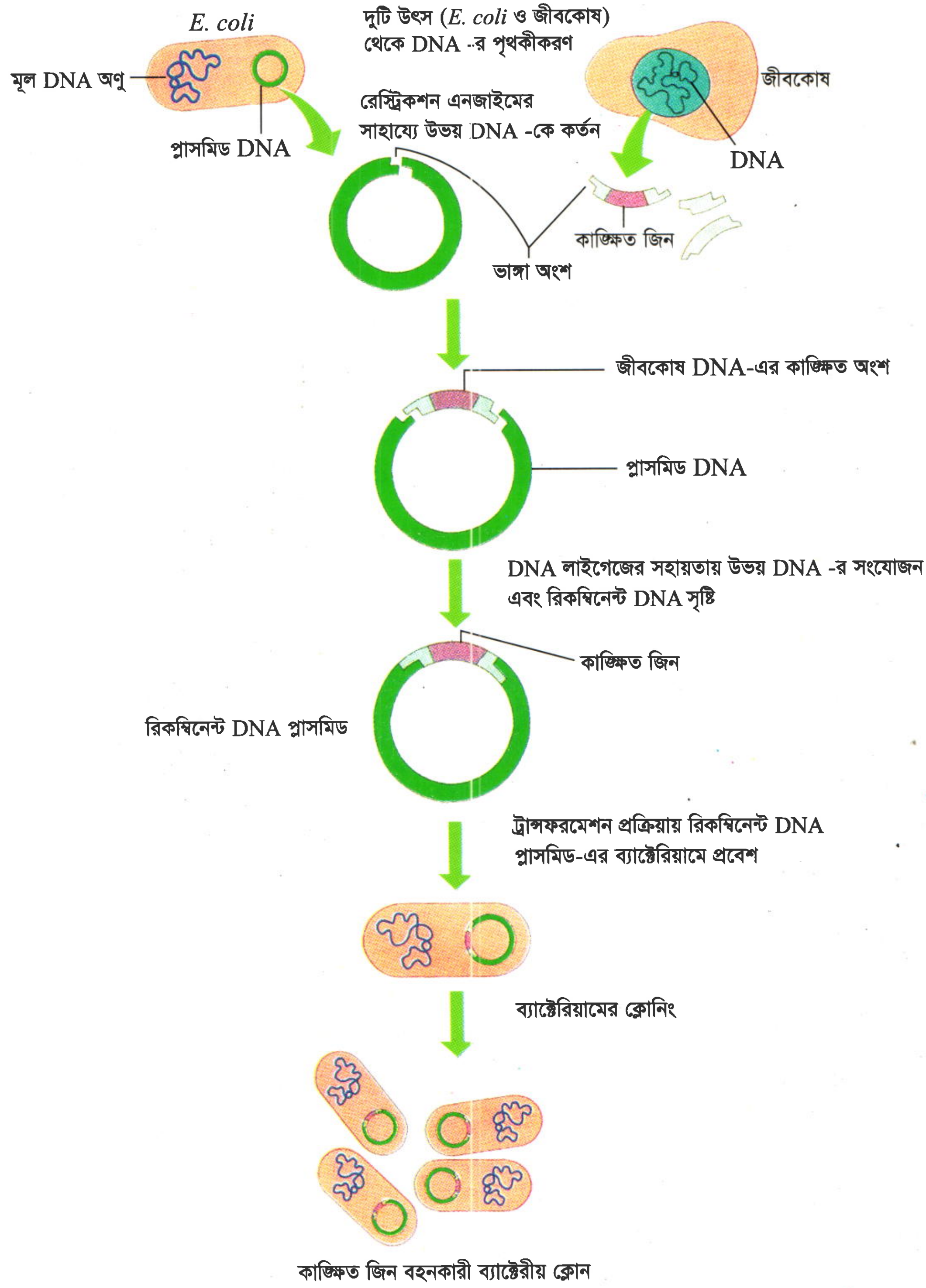

চিত্র : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ও জিন ক্লোনিং

সাধারণ বেগুন ও Bt-বেগুনের মধ্যে পার্থক্য হলো এক প্রকার পোকা সাধারণ বেগুন গাছের কচিডগা ও ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে ফেলে যার ফলে ফলন দারুণভাবে হ্রাস পায়। পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কৃষককে প্রতি সিজন-এ ৬০-১৮০ বার পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়। Bt-বেগুনে ঐ পোকার আক্রমণ হবে না, তাই পোকানাশক ওষুধও স্প্রে করতে হবে না।

পোকানাশক স্প্রে করলে কী হয়? বেগুন ক্ষেতে পোকানাশক স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ থেকে গাছ ও ফসল রক্ষা পায়, তবে-

(i) বেগুনের সাথে ওষুধ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং পরিণামে ক্যান্সার-এর মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

(ii) ফসলের জমি থেকে বৃষ্টির পানির সাথে পোকানাশক বিষ নিকটস্থ নদী-নালা-খাল-বিলে জমা হয় এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিশেষ করে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

(iii) মাটি ও পরিবেশ বিষাক্ত হয়।

(iv) কৃষকের হাজার টাকার ওষুধ কিনতে হয় এবং বহু কর্মঘণ্টা ব্যয় করে ওষুধ স্প্রে করতে হয়।

(v) ওষুধ স্প্রেকারী ব্যক্তিও এক সময় এ বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। **এতে কেবলমাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি লাভবান হয়, আর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।**

Bt-বেগুন চাষ করলে কী লাভ হবে ?

Bt-বেগুন চাষ করলে কৃষক নিম্নলিখিতভাবে লাভবান হবেন।

(i) পোকানাশক ওষুধ কিনতে হবে না ও স্প্রে করতে হবে না। এতে হাজার হাজার টাকা উৎপাদন খরচ কম হবে।

(ii) আমরা যারা বেগুন খাই তারাও ঐ বিষ দ্বারা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবো না এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে বেঁচে থাকবো।

(iii) মাটি ও পরিবেশ বিষমুক্ত থাকবে।

(iv) আশেপাশের জলাশয় বিষমুক্ত থাকবে এবং জলজ পরিবেশের স্বাভাবিক উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

(v) উৎপাদন বাড়বে।

GM-ফসল কি ক্ষতিকর ?

পরিবেশবাদীরা বরাবরই এর বিরোধিতা করে আসছে। যদিও তাদের কাছে এর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। আমরা জানি প্রতিটি জিন একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে এবং ঐ প্রোটিনই ঐ জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়। কাজেই Bt-ক্রিস্টাল জিনও একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করবে। ঐ প্রোটিন আমাদের দেহে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে কিনা সেটাই প্রধান প্রশ্ন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, Bt-জিন বিশেষ পোকার জন্য বিষাক্ত হলেও মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। এছাড়া Bt-বেগুন উদ্ভাবনের পর পৃথিবীর উন্নত দেশে ১০টির অধিক গবেষণাগারে মাছ, মুরগি, ছাগল, খরগোশ, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীর ওপর গবেষণায় কোনো ক্ষতিকর প্রভাব প্রতীয়মান হয়নি। কাজেই আমরা দ্বিধাহীন মনে Bt-বেগুন খেতে পারবো।

(B) চিকিৎসা বিজ্ঞানে : চিকিৎসা বিজ্ঞানে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টিকা, হরমোন, অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন। রোগ শনাক্তকরণেও এখন ব্যবহৃত হচ্ছে জিন প্রযুক্তি। সুস্থ সবল শিশু জন্মদানের ক্ষেত্রেও এ প্রযুক্তি নিয়ে আসছে আশার আলো।

মানুষের দেহের প্রতিটি কোষ ২৫০০০ পর্যন্ত কর্মক্ষম জিন বহন করে (আরো বহু জিন মানবদেহে আছে যাদের কাজ এখনো জানা সম্ভব হয়নি)। এর যেকোনো একটি নির্দিষ্ট জিন-এ ভ্রম (error) দেখা দিলে দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের এরূপ ৩৫০০টি জেনেটিক ডিস্অর্ডার জানা গেছে। আশা করা হচ্ছে এগুলো রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরীভূত করা যাবে। [MAT:20-21,DAT:19-20]

(i) ইনসুলিন (Insulin) উৎপাদন : ইনসুলিন হলো এক ধরনের হরমোন যা মানব অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স এর β (বিটা) কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। ইনসুলিন মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ের

(Pancreas) β (**বিটা**) **কোষ** হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চমাত্রাকে কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। কোনো কারণে (i) অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে অথবা (ii) কম নিঃসৃত হলে অথবা (iii) নিঃসৃত ইনসুলিন অকার্যকর হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়, অর্থাৎ **ডায়াবেটিস** রোগ হয়। এমতাবস্থায় ডায়াবেটিক রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, তাই ইনসুলিনের চাহিদাও ব্যাপক।

Sir Edward Sharpy–Schafer সর্বপ্রথম ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ইনসুলিন নামক হরমোন আবিষ্কার ও নামকরণ করেন।

বিজ্ঞানী Federick Grant Banting এবং Charles Herbert Best ইনসুলিনের বহুমূত্র রোগ (diabetes) বিরোধী ভূমিকার কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন।

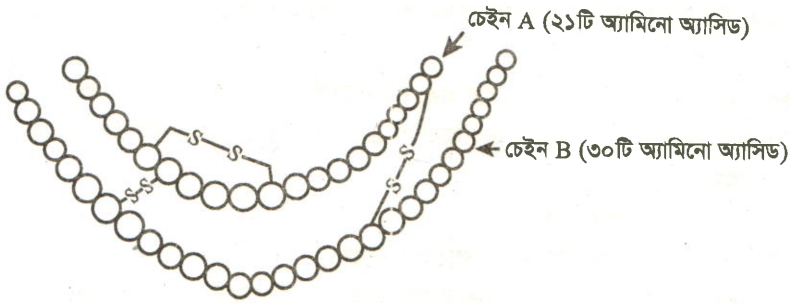

ইনসুলিনের A ও B চেইন। দুটি সিস্টিনের মধ্যে ডাইসালফাইড বন্ড তৈরি হয়

ইনসুলিন ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার সরল প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন (২১টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত **চেইন-A এবং ৩০টি** অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত **চেইন-B**) দুটি ডাইসালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি ইনসুলিন অণু গঠন করে। এর রাসায়নিক সংকেত হলো : $C_{254}H_{377}N_{65}O_{75}S_6$, আণবিক ভর ৫৭৩৪। বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন *E. coli*-তে স্থানান্তর করে ব্যাপক হারে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। একটি ব্যাক্টেরিয়াম কোষে প্রায় দশ লক্ষ অণু ইনসুলিন তৈরি হয়ে থাকে।

বর্তমানে কুসুম ফুলে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন প্রবেশ করানো হয়েছে। এর ফলে কুসুম ফুলের বীজ বা তেলে ইনসুলিন থাকবে। এতে খরচ বহুলাংশে কমে যাবে। এটি প্রায় চূড়ান্ত তবে এখনও বাজারে উন্মুক্ত করা হয়নি।

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন

ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃতিতে এত ইনসুলিন কোথায়? একসময় গরু বা শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন সংগ্রহ করে তা মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো। কিন্তু গরু বা শূকর থেকে নেয়া ইনসুলিন মানুষের জন্য ততটা উপযোগী নয়। কাজেই জিন প্রকৌশল জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের জিনকে ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং এক সময় তা সফল হয়। প্রথমেই মানুষের DNA-তে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। **তা হলো ১১ নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে**। এতে ১৫৩টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত ইনসুলিনের জেনেটিক কোড বিদ্যমান। [MAT:20-21;DAT:19-20]

জিন প্রকৌশল তথা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করেন আমেরিকার Eli Lily & Company, যা ১৯৮২ সালে **প্রথম বাজারজাত** করা হয় **'হিউমুলিন'** নামে।

ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

১। **ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্তকরণ** : মানবদেহে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনটির অবস্থান বর্তমানে শনাক্তকৃত। ১১নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর শীর্ষ অংশের DNA-তে এ জিন অবস্থিত। এটি ১৫৩টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত।

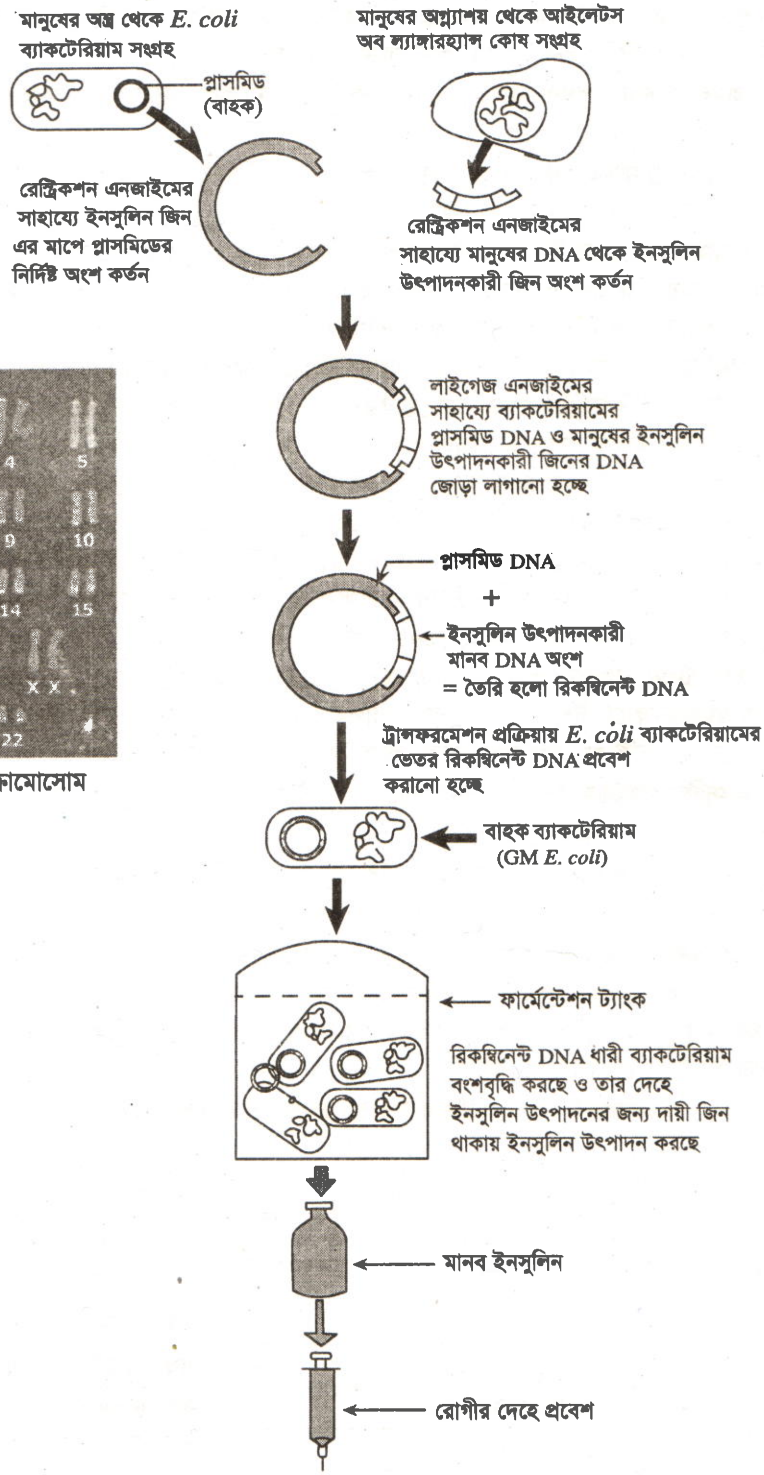

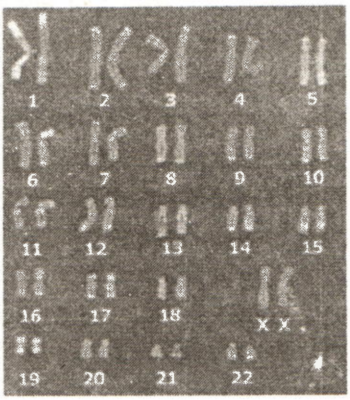

মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম

ইনসুলিন উৎপাদন ও ব্যবহার

চিত্র ১১.৭ : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন তৈরি প্রক্রিয়া।

২। **DNA সূত্র থেকে ইনসুলিন জিন অংশ পৃথককরণ :** রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে মানব DNA থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ বিশেষ উপায়ে কেটে পৃথক করা হয়।

৩। **বাহক প্লাসমিড পৃথককরণ :** ইনসুলিন জিনকে বহন করার জন্য *E. coli* ব্যাকটেরিয়াম থেকে বিশেষ কৌশলে প্লাসমিড পৃথক করা হয়।

৪। ***E. coli* প্লাসমিড DNA-এর একাংশ কর্তন :** রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে ইনসুলিন জিনের সমপরিমাণ প্লাসমিড DNA অংশ কেটে স্থান ফাঁকা করা হয়।

৫। **প্লাসমিড DNA-তে ইনসুলিন জিন স্থাপন :** প্লাসমিড DNA-এর কর্তিত ফাঁকা স্থানে মানুষের ইনসুলিন জিন (DNA অংশ) বসিয়ে দেয়া হয় এবং লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাসমিড DNA এবং মানব DNA সংযুক্ত করে দেয়া হয়। এবার তৈরি হলো রিকম্বিনেন্ট DNA বা রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড।

৬। **রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড একটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো :** এটি করা হয় ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায়। এটি **হিট শক মেথড** অথবা **ইলেক্ট্রিক পাল্স** মেথডে করা হয়। যে ব্যাকটেরিয়া রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড বহন করবে তাকে **Vector** (বাহক) বলা হয়। বাহক অবশ্যই নিজস্ব প্লাসমিড মুক্ত হতে হবে। প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য ভেক্টরকে Competent (উপযুক্ত) হতে হয়। হিট শক মেথড অনুসারে ভেক্টরকে (*E. coli*) প্রথমে $CaCl_2$ দ্রবণে ডুবিয়ে ১৪-১৬ ঘণ্টা বরফে রাখা হয়। এতে *E. coli*-এর কোষ প্রাচীরে Ca লেগে থেকে *E. coli* কোষকে প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য Competent করে থাকে। এরপর *E. coli* কোষ এবং রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডকে একত্রে মিকচার করে একটি পাত্রে আধা ঘণ্টা বরফে, পরে ৪২°C তাপে ৯০ সেকেন্ড এবং পুনরায় ২ মিনিট বরফে রাখলে *E. coli* কোষ শোষণ করে প্লাসমিড দেহাভ্যন্তরে নিয়ে নেয়। এবার *E. coli* কোষ ইনসুলিন জিনসহ **GMO *E. coli*-এ** পরিণত হলো।

৭। **ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে GMO *E. coli* সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ :** এবার GMO *E. coli* তথা ট্রান্সজেনিক *E. coli* কে নির্দিষ্ট কালচার মিডিয়াযুক্ত ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ ট্রান্সজেনিক *E. coli* সৃষ্টি হয় এবং সাথে প্রতি কোষে উৎপাদিত ইনসুলিন জমা হয়।

৮। **ইনসুলিন পৃথকীকরণ :** ইনসুলিন তৈরি হয়ে কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। তাই *E. coli* কোষসমূহকে lysis (বিগলিত) করে ইনসুলিন আহরণ করা হয়।

৯। **ইনসুলিন বিশুদ্ধকরণ :** ব্যাকটেরিয়াকে বিগলন করার মাধ্যমে যে ইনসুলিন পাওয়া যায় তাতে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব অনেক প্রোটিনও থাকা স্বাভাবিক। তাই আহরিত ইনসুলিনকে বিশুদ্ধ করা হয়।

১০। **ইনসুলিন বাজারজাতকরণ :** উৎপাদন পরবর্তীতে উপযুক্ত এম্পুলে ভরে ইনসুলিন বাজারজাত করা হয় এবং ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ও সময়ে পেশিতে পুশ করা হয়। দেহে ইনসুলিন রক্তের সাথে প্রবাহিত হয়ে দেহকোষের মেমব্রেনে উপযুক্ত রিসেপ্টিভ সাইট তৈরি করে যার ফলে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষের ভেতরে প্রবেশ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত কয়েকটি ওষুধ ও এদের প্রয়োগ/ব্যবহার

ওষুধ	প্রয়োগ
১। ইনসুলিন	ডায়াবেটিস চিকিৎসায়
২। ইন্টারফেরন	ক্যান্সার ও ভাইরাসজনিত সংক্রমণে
৩। সেরাম অ্যালবিউমিন	শল্য চিকিৎসায়
৪। র‍্যাবিস ভাইরাস অ্যান্টিজেন	জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসায়
৫। হিউমেন ফ্যাক্টর IV	হিমোফিলিয়ার চিকিৎসায়
৬। টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর (tPA)	হৃদরোগ চিকিৎসায়
৭। সোমাটোস্ট্যানিন	বামনত্ব চিকিৎসায়
৮। হিউমেন ইউরোকাইনেজ	রক্ত সংবহন জটিলতা, প্লাজমিনোজেন সক্রিয়ক
৯। লিম্ফোকাইনস	স্বয়ংক্রিয় ইমিউন কার্যকারিতায়

কাজ : জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি একটি পোস্টার পেপারে অঙ্কন করে ক্লাসে/তোমার পড়ার ঘরে টানিয়ে দাও। [MAT:20-21]

(ii) ইন্টারফেরনস (Interferons) উৎপাদন : ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন প্রোটিন যা ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়। বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে, তেমনই বহিরাগত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, বিষ, অন্য কোনো বস্তু ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি মানবদেহে একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে, এটি দেহের **ইমিউন সিস্টেম** (immune system)। **ইন্টারফেরন হলো প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র** (chemical defence) যা দেহের ইমিউন সিস্টেমের অন্তর্গত। **এক কথায়, ইন্টারফেরন হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন** (defence protein)। কোনো দেহকোষ বিশেষ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে তার প্রতি সাড়া দিয়ে সংক্রমিত কোষ ইন্টারফেরন নামক রাসায়নিক পদার্থ (গ্লাইকো-প্রোটিন) নিঃসরণ করে। নিঃসৃত ইন্টারফেরন আক্রমণকারী ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়, ফলে ভাইরাসটি আর সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না এবং পরবর্তী কোষগুলোকে আর আক্রমণ করতে পারে না। কাজেই সংক্রমিত কোষের চারপাশের কোষগুলো ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়, অধিকন্তু এরা ভাইরাস-প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠে। কাজেই ইন্টারফেরনের কাজ হলো আক্রমণকারী ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়া এবং সুস্থ কোষগুলোকে ভাইরাস প্রতিরোধক্ষম করে তোলা ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **Alick Isaacs & Jean Lindermann ১৯৫৭ সালে ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন।**

ইন্টারফেরনের ব্যবহার : ইন্টারফেরন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির হরমোন, এমনকি একই দেহের বিভিন্ন টিস্যু থেকে বিভিন্ন প্রকার ইন্টারফেরন তৈরি হয়। ভাইরাস আক্রান্ত লিউকোসাইট থেকে এক ধরনের ইন্টারফেরন, ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে অন্য ধরনের ইন্টারফেরন নিঃসরণ হয়। ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত কোষ কর্তৃক ইন্টারফেরন নিঃসৃত হলেও বর্তমানে রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে অধিক পরিমাণে ইন্টারফেরন উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে জটিল হেপাটাইটিস-B, কতক হার্পিস সংক্রমণ, বিভিন্ন ধরনের প্যাপিলোমা (Papilloma) চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া জলাতঙ্ক (rabies) রোগের চিকিৎসায়ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গবেষকগণ ধারণা করছেন যে, ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি রহিত করতে ইন্টারফেরন সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে। **ইন্টারফেরন ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।** MAT

ইন্টারফেরন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

১। মানুষের ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে DNA আহরণ করা হয় এবং তা থেকে ইন্টারফেরন (ইন্টারফেরন-বিটা) কোড বহনকারী জিন পৃথক করা হয়।

২। একটি উপযুক্ত প্লাসমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা হয়।

৩। এবার ইন্টারফেরন জিন অংশকে DNA লাইগেজ এনজাইম দিয়ে প্লাসমিডের কাটা (ফাঁকা) অংশে সংযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ একটি রিকম্বিনেন্ট DNA অণু তৈরি করা হয়।

৪। ইন্টারফেরন জিনসহ রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো হয়।

৫। এবার আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA বিশিষ্ট *E. coli*-এর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি করা হয়। *E. coli* কর্তৃক উৎপাদিত ইন্টারফেরন আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত হয়।

৬। আবাদ মাধ্যম থেকে ইন্টারফেরন পৃথক করে বিশুদ্ধ করা হয়।

৭। বিশুদ্ধকৃত ইন্টারফেরন বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। এরূপ একটি ইন্টারফেরনের বাণিজ্যিক নাম **Betaferon.**

(iii) টিস্যু প্লাসমিনোজেন অ্যাকটিভেটর উৎপাদন (Tissue Plasminogen Activetor = TPA) : মানুষের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে স্ট্রোক করতে পারে অথবা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। সাথে সাথে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দিতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালে প্রথম ব্যাকটেরিয়া কোষ থেকে Streptokinase এনজাইম পাওয়া গেল যা দিয়ে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু এ প্রোটিনটি মানুষের নিজস্ব প্রোটিন নয় বিধায় দেহে বহু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

মাঁনুষের রক্তে এমনিতেই প্লাজমিন এনজাইম (Plasmin enzyme) থাকে যা Plasminogen অবস্থায় বিরাজ করে। প্লাজমিনোজেন নিষ্ক্রিয় (inactive) অবস্থায় থাকে। প্লাজমিনোজেনকে কর্মক্ষম অবস্থায় আনতে হলে TPA-এর দরকার হয়।

TPA তৈরি প্রক্রিয়া :

(i) মানুষের কোষ থেকে TPA জিন এর mRNA পৃথক করা।

(ii) mRNA থেকে cDNA তৈরি করা।

(iii) cDNA-কে উপযুক্ত প্লাসমিডে অন্তর্ভুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা।

(iv) রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো।

(v) আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E. coli*-কে আবাদ করে হাজার হাজার কপি (ক্লোনিং) করা।

(vi) *E. coli* থেকে TPA প্রোটিন পৃথক করে ওষুধ হিসেবে তৈরি করা।

(vii) হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক-এর রোগীর রক্তনালিতে TPA ইনজেক্ট করলে রক্তের ব্লক বিগলিত হয়ে যায় এবং রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

(viii) TPA নিঃসরণকারী জিন মানুষের দেহ থেকে নেয়া বলে এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না :

(iv) ইরিথ্রোপোইটিন (Erythropoietin-EPO) তৈরি : আমাদের কিডনি ইরিথ্রোপোইটিন (EPO) নামক একটি হরমোন তৈরি করে যা রক্ত প্রবাহের সাথে **বোনম্যারো** (bone marrow)-তে প্রবেশ করে। EPO, বোনম্যারো কোষকে বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে এবং প্রচুর RBC (লোহিত রক্ত কণিকা) উৎপন্ন হয়। যাদের কিডনি বিকল হয়ে যায় বা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে তাদের নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হয়। ডায়ালাইসিস-এর সময় এ হরমোনও (EPO) রক্ত থেকে বের হয়ে যায়, ফলে রোগীর দেহে RBC একেবারেই কমে যায়, রোগী তাই রক্তশূন্যতায় ভোগে।

EPO তৈরি প্রক্রিয়া : নিম্নে EPO তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

(i) মানুষের দেহ থেকে EPO জিন পৃথক করা। (ii) পরে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে এবং লাইগেজ এনজাইম দিয়ে সংযুক্ত করে এ জিনকে উপযুক্ত বাহকে (প্লাসমিড) অন্তর্ভুক্ত করা। (iii) পরে এ রিকম্বিনেন্ট DNA-কে অপর ব্যাকটেরিয়াতে (*E. coli*) প্রবেশ করানো। (iv) রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আবাদ মাধ্যমে আবাদ করে হাজার হাজার কপি করা। (v) *E. coli* থেকে EPO প্রোটিন নিষ্কাশন করে ওষুধ হিসেবে প্রস্তুত করা। বর্তমানে হাজার হাজার কিডনি রোগীকে রক্তশূন্যতা দূরীকরণার্থে *E. coli*-তে উৎপন্ন EPO ইনজেকশন দেয়া হচ্ছে।

(v) জিন থেরাপি (Gene therapy) : কোনো নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জিনকে সঠিক করার (to correct) পদ্ধতি হলো জিন থেরাপি। ত্রুটিপূর্ণ জিনটিকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে সরিয়ে দিয়ে ঐ জায়গায় corrected জিন প্রবেশ করানোর মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। দু'টি উপায়ে এটি করা হয়ে থাকে; যথা : (i) গবেষণাগারে corrected জিন সম্বলিত কোষকে জন্মিয়ে রোগীর দেহে ইনজেক্ট করা হয়, অথবা (ii) একটি বাহক (vector), সাধারণত একটি ভাইরাসকে corrected জিনসহ মানুষের DNA বহন করার জন্য পরিবর্তন করা হয় এবং তাকে সরাসরি মানুষের টার্গেট কোষে প্রবেশ করানো হয়। টার্গেট কোষে তখন corrected DNA সংযুক্ত হয়ে যায় এবং রোগ মুক্ত করে।

ভাইরাস কোনো কোষে প্রবেশ করে তার নিজস্ব DNA কে আক্রান্ত কোষের ক্রোমোসোমে সংযুক্ত করতে পারে। এর ওপর ভিত্তি করে (i) ভাইরাসের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কোষে ড্রাগ প্রবেশ করানো যায়। (ii) কাঙ্ক্ষিত জিন প্রবেশ করানো হয় এবং (iii) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২২ সালে জিন থেরাপি প্রয়োগে একজন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা সম্ভব হয়েছে।

(vi) Hepatitis-B ভাইরাস-এর অ্যান্টিজেন তৈরি জিন TMV-এর মাধ্যমে তামাক গাছে প্রবেশ করিয়ে তামাককে হেপাটাইটিস-B ভ্যাকসিন উপযোগী করা হয়েছে। প্রচলিত ভ্যাকসিনের মতো তামাককে আর রেফ্রিজারেটরে রাখা লাগবে না। গ্রামাঞ্চলে সরাসরি এটি ভ্যাকসিন হিসেবে খাওয়া যাবে। এটি এখনও বাজারে উন্মুক্ত করা হয়নি।

(vii) ভূট্টাতে **ওরাল ভ্যাকসিন** উৎপাদন করা হচ্ছে। এটিও বাজারে উন্মুক্ত করা হয়নি।

(viii) **গর্ভের শিশু পরীক্ষা** : মাতৃগর্ভের শিশু কোনো বংশগত বা অন্য কোনো অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কিনা তা 'অ্যামনিওসিস' নামক জিন প্রযুক্তি দ্বারা নিরূপণ করা যায়।

(C) **মলিকুলার ফার্মিং** : ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাদেরকে বায়ো-রিঅ্যাক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা হয়ে থাকে।

(D) **বায়োফার্মিং (Biopharming)** : যখন ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য বড়ো মাত্রায় উৎপাদন করা হয় তখন তাকে বায়োফার্মিং বলে। (i) জীবন রক্ষাকারী **antithrombin** এখন অতি অল্প খরচে ছাগলের মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে। (ii) GMO ছাগলের দুধ থেকে শক্তিশালী **spider silk** উৎপাদন করা হচ্ছে। (iii) ইনসুলিন এখন কুসুম ফুলের বীজের মাধ্যমে উৎপাদনযোগ্য হয়েছে। এতে খরচ খুবই কমে যাবে (উন্মুক্ত হয়নি)।

(E) **পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় (Environmental Management) : যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নত করা যায়, পরিবেশ দূষণকারী উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা যায় তাকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা** বলে। জীবজগতের বসবাসের জন্য চাই সুন্দর পরিবেশ। সুন্দর পরিবেশ ঠিক রাখা ও তৈরি করার জন্য চাই সুন্দর ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

(ক) **কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য** : কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কলকারখানা থেকে নির্গত সায়ানাইড, লেড, মারকারি, কপার এবং জিঙ্ক অত্যন্ত বিষাক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী দূষিত পদার্থ। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যে বিভিন্ন অণুজীব জন্মায় এবং বর্জ্য পদার্থকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে। ফ্রান্স, জাপান, তাইওয়ান এবং ভারতে পেট্রোলিয়াম কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা single cell protein হিসেবে পশু ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অণুজীবের সহায়তায় দুধের (dairy) কারখানা হতে নির্গত বর্জ্য (whey) থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়। কাগজ ও কাগজের মণ্ড (pulp এবং paper industry) থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে *Torula* নামক ঈস্ট জন্মায় যার মধ্যে প্রচুর আমিষ থাকে। *Saccharomyces cerevisiae* এবং *Torula utilis* বর্জ্য পদার্থের মধ্যে জন্মায়। এদের থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

কাগজ শিল্পের কাঁচামাল ব্লিচ করতে ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়। এ ক্লোরিনজনিত দূষণ থেকে পরিবেশকে বিভিন্ন ছত্রাক ব্যবহার করে সহজেই মুক্ত করা যায়। পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পের সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্যকেও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের মাধ্যমে উপকারী সরল দ্রব্যে রূপান্তর করা যায়, ফলে একদিকে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয় এবং অপরদিকে প্রয়োজনীয় লাভজনক দ্রব্য পাওয়া যায়, যেমন— বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড (অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড ইত্যাদি), ইথানল, প্রোটিন, ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যাসিটোন, গ্লিসারিন, গ্লুটানল ইত্যাদি।

(খ) **সমুদ্রে নির্গত তেল পরিশোধন** : দুর্ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নানা উপায়ে সমুদ্রে তেল-এর মাধ্যমে দূষণ (pollution) ঘটতে পারে এবং তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। তেল পানিতে অদ্রবণীয় এবং পানি অপেক্ষা হালকা বলে তা পানির ওপর ভাসতে থাকে এবং চকচকে একটি স্তরের সৃষ্টি করে। তেলের এ স্তর সমুদ্রে বসবাসকারী বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু সমুদ্রে যে সমস্ত **হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব** বাস করে তারা অদ্রবণীয় তেল দানার সাথে লেগে থেকে সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তেলকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে এবং তেল দূষণ থেকে মুক্ত করে। তবে কোনো উপায়ে তেল সমুদ্রের তলায় চলে আসলে বছরের পর বছর তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। কারণ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এ অণুজীবগুলো কাজ করে না। *Pseudomonas, Nocardia, Mycobacteria,* বিশেষ ধরনের ঈস্ট ও মোল্ডজাতীয় ছত্রাক হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব হিসেবে কাজ করে থাকে।

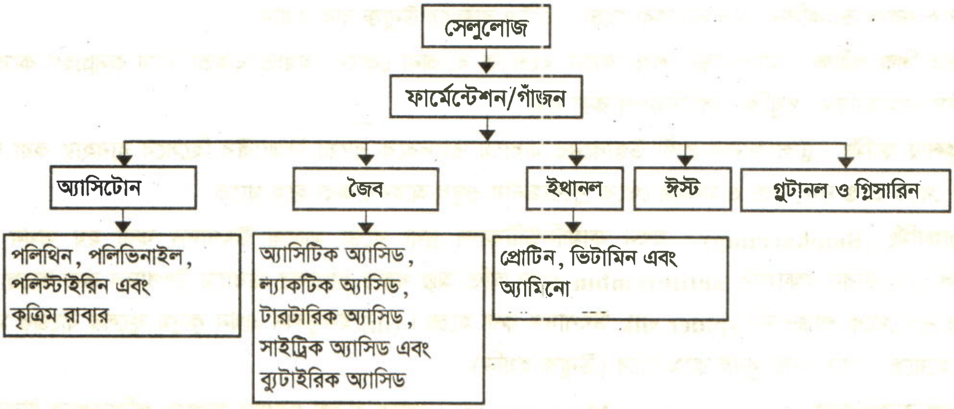

ছক : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্য থেকে বিভিন্ন পদার্থের উৎপাদন।

জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন প্রকরণের *Pseudomonas* ব্যাকটেরিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে যা তেল ও হাইড্রোকার্বনকে অতি দ্রুত নষ্ট করে দিয়ে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে পারে।

(গ) পয়ঃবর্জ্য বা সিউয়েজ আত্তীকরণ : ঘরবাড়ি, মহল্লা বা কৃষিখামার হতে নির্গত মলমূত্র ও জঞ্জালকে সিউয়েজ (sewage) বা নর্দমার ময়লা বলে। অনেক সময় ঝড়বৃষ্টির পরিত্যক্ত পানিও ভূগর্ভস্থ নর্দমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিউয়েজে পরিণত হয়। রোগ উৎপাদনকারী পরজীবীসহ জৈব ও অজৈব পদার্থ নিয়ে সিউয়েজ গঠিত। অজৈব পদার্থ যেমন— কাদা, বালি এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে আলাদা করা হয়। জৈব পদার্থ পানি দূষণের অন্যতম কারণ। তাই সিউয়েজ পানি যাতে খাবার বা ব্যবহার্য পানির সাথে মিশতে না পারে সেজন্য উন্নত দেশে জৈবিক উপায়ে পরিশোধন করা হয়। বায়বীয় বা অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়াসহ শৈবাল, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এরা জৈব পদার্থকে ভেঙে CO_2 ও CH_4 -এ পরিণত করে। CH_4 জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং CO_2 গ্যাসীয় অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে ছাড়া পায়। জৈবিক বিক্রিয়ার পর মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ করে পানি নদী বা সাগরে ফেলা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে সিউয়েজ বিশুদ্ধকরণ করা হয় না বললেই চলে।

বর্তমানে সিউয়েজ আত্তীকরণের সুবিধার জন্য কিছু নির্বাচিত অণুজীবের **স্টার্টার কালচার** তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া সিউয়েজ আত্তীকরণের কিছু প্লান্টও উদ্ভাবিত হয়েছে। এসবের উদ্ভাবনের ফলে সিউয়েজ আত্তীকরণ আরও সহজসাধ্য হয়েছে।

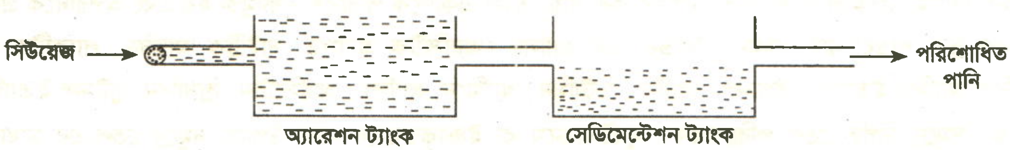

চিত্র ১১.৮ : এক্টিভেটেড স্লাজ পদ্ধতিতে সিউয়েজ পরিশোধন।

বর্তমানে সারা বিশ্বে **এক্টিভেটেড স্লাজ** (activated sludge) পদ্ধতিতে সিউয়েজ পরিশোধন করে পরিশোধিত পানি নদী বা হ্রদে ছাড়া হয়। এটি একটি সহজ জীবজ পদ্ধতি, ফলে পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকে। এ পদ্ধতিতে **অ্যারেশন ট্যাংক** ও **সেডিমেন্টেশন ট্যাংক** নামক দুটি ট্যাংক ব্যবহার করা হয়। প্রথম ট্যাংকে বিভিন্ন অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) সমৃদ্ধ থাকে যারা জৈব বস্তুকে ভেঙ্গে CO_2 ও পানিতে পরিণত করে। দ্বিতীয় ট্যাংকে পানিকে স্থিতিশীল রাখা হয় ফলে নিচে তলানি জমা হয় এবং ওপরে পরিশোধিত পানি থাকে, যা নদী বা হ্রদে ছাড়া হয়। তলানি সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ কাজে ব্যবহৃত একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকটেরিয়াম হলো *Zooglea ramigera.*

জীবপ্রযুক্তির কিছু সম্ভাবনাময় (Prospects of Biotechnology) ক্ষেত্র

সারা বিশ্বের অনেক সমস্যা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের যত্ন, কৃষি, শিল্প ও পরিবেশ। নিচে জীবপ্রযুক্তির কয়েকটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

১। জিন থেরাপি ও আরএনএআই (Gene therapy & RNAi) : বংশগতীয় রোগ, ক্যান্সার এবং কিছু সংক্রামক জটিল রোগের চিকিৎসায় জিন থেরাপির প্রয়োগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী জিনকে corrected জিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। এসব জিনের বাহক হিসেবে ভাইরাস, RNAi ও জিঙ্ক ফিঙ্গার প্রোটিন ব্যবহার করা হয়।

২। মাইক্রো আরএনএ (Micro RNA) : ক্যান্সার, ভাইরাস সংক্রমণ— এসব রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় মাইক্রো আরএনএ-এর ব্যবহার হতে পারে জীবপ্রযুক্তির এক বিশেষ প্রয়োগ। এটি রোগ সৃষ্টিকারী জিনের কাজকে প্রতিরোধ করে।

৩। স্টেম সেল : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে স্টেম সেল কোষ সৃষ্টি করে হারানো অঙ্গের প্রতিস্থাপন, যেকোনো অঙ্গের কোষ তৈরি, নতুন ওষুধের পরীক্ষা ইত্যাদি পূর্বের চেয়ে সহজতর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪। জিনোম স্ক্যানিং : জিনোম স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত যেকোনো জীবের জিনোম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভব হবে।

৫। ন্যানোটেকনোলজি : চাহিদা অনুসারে জৈববস্তুর উৎপাদন করার জন্য ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিধান করা সম্ভব হবে।

৬। GM অণুজীব : অণুজীব ব্যবহার করে পরিবেশের দূষণমাত্রা রোধ করা সম্ভব হবে।

৭। কৃষকের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ও নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন : জীবপ্রযুক্তি কৃষকের বালাইনাশকের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করছে এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে সাহায্য করছে। নিকট ভবিষ্যতে কম দূষকযুক্ত কাগজ ও রাসায়নিক দ্রব্য জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

জিনোম সিকোয়েন্সিং (Genome sequencing)

জিনোম সিকোয়েন্সিং আধুনিক জীবপ্রযুক্তির এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। প্রতিটি জীবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। সাধারণত ক্রোমোসোমগুলো বিভিন্ন গঠন বা ধরনের হয়। **কোনো একটি প্রজাতির একটি নিউক্লিয়াসে সাধারণত ক্রোমোসোমের একটি সেটকে বলা হয় জিনোম** (genome)। হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে একটি জিনোম থাকে, আর ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে দুটি জিনোম থাকে। মানুষের দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। প্রতি জোড়ার একটি করে ২৩টি ক্রোমোসোম মিলিতভাবে গঠন করে মানুষের জিনোম। কাজেই মানুষের দেহকোষে **এক জোড়া জিনোম** আছে।

২০২০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন ফরাসি বিজ্ঞানী ইমানুয়েল কার্পেন্টার ও মার্কিন বিজ্ঞানী জেনিফার এ ডৌডানা। জিনোম সম্পাদনার পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য এ প্রযুক্তির নাম হলো **ক্রিসপার ক্যাস নাইন জেনেটিক সিজার্স**। জীবিত কোষে থাকা DNA-র মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত পরিবর্তন আনার উপায় এটি।

ক্রোমোসোমের মূল উপাদান DNA এবং DNA-এর অংশবিশেষই জিন হিসেবে কাজ করে। কাজেই বলা যায়, একটি জীবে এক সেট ক্রোমোসোমে অবস্থিত সকল জিনসহ পূর্ণাঙ্গ DNA-ই জিনোম। সহজভাবে **একটি জীবকোষে অবস্থিত জিন সমষ্টিকে একত্রে জিনোম বলা হয়।** একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের **'মাস্টার ব্লু-প্রিন্ট'** বলা হয়। [MAT:18-19]

আমরা জানি অসংখ্য নিউক্লিওটাইড বিভিন্ন বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে DNA অণু গঠন করে। এক অণু ডিঅক্সিরাইবোজ শ্যুগার, এক অণু নাইট্রোজেন বেস (অ্যাডিনিন = A, গুয়ানিন = G, থাইমিন = T এবং সাইটোসিন = C) এবং এক অণু ফসফেট সংযুক্ত হয়ে এক একটি নিউক্লিওটাইড গঠিত হয়। **DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলো কোন অনুক্রমে** (কোনটির পর কোনটি) **সজ্জিত থাকে তা হলো জিনোম সিকোয়েন্স, আর এই সিকোয়েন্সটি** (সাজানো পদ্ধতিটি) **উদঘাটন করাই হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং বা DNA সিকোয়েন্সিং।**

একটি DNA স্ট্যান্ড-এর বেস্-পেয়ার (basepairs) সাজানো ক্রম যে প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা হয় তাকে DNA সিকোয়েন্সিং বলে (A process in which the sequence of basepairs in a DNA strands is determined, is known as DNA sequencing.)।

জিনোম সিকোয়েন্সিং কাজটি উন্নত প্রযুক্তি ও বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি নির্ভর। লম্বা DNA অণুটি একসাথে সিকোয়েন্সিং করা সম্ভব হয় না, তাই DNA অণুকে উপযুক্ত দূরত্বে কেটে নেয়া হয় এবং খণ্ডগুলোর সিকোয়েন্সিং করে একসাথে মিলিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিকোয়েন্সিং উপস্থাপন করা হয়। তবে প্রথম দিকে প্রক্রিয়াটি যত ব্যয়বহুল ছিল বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যয় বহুলাংশে কমে এসেছে।

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রবর্তক হলেন **Dr. F. Sanger**, যিনি পরবর্তীতে এ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ **নোবেল পুরস্কার** লাভ করেন। প্রক্রিয়াটি এরূপ : (i) প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট DNA অণুকে রিএজেন্ট সমৃদ্ধ চারটি টিস্টটিউবে ভাগ করে দেয়া হয়, যেখানে বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি DNA খণ্ডের A.T.G.C রেসিডিউ শনাক্ত করবে। (ii) জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে পাশাপাশি চারটি বিক্রিয়ার প্রতিটিকে পৃথক করা হয় এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ ব্যান্ড-এর স্থান ও পরিমাণ (size) থেকে সিকোয়েন্স নির্ণয় করা হয়। (iii) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত X-ray স্ক্যানার ব্যবহার করে ইলেক্ট্রোফোরেসিস-এর রেজাল্ট বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন বা জিনোম সিকোয়েন্সিং : বাংলাদেশি বিজ্ঞানী **ড. মাকসুদুল আলম** ও তাঁর সহযোগীরা তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং তথা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন। পাটের বেস পেয়ার ১২০ কোটি। এরা কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা জিনোম সিকোয়েন্সিং জানার ফলে এখন উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে মিহি আঁশের পাট, শীতকালীন পাট, সহজে পচনযোগ্য পাট, পোকা প্রতিরোধক পাট, ওষুধী পাট, তুলার মতো শক্ত আঁশের পাট ইত্যাদি। কিছুদিন আগে ড. মাকসুদুল আলম মৃত্যুবরণ করেছেন।

অধ্যাপক তোফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি গবেষণাগারে মিলিত গবেষণায় বারমাসী কাঁঠালের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। এর জিনোম ১.০৪ গিগা বেস পেয়ার সমৃদ্ধ।

ফসলী উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং : মুগডাল বাংলাদেশের একটি অন্যতম ডাল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ। কিন্তু হলুদ মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণে এ ফসলের উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পায়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক **ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম** ও গবেষণা সহযোগী দল বাংলাদেশে মুগের হলুদ রোগ উৎপাদনকারী ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করেন এবং RNAi পদ্ধতি ব্যবহার করে হলুদ মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের গবেষণা করছেন। তাঁর দল ICGEB-র আর্থিক সহায়তায় টমেটোর পাতা কোকড়ানো (Tomato leafcurl) রোগ সৃষ্টিকারী ToLCV ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ToLCV প্রতিরোধী টমেটো জাত উৎপাদনের লক্ষ্যে অধিকতর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প (BCSIR) গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা নভেল করোনো ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করেছেন।

কয়েকটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য

জীবের নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা	জিনসংখ্যা	ক্ষারজোড়
E. coli	১	৩২০০	৪.৬ মিলিয়ন
Haemophilus influenzae	১	১৭০০	১.৮ মিলিয়ন
Yeast	১৬	৬০০০	১২.১ মিলিয়ন
Arabidopsis thaliana (পুষ্পক উদ্ভিদ)	১০	২৫০০০	১০০ মিলিয়ন
মানুষ	৪৬	২৫০০০ (+ বহু অপ্রকাশিত)	৩.২ বিলিয়ন

DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট (DNA finger print)

DNA finger prints বুঝতে হলে প্রথমে finger prints সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন। ফিঙ্গার প্রিন্টস বলতে সাধারণত মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ, দাগ বা চিহ্নকে বোঝায়। দুজন মানুষের আঙুলের ছাপ একই রকম হয় না (ক্লোনিং ও আইডেনটিক্যাল টুইন ব্যতীত)। তাই জমিজমা হস্তান্তর বা রেজিস্ট্রি, কাবিননামা রেজিস্ট্রি, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সীম নিবন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্ট রাখা হয়। দুজন মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্টের ভিন্নতা হয় জিন তথা DNA (A.T.G.C) এর ভিন্নতার কারণে। কোনো জীবের DNA-কে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস (Gel electrophoresis)-এর মাধ্যমে (উক্ত DNA এর) যে ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা ছাপ পাওয়া যায় তাকে **DNA finger print** বা **DNA profile** বলে। DNA finger print প্রত্যেক ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট ও স্বকীয় (unique) [A pattern of bands on a gel that is unique to each individual is DNA finger print]

মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট

প্রথমে কোনো জীব তথা মানুষের সম্পূর্ণ DNA সংগ্রহ করে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করা হয় এবং পরবর্তীতে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস-এর মাধ্যমে জেল স্তরের ওপর চালনা করা হয়। ফলে সেখানে DNA খণ্ডগুলো ক্রমান্বয়ে বড়ো থেকে ছোটো হিসেবে কতগুলো সারিবদ্ধ ব্যান্ড হিসেবে জমা হবে। বিশেষ ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি দ্বারা ব্যান্ডগুলোর প্রকৃতি ও পারস্পরিক অবস্থান জানা যায়। প্রত্যেক জীব তথা মানুষের DNA খণ্ডগুলোর এমন ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা চিত্রকে DNA finger print বা DNA profile বলে।

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ (Application of genome sequencing)

কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর মাধ্যমে জানা যায় ঐ প্রজাতির DNA অণুতে অবস্থিত ATGC গুলো কোনটার পর কোনটার অবস্থান অর্থাৎ এদের অনুক্রম। DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে সব অংশে ATGC একই অনুক্রমে অবস্থান করে না, কখনো কখনো একই সাথে পরপর একাধিক A বা একাধিক T থাকতে পারে।

কোনো জীবের জীবনরহস্য জানার প্রথম ধাপ হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং। জিনোম সিকোয়েন্সিং জানলেই জীবের সমস্ত জেনেটিক তথ্য জানা যায় না। সিকোয়েন্সিং-এর পর জানা সহজ হয় কোথায় কোন জিনের অবস্থান, জিনের গঠন, জিনের পরিধি এবং কোন জিনের কি কাজ। কোনো জিনের অবস্থান, গঠন, পরিধি ও কাজ জানতে পারলেই ঐ জিনটিকে ব্যবহার করা যায়।

DNA ফরেনসিক্স (DNA Forensics)

(১) **অপরাধী শনাক্তকরণে :** ভিক্টিম বা অপরাধ সংঘটিত হবার স্থান থেকে আলামত সংগ্রহ করে জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। এরপর সন্দেহভাজন তালিকা ধরে তাদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। যার জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে আলামত থেকে নেয়া সিকোয়েন্সিং এর মিল হবে সেই প্রকৃত অপরাধী। অজ্ঞাত বা খুন হওয়া ব্যক্তির পরিচয় জানতে DNA সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মৃত অজ্ঞাত **ব্যক্তির** DNA সিকোয়েন্সিং করে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

(২) **পিতৃত্ব নির্ধারণে :** অনেক সময় সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে পিতৃত্ব দাবিকৃত ব্যক্তিদের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিলিয়ে দেখা হয়। যার জিনোমের সাথে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিল সম্পন্ন হবে, তিনিই হবেন সন্তানের প্রকৃত পিতা।

(৩) **স্বজন নির্ধারণে :** সাভারে রানা প্লাজার মর্মান্তিক ঘটনায় পরিচয়হীন শ্রমিকদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে তার সাথে তার দাবিকৃত আত্মীয়দের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে মিল পাওয়ার পর লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকাও দেয়া হয়েছে।

(৪) **শ্রেণিবিন্যাসের স্তর নির্ধারণ :** জিনোম সিকোয়েন্সিং করে জানা হলো আর্কিব্যাক্টেরিয়া, ব্যাক্টেরিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠী থেকেও পৃথক, কারণ ১৭৩৮টি জিনের অর্ধেকেরও বেশি জিন অন্য সকল জীবগোষ্ঠী থেকে পৃথক। তাই আর্কিব্যাক্টেরিয়াকে পৃথক অধিরাজ্য (Domain) করা হয়েছে।

(৫) **শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্ট্যের মিল নির্ধারণে :** আর্কিব্যাক্টেরিয়ার rRNA এর বেস সিকোয়েন্স ব্যাক্টেরিয়ার সাথে মিল সম্পন্ন। তাই আর্কিব্যাক্টেরিয়া ও ব্যাক্টেরিয়া ঘনিষ্ঠতম।

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো :

জিনোম সিকোয়েন্সিং আধুনিক জীবপ্রযুক্তির এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

১। যেকোনো প্রকৃতির জীব থেকে বিশেষ কোনো জিনকে শনাক্ত করা এবং পরবর্তীতে পৃথক করা; যেমন— মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন। এটি ১১নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে অবস্থিত। (চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

২। উদ্ভিদের রোগপ্রতিরোধ, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী বা প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী জিন অনুসন্ধান করা; যেমন— Bt toxin জিন Cry1AC এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন PDH 45 (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

৩। উদ্ভিদের মান উন্নয়নের জন্য উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিন অনুসন্ধান এবং জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে তাকে সফলভাবে ব্যবহার করা; যেমন— গোল্ডেন রাইস এর বিটা-ক্যারোটিন জিন। (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)

৪ জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য উদ্ভিদ বা অণুজীবের **মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ;** যেমন— ধান, পাট, ভূট্টা ইত্যাদি ফসলের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য অন্যান্য মৌলিক গবেষণায় প্রয়োগ।

৫। গবাদি পশুর মাংস, দুধের পুষ্টি গুণাগুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে জিনোম সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬। মানব জিনোম সিকোয়েন্সিং দ্বারা মানব জিনোমের অনেক তথ্যই এখন উন্মোচিত হয়েছে, ফলে এ তথ্যসমূহ চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ অনেক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে; যেমন— ইনসুলিন জিন–এর প্রয়োগ।

৭। যেকোনো জীবে জিনের প্রকাশ (expression of gene) কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং এই তথ্যসমূহ **গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ**।

৮। ধর্ষণকৃত মহিলার গোপন অঙ্গ থেকে প্রাপ্ত শুক্রাণু অথবা কাপড় ও শরীরে অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত শুক্রাণুর DNA পরীক্ষা করে ধর্ষণকারীর রক্তের DNA-এর মিল দেখে ধর্ষণকারী নির্ধারণ করা যায়।

৯। হাসপাতালে যদি কোনো নবজাতক বদল হয়ে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে বদল করা হয় তবে মা এবং বাচ্চার কোষের DNA পরীক্ষা করে বাচ্চার মা শনাক্ত করা যায়।

১০। দুর্ঘটনায় নিহত ও বিকৃত নামের শনাক্তকরণেও জিনোম সিকোয়েন্সিং ব্যবহার করা যায়।

১১। জীবতথ্য বিদ্যার (Bioinformatics) জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান জিনোম সিকোয়েন্সিং উপাত্ত থেকে গ্রহণ করা।

১২। বন্য জীবজন্তু যেমন— সিংহ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির ভালো ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে প্রজননের ক্ষেত্রে DNA সিকোয়েন্সিং কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১৩। এছাড়া জৈব জ্বালানি উদ্ভাবন, ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ, ইন্টারফেরন উৎপাদন ও ক্যান্সার গবেষণায় জিনোম সিকোয়েন্সিং সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কাজ : জীবপ্রযুক্তির সাফল্যজনক প্রয়োগসমূহ নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তার (Biosafety) বিধানসমূহ

সৃষ্টিকর্তা মানুষের কল্যাণের জন্যই অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক ভারসাম্য অবস্থা। তাছাড়া হাজার হাজার বছরের ব্যবহারের মাধ্যমে জানা হয়েছে কোনটি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, আর কোনটি ক্ষতিকারক নয়। এরপরও কোনো ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কোনো প্রাকৃতিক বস্তু গ্রহণ বা ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার জন্য অন্য কাউকে অভিযুক্ত করার উপায় নেই। **যে বিষয়ের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ বিভিন্ন সংক্রামক ও** GMOs (Genetically Modified Organisms) **এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে সংরক্ষিত করা হয় তাকে জীবনিরাপত্তা** (biosafety) বলে।

জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হচ্ছে GMO (Genetically Modified Organism)। GMO ব্যবহার করার পূর্বে জেনে নিতে হবে এটি মানুষের কোনো ক্ষতির কারণ হয় কি-না, বিশেষ করে যেগুলো মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য ও ওষুধরূপে ব্যবহার করা হবে। যেমন Bt. cotton নামক পোকা আক্রমণরোধী তুলা একটি GMO উদ্ভিদ। তুলা থেকে সুতা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা হবে যা মানুষের সরাসরি কোনো ক্ষতির কারণ হবে না কিন্তু Bt. Brinjal নামক পোকা আক্রমণরোধী GMO বেগুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি চাষের জন্য কৃষকের কাছে দেয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে এ বেগুন খেলে মানুষের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় কিনা। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে যে এ Bt বেগুন মানুষের **ইমিউন** সিস্টেমের বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতি করবে না।

জীবপ্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত GMO সমূহের ওপর গবেষণা, ব্যবহার এবং প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশনাকে Biosafety Guidelines বলে। এ নির্দেশিকায় GMO উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করার নীতিমালা ছাড়াও, GMO নিয়ে মাঠ পরীক্ষণ, নিরাপদ স্থানান্তর, আমদানি এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মাবলি এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। **এ নির্দেশিকার মুখ্য বিষয়বস্তু হলো GMO ব্যবহারের পূর্বে জীববৈচিত্র্য, প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকি পরিহার, নিরূপণ এবং তাকে মোকাবিলা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে পরিচালিত করা।**

এ Biosafety Guidelines এর আওতায় বাংলাদেশে একটি জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি (National Committee on Biosafety) ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (Institutional Biosafety Committee) গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও জীবনিরাপত্তা কোর কমিটি (Biosafety Core Committee), মাঠ পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কমিটি (Field Level Biosafety Committee) এবং জীব নিরাপত্তা অফিসার (Biological Safety Officer) গঠন করা হয়েছে।

Biosafety Guidelines এর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১। জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

২। GMO প্রয়োগের/ ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য সব ধরনের ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।

৩। জীববৈচিত্র্য প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের ওপর GMO-এর ক্ষতিকারক দিক নির্ণয় করা এবং তার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

৪। GMO ক্ষতিকারক নয় প্রমাণিত হলে তবেই প্রবর্তন করা।

ঝুঁকি নির্ধারণ

জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, টেকসই ব্যবহার এবং পরিবেশের ওপর কোনো GMOs বা LMOs (Living Modified Organisms) এর কী ধরনের প্রতিকূল প্রভাব থাকতে পারে তার ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে। Cartagena Protocol এর অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী ঝুঁকি নির্ধারণ করতে হবে। পরীক্ষাধীন GMOs/LMOs এর বৈশিষ্ট্য ক্ষতিকারক হলে, তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা বিবেচনা করে ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

ঝুঁকি নির্ধারণ পদ্ধতি : ঝুঁকি নির্ধারণের সময় নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষের অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাদের সহায়তা নিতে হবে। ঝুঁকি নির্ধারণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

১। পরীক্ষাধীন GMO/LMO-র এমন কোনো জিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত হয় যা জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অতিদ্রুত তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।

২। সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ শনাক্ত করে ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা কতটুকু তা নির্ধারণ করতে হবে।

৩। নির্ধারিত বিরূপ প্রভাবের পরিণতি কী হতে পারে তা মূল্যায়ন করতে হবে।

৪। মূল্যায়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরীক্ষাধীন GMO/LMO-এর সার্বিক ঝুঁকি ও সম্ভাব্য পরিণতি অনুধাবন করা যাবে।

৫। সর্বশেষ ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য কিনা তা বিবেচনা করে সুপারিশ করতে হবে।

গবেষণাগারে GMOs/LMOs নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধানসমূহ :

১। গবেষণার মূলনীতি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

২। দক্ষ ও অভিজ্ঞ গবেষক নিশ্চিত করতে হবে।

৩। গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

৪। গবেষণাগারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরাপত্তা বিধানসমূহ অনুসৃত হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকগুলো অনুসন্ধান করতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে GMOs/LMOs ব্যবহার বা অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধানসমূহ :

১। মাঠ পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি রোধে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

২। যে পরিবেশে এদের প্রয়োগ করা হবে তার ওপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করতে হবে। সর্বোপরি মানবস্বাস্থ্যের উপর এদের প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে।

৩। GMOs/LMOs এর জেনেটিক ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ওপর পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবক কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ণয় করতে হবে।

৪। কোনো GMOs/LMOs এর যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ বা মানবস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোকে মাঠ পর্যায়ে অবমুক্ত করা যাবে না।

সার-সংক্ষেপ

টিস্যু কালচার : গবেষণাগারে কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে কোনো বিভাজনক্ষম টিস্যুর সংখ্যাবৃদ্ধিই টিস্যু কালচার। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে অল্প সময়ে হাজার হাজার চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো একই বয়সের হয় এবং গুণগত মান বজায় থাকে, ফলে ফলন বাড়ে। একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভাইরাসমুক্ত বীজ তৈরি করা হয়, ফলে ফসল ভাইরাস আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে এবং ফলন হ্রাস পায় না, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : কোনো জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত কোনো জিন পৃথক করে নিয়ে অন্য কোনো কাঙ্ক্ষিত জীবকোষে প্রতিস্থাপন করাই হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল। এতে দুটি পৃথক DNA-এর অংশের সমন্বয়ে একটি নতুন প্রকৃতির DNA তৈরি হয়, যাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট DNA। রিকম্বিনেন্ট DNA দিয়ে তৈরি নতুন বৈশিষ্ট্যের জীবকে বলা হয় GMO (genetically modified organism)। বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ করে পতঙ্গবিরোধী ভুট্টা, ভাইরাস বিরোধী পেঁপে, সুপার রাইস, ইনসুলিন প্রভৃতি উৎপাদন করা হচ্ছে।

প্লাসমিড : বিভিন্ন অণুজীবে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া কোষে তাদের মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও এক বা একাধিক বৃত্তাকার DNA থাকে। ক্রোমোসোম বহির্ভূত এসব বৃত্তাকার DNA-কে বলা হয় প্লাসমিড। *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাসমিডের সন্ধান পান Laderberg ১৯৫২ সালে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্লাসমিড অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপাদান। প্লাসমিড বিভিন্ন রকম হতে পারে।

ইনসুলিন : ইনসুলিন একটি হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ের বিটা-কোষ হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চমাত্রা থেকে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। দেহে ইনসুলিনের অভাব হলে ডায়াবেটিস রোগ হয়। ইনসুলিন ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন দুটি ডাই-সালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে ইনসুলিন গঠন করে। বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন নিঃসরণকারী জিনকে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। ডায়াবেটিক রোগ চিকিৎসার প্রধান হাতিয়ার হলো ইনস্যুলিন।

জিনোম সিকোয়েন্সিং : কোনো জীবের জিনোমস্থ DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে নিউক্লিওটাইডসমূহ (ATGC) কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানাই হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং বা DNA সিকোয়েন্সিং। কোনো জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন হলে তার বিভিন্ন জিনের অবস্থান ও কার্যকারিতা জানা সহজ হয়। জিনের অবস্থান ও কাজ জানা গেলে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণ করা সম্ভব হয়। GMO = Genetically Modified Organism; LMO = Living Modified Organism।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১। বায়োটেকনোলজি শব্দটি ১৯১৯ সালে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky)।

২। প্রাচীনতম বায়োটেকনোলজি বা জীবপ্রযুক্তির একটি উদাহরণ হলো দুধ থেকে দই তৈরি।

৩। জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবকল্যাণে ব্যবহারোপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা কোনো দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি হলো **জীবপ্রযুক্তি** বা **বায়োটেকনোলজি** (কোলম্যান-**১৯৬৮**)।

৪। ব্লু-বায়োটেকনোলজি বলতে বায়োটেকনোলজির সামুদ্রিক প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়।

৫। গ্রিন বায়োটেকনোলজি বলতে বায়োটেকনোলজির কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়।

৬। রেড এ্যান্ড হোয়াইট বায়োটেকনোলজি বলতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বায়োটেকনোলজির প্রয়োগ নির্দেশ করা হয়।

৭। উদ্ভিদের বিভাজনে সক্ষম কোনো অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত অবস্থায় পুষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াকে **টিস্যুকালচার** বলে।

৮। উদ্ভিদের প্রতিটি সজীব কোষের একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বলা হয় **টটিপটেন্সি**।

৯। উদ্ভিদের অতি ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করে অধিক সংখ্যক পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি প্রক্রিয়াকে **মাইক্রোপ্রোপাগেশন** বলা হয়।

১০। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী Gottlieb Habarlandt কে টিস্যুকালচার প্রযুক্তির জনক বলা হয়।

১১। গবেষণাগারে কাচপাত্রে কালচার করাকে *In-vitro* কালচার বলা হয়।

১২। টিস্যুকালচারের জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদাংশকে **এক্সপ্লান্ট** বলা হয়।

১৩। এক্সপ্লান্ট থেকে সৃষ্ট অবয়বহীন টিস্যুগুচ্ছকে **ক্যালাস** বলা হয়।

১৪। কোনো জীবকোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত জিন নিয়ে অন্য কোনো জীবকোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করা অথবা নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA-তে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয়।

১৫। কোনো কাঙ্ক্ষিত জিন অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সৃষ্ট জীবকে GMO (Genetically Modified Organism) বা GEO (Genetically Enginered Organism) বলা হয়।

১৬। একটি জীবের কোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত DNA-এর অংশ (জিন) কেটে নিয়ে অন্য জীবের কোষের DNA-এর সাথে সংযুক্ত করার ফলে সৃষ্ট নতুন প্রকৃতির DNA-কে Recombinant DNA বলে।

১৭। জিন প্রকৌশলগত যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA-তে কাঙ্ক্ষিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় তাকে **রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে।**

১৮। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোসোম ছাড়া যে বৃত্তাকার দ্বিসূত্রক DNA অণু বিরাজ করে তাকে **প্লাসমিড** বলে।

১৯। Laderberg ১৯৫২ সনে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে সর্বপ্রথম প্লাসমিডের সন্ধান পান।

২০। ট্রান্সজেনিক ও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে *E. coli, Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়া অধিকহারে ব্যবহার করা হয়।

২১। যে এনজাইম প্রয়োগ করে DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স কেটে নেয়া যায় সেই এনজাইমকে রেস্ট্রিকশন **এনজাইম** বলে। যে সিকোয়েন্সকে কেটে নেয়া হয় তাকে **রেস্ট্রিকশন সাইট** বা **রিকগনিশন সাইট** বলা হয়।

২২। রেস্ট্রিকশন এনজাইম ব্যাকটেরিয়াতেই তৈরি হয়। কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম হলো Bam HI, Hind III, Eco RI ইত্যাদি।

২৩। কাঙ্ক্ষিত নতুন জিনের অন্তর্ভুক্তির ফলে সৃষ্ট নতুন প্রকৃতির উদ্ভিদকে **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** বলে।

২৪। রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষক কোষে প্রবেশ করানোর জন্য নিম্নলিখিত যেকোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় : ভৌতিক প্রক্রিয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়া অথবা ভেক্টর প্রক্রিয়া।

২৫। কোনো কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যা বৃদ্ধি করাই হলো **জিন ক্লোনিং।**

২৬। পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশনকে সংক্ষেপে PCR বলা হয়।

২৭। জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যে ফসল উৎপন্ন করা হয় তাকে GM ফসল বলে। Bt-বেগুন একটি GM ফসল। *Bacillus thuringiensis* এর জিন অন্তর্ভুক্তিকে Bt-দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

২৮। দুটি চেইন-এ মোট ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে মানুষের **ইনসুলিন গঠিত।**

২৯। মানুষের ১১ নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর শীর্ষ অংশের DNA তে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অবস্থিত।

৩০। হিউমুলিন জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে সৃষ্ট ইনসুলিনের ট্রেড নাম।

৩১। **ইন্টারফেরন** হলো একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন যা সাধারণত কোনো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে দেহে তৈরি হয়।

৩২। TPA হলো Tissue Plasminogen Activator এর সংক্ষিপ্ত রূপ। TPA জমাট রক্ত তরল করার নিষ্ক্রিয় এনজাইম Plasminogen কে সক্রিয় করে তোলে।

৩৩। মানবদেহে কোনো নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জিনকে সংশোধন করার পদ্ধতি হলো **জিনথেরাপি।**

৩৪। কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য বৃহত্তর জীবের মাধ্যমে অধিক মাত্রায় উৎপাদন প্রক্রিয়া হলো **বায়োফার্মিং** (Biopharming), যেমন ছাগলের মাধ্যমে **অ্যান্টিথ্রমবিন** উৎপাদন।

৩৫। তেল ও হাইড্রোকার্বনকে অতি দ্রুত পরিবর্তন করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার জন্য জিন প্রকৌশল প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন *Pseudomonas* ব্যাকটেরিয়া।

৩৬। কোনো জীবকোষে অবস্থিত **জিন সমষ্টিকে** ঐ জীবকোষ তথা ঐ জীবের **জিনোম** বলা হয়।

৩৭। একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের **মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট** বলা হয়।

৩৮। কোনো DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলোর অনুক্রমিক সাজানো পদ্ধতি হলো ঐ DNA অণুর **জিনোম সিকোয়েন্স**। কোনো DNA অণুর জিনোম সিকোয়েন্স উদঘাটন পদ্ধতি হলো **জিনোম সিকোয়েন্সিং**।

৩৯। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল হক (এখন প্রয়াত) ও তাঁর সহযোগীরা **তোষা পাটের** (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং করেন, যাতে বেসপেয়ার আছে ১২০ কোটি।

৪০। কোনো জীবের DNA কে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করলে জেল-এ যে সুনির্দিষ্ট **ব্যান্ড প্যাটার্ন** সৃষ্টি হয় তাকে **DNA ফিংগারপ্রিন্ট** বলা হয়। হাতের আঙ্গুলের ছাপের মতোই DNA ফিংগারপ্রিন্ট কোনো ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্বকীয়। একে DNA প্রোফাইলও বলা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। DNA-কে খণ্ডিত করে—

(ক) লাইগেজ এনজাইম (খ) রেস্ট্রিকশন এনজাইম

(গ) প্রোটিয়েজ এনজাইম (ঘ) অ্যামাইলেজ এনজাইম

২। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার ধাপ হলো—

(i) কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন

(ii) নির্দিষ্ট স্থানে DNA অণুকে ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম নির্বাচন

(iii) ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

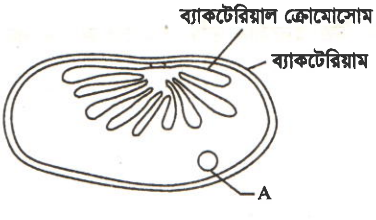

৩। চিত্রের A চিহ্নিত বস্তুটি—

(i) দ্বিসূত্রক (ii) স্বপ্রজননক্ষম (iii) জৈব ছুরি (নাইফ) হিসেবে কাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। 'A' চিহ্নিত বস্তুটি মানবকল্যাণে কাজ করে–

(ক) পনির উৎপাদনে (খ) বায়োগ্যাস তৈরিতে

(গ) ইনসুলিন উৎপাদনে (ঘ) মাখন উৎপাদনে

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (খ)	২। (ক)	৩। (ক)	৪। (গ)

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

১। উদ্দীপকটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

'A' জিন মিষ্টির জন্য দায়ী এবং 'B' জিন আকারের জন্য দায়ী। একটি আম মিষ্টি কিন্তু আকারে ছোটো এবং 'A' জিনটিকে যদি বড়ো আমে স্থানান্তরিত করা হয় তা হলে আমটি মিষ্টি এবং আকার বড়ো হবে।

(ক) টিস্যু কালচার পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও।

(খ) প্লাসমিড বহনকারী একটি অণুজীবের নাম এবং এর গুরুত্ব লেখ।

(গ) 'A' জিনটিকে কীভাবে বড়ো আকৃতির আমে দ্রুত স্থানান্তর করা সম্ভব হবে?

(ঘ) 'B' জিনটিকে 'A' জিনধারী আমে স্থানান্তর করলে কী রকম ফল হবে ব্যাখ্যা করো।

২। একটি হরমোনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়। দিন দিন ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত হরমোনটির চাহিদা আরো বাড়ছে। এক সময় গরু বা শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে এ হরমোন সংগ্রহ করা হলেও মানুষের জন্য উপযোগী ছিল না। তাই জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে বর্তমানে অধিক বিশুদ্ধ ও বিপুল পরিমাণ ইনসুলিন কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হচ্ছে মানুষের জন্য।

(ক) জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) কী?

(খ) জিন ক্লোনিং বলতে কী বুঝ?

(গ) উল্লেখিত হরমোনটির গুরুত্ব বর্ণনা করো।

(ঘ) "জিন প্রকৌশল" এর মাধ্যমে উক্ত হরমোন তুমি কীভাবে উৎপন্ন করবে?

প্রধান শব্দসমূহ :
প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী, বায়োম জীববৈচিত্র্য, কনজারভেশন, ইন সিটু, এক্স সিটু

দ্বাদশ অধ্যায়

জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ

ENVIRONMENT, DISTRIBUTION AND CONSERVATION OF LIVING ORGANISMS

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব বাস করে। সব পরিবেশে সব জীব প্রজাতি বাস করতে পারে না। মাছের জন্য চাই জলজ পরিবেশ, মানুষের জন্য চাই স্থলজ পরিবেশ। সব মাছ কি একই জলজ পরিবেশে পাওয়া যায়? না, খাল বিলের মাছ সাধারণত খরস্রোতা নদীতে পাওয়া যায় না, ইলিশ মাছ খাল-বিল-পুকুর-ডোবায় পাওয়া যায় না, তিমি মাছ খরস্রোতা নদীতেও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ আছে, যার বাইরে এরা বাস করতে পারে না। জীবের পরিবেশ কি? কোনো জীবের চারপাশের জড় (মাটি, পানি, আলো, বাতাস ইত্যাদি) এবং জীবজ (যেমন অন্যান্য জীব তথা উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব) বস্তু দিয়েই ঐ জীবের পরিবেশ গঠিত। আর পরিবেশ অনুযায়ী এদের বিস্তার ঘটে। কতক উদ্ভিদ আছে যা বাংলাদেশের সব জেলাতেই পাওয়া যায়, আবার এমন উদ্ভিদও আছে যা কেবল চট্টগ্রাম অথবা কেবল সুন্দরবনে পাওয়া যায়। জীবের বিস্তার ঘটে তার উপযোগী পরিবেশ অনুযায়ী। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রজাতির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়, তখন দরকার পড়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা। জীবের পরিবেশ, বাসস্থান, বিস্তার ইত্যাদি বিষয় প্লান্ট ইকোলজি শাখায় আলোচনা করা হয়। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে H. Reiter নামক জার্মান বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম Ecology শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রিক Oikos (অর্থ বাসস্থান) এবং logos (অর্থ জ্ঞান) হতে Ecology শব্দটি এসেছে। ইকোলজি হলো পরিবেশের আন্তঃক্রিয়াদির অধ্যয়ন যা জীবের বণ্টন, প্রাচুর্য, উৎপাদন ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে এদের মঙ্গল সাধন করে। এ অধ্যায়ে এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—

- ❖ প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায় ব্যাখ্যা।
- ❖ ইকোলজিক্যাল পিরামিডের প্রকারভেদ (চিত্রসহ)।
- ❖ বিভিন্ন প্রকার পিরামিডের মধ্যে তুলনা।
- ❖ জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জীবের অভিযোজন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা।
- ❖ বিভিন্ন ধরনের বায়োম সম্পর্কে বর্ণনা।
- ❖ প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে ধারণা।
- ❖ ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা।
- ❖ বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।
- ❖ বিভিন্ন বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম।
- ❖ উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।
- ❖ উপকূলীয় এলাকায় বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা।
- ❖ বিলুপ্তপ্রায় জীব সম্পর্কে ব্যাখ্যা।
- ❖ জীব বিলুপ্তির কারণসমূহ।
- ❖ বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।
- ❖ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি।
- ❖ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব।
- ❖ বিলুপ্ত জীব সংরক্ষণে সচেতনতা।

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায়
পাঠ ২	বাস্তুতন্ত্র ও ইকোলোজিক্যাল পিরামিড
পাঠ ৩	জীবের অভিযোজন : জলজ পরিবেশে অভিযোজন
পাঠ ৪	জীবের অভিযোজন : মরুজ পরিবেশে অভিযোজন
পাঠ ৫	জীবের অভিযোজন : লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজন
পাঠ ৬	বায়োম : স্থলজ বায়োম
পাঠ ৭	বায়োম : জলজ বায়োম
পাঠ ৮	প্রাণিভূগোল
পাঠ ৯	ওরিয়েন্টাল অঞ্চল
পাঠ ১০	বাংলাদেশের বনাঞ্চল : চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বনাঞ্চল
পাঠ ১১	বাংলাদেশের বনাঞ্চল : পর্ণমোচী বা পত্রঝরা বনাঞ্চল
পাঠ ১২	বাংলাদেশের বনাঞ্চল : ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল
পাঠ ১৩	উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সবুজ বেষ্টনী
পাঠ ১৪	বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় জীব
পাঠ ১৫	জীববৈচিত্র্য
পাঠ ১৬	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ ১৭	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব
পাঠ ১৮	IUCN Red List Categories

• RMDAC

প্রজাতি (Species)

বিজ্ঞানীদের কাছে জীবের পরিচিতি সব সময়ই প্রজাতি নির্ভর। পৃথিবীতে কত জীব আছে তা বলা হয় না, বা জানতে চাওয়া হয় না, জানতে চাওয়া হয় কত প্রজাতির জীব আছে। বাংলাদেশে কত প্রজাতির মাছ আছে, বা কত প্রজাতির পুষ্পক উদ্ভিদ আছে তাই জানতে চাওয়া হয়। পৃথিবীর সকল মানুষ এক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। তা হলে প্রজাতি কি? **প্রজাতি বলতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিলসম্পন্ন একদল জীবকে** (উদ্ভিদ, প্রাণী) **বোঝায় যারা নিজেদের মধ্যে যৌন মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম কিন্তু অন্যদলের সদস্যের সাথে মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম**। একই প্রজাতির সদস্যসমূহ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত। সাধারণত একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত দুটি জীব তাদের মধ্যে যৌন মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়। দুটি জীবের মধ্যে যৌন মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপন্ন না হলে ধরে নেয়া হয় জীব দুটি একই প্রজাতিভুক্ত নয়, তারা পৃথক প্রজাতিভুক্ত। উর্বর সন্তান উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয়কৃত স্পিশিস হলো বায়োলজিক্যাল স্পিশিস, আর প্রজাতির এ ধারণাকে বলা হয় **বায়োলজিক্যাল স্পিশিস কনসেপ্ট**।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রজাতির গতানুগতিক ধারণা ভিন্ন রকম, কারণ দুটি মিলসম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রস করে তাদের উর্বর সন্তান সৃষ্টি হয় কিনা তা পরীক্ষা করা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই **শ্রেণিবিন্যাসবিদগণ কেবল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই প্রজাতি নির্ণয় করে থাকেন**। প্রজাতি নির্ণয়ে এক সময় কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ধরা হলেও বর্তমানে প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, পরাগরেণুর বৈশিষ্ট্য, ক্রোমোসোমাল বৈশিষ্ট্য, এমনকি DNA, RNA ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যও আমলে নেয়া হয়।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটি ভিন্নজীবকে কখন পৃথক প্রজাতিভুক্ত করা হবে? এর মধ্যেও মতের ভিন্নতা আছে। বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে জীব দুটি এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্যমণ্ডিত হতে হবে এবং এ পার্থক্য হতে হবে বিচ্ছিন্ন, এদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বা মাধ্যমিক পর্যায় থাকলে পৃথক প্রজাতিতে বিভক্ত করা যাবে না।

একটি সহজ উদাহরণ দিলে এটি বুঝতে সুবিধা হবে। বাংলাদেশে পাটের দুটি প্রজাতি চাষ করা হয়। প্রজাতি দুটি হলো *Corchorus capsularis* (সাদা পাট) এবং *Corchorus olitorius* (তোষা পাট)। গঠন বৈশিষ্ট্যে প্রজাতি দুটি অত্যন্ত কাছাকাছি। এদের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য ফলের আকৃতি ও আকারে।

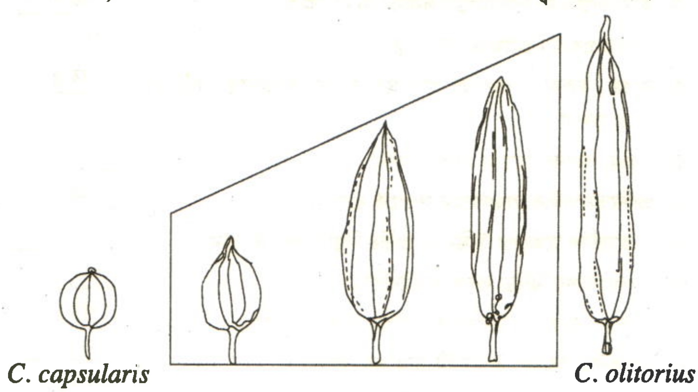

প্রজাতি দুটির ফলের পার্থক্য বিচ্ছিন্ন (discontinuous)। চিত্রে প্রদর্শিত মাধ্যমিক পর্যায়গুলোর অস্তিত্ব থাকলে প্রজাতি দুটিকে আলাদা করা হতো না, দুটি একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হতো। যেহেতু এদের মধ্যে কোনো নিরবচ্ছিন্নতা নেই (continuity নেই) সেহেতু প্রজাতি দুটি পৃথক। *C. capsularis*-এর সাথে *C. capsularis* ইন্টারব্রিডের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। *C. olitorius*-এর সাথে *C. olitorius* ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু *C. capsularis*-এর সাথে *C. olitorius* ইন্টারব্রিড করে না বা ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। কাজেই এরা দুটি পৃথক প্রজাতি। **তাহলে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য** হলো নিম্নরূপ :

(i) বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিলসম্পন্ন এক দল জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব, ছত্রাক)।

(ii) একই প্রজাতিভুক্ত জীব একটির সাথে অপরটি ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদন করতে পারে কিন্তু অন্য প্রজাতিভুক্ত কোনো জীবের সাথে ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

(iii) একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকলেও তা হবে নিরবচ্ছিন্ন (continuous)।

(iv) একটি প্রজাতিভুক্ত জীবসমূহ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত।

প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির সর্বনিম্ন একক যা দুটি পদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যেমন— *Corchorus capsularis, C. olitorius* (গণ নাম একবার পূর্ণ লেখার পর পরবর্তীতে প্রথম অক্ষর দিয়ে সংক্ষিপ্ত করার নিয়ম আছে)।

নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমি যে মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকি তা হলো : (i) নতুন বলে শনাক্তকৃত প্রজাতিটি তার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ প্রজাতি থেকে অন্তত ২টি বৈশিষ্ট্য পার্থক্যমণ্ডিত হতে হবে, (ii) পার্থক্য ২টি হবে ধারাবাহিকতাহীন (discontinuous) এবং (iii) পরবর্তী বংশধরে গমন ও প্রকাশযোগ্য-heritable।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা

পৃথিবীতে বর্তমান বর্ণনাকৃত (described) ও অনুমিত (estimated) প্রজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ (sourcse : Jeffries. M.J. 1997; Prance, G.T. 1992)। বর্তমান তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যার উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন এসেছে।

ট্যাক্সার নাম	বর্ণনাকৃত প্রজাতির সংখ্যা	অনুমিত প্রজাতির সংখ্যা
ব্যাকটেরিয়া	৪,০০০	১০,০০,০০০
ছত্রাক	৭২,০০০	১৫,০০,০০০
শৈবাল	৪০,০০০	২,০০,০০০
লাইকেন	১৩,৫০০	২০,০০০
মস	৮,০০০	৯,০০০
লিভারওর্টস	৬,০০০	৭,০০০
টেরিডোফাইটা	১২,০০০	১২,৫০০
জিমনোস্পার্ম	৬৫০	৬৫০
অ্যানজিওস্পার্ম	২,৫০,০০০	৩,০০,০০০

বাংলাদেশে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা

'বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ' অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে বর্ণনাকৃত উদ্ভিদ প্রজাতির (প্রকরণসহ) সংখ্যা নিম্নরূপ :

ব্যাকটেরিয়া	১৭১	ব্রায়োফাইটা	২৪৮
সায়ানোব্যাকটেরিয়া	৩০০	টেরিডোফাইটা	১৯৫
ছত্রাক	২৭৫	নগ্নবীজী উদ্ভিদ	০৫
শৈবাল	২,২৪৫	আবৃতবীজী উদ্ভিদ	৩৬১১

এ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর গত বারো-তেরো বছরে শৈবাল ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের আরো কিছু প্রজাতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। কাজেই প্রকৃত সংখ্যা উদ্ধৃত সংখ্যার চেয়ে একটু বেশি হবে। আবৃতবীজী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৪০০০ বা আরো কিছু বেশি হতে পারে বলে অনুমান করা হয়।

জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন (Population)

অসংখ্য প্রজাতির জীব নিয়ে এ জীবজগৎ গঠিত। সময়ের ব্যবধানে এসব প্রজাতির সংখ্যা ও ধরন পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আজকের পৃথিবীতে যেসব জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) লক্ষ্য করা যায়, কয়েক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে জীবের সংখ্যা ও ধরন অন্য রকম ছিল। জীবসমূহ সাধারণত **জীবগোষ্ঠী** তথা **পপুলেশন**-এ (population) বিন্যস্ত থাকে।

একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে বলা হয় পপুলেশন বা **জীবগোষ্ঠী** (Population is a set of organisms belonging to the same species and occupying a particular area at the same time)। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ও সম্মিলিতভাবে পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল সব প্রজাতির সব পপুলেশন মিলে গঠন করে একটি **জীব সম্প্রদায় বা কমিউনিটি** (community)।

সব জীবের সব কমিউনিটি মিলিতভাবে তৈরি করে **জীবমণ্ডল** বা **বায়োস্ফিয়ার** (biosphere)। বায়োস্ফিয়ারের জীবসমূহ একদিকে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল, অপরদিকে পৃথিবীর ভৌত পরিবেশের ওপরও নির্ভরশীল। ভৌত পরিবেশের মধ্যে আছে (i) **বায়ুমণ্ডল** (atmosphere), (ii) **বারিমণ্ডল** (hydrosphere) এবং (iii) **অশ্মমণ্ডল** (lithosphere)। বায়োস্ফিয়ার ও বায়োস্ফিয়ারের সাথে বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডলের আন্তঃক্রিয়াকে বলা হয় **ইকোস্ফিয়ার** (ecosphere)। [MAT:22-23]

জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Population)

জীবগোষ্ঠীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ : Headline

১। ঘনত্ব বা বিস্তার : পপুলেশন ছোটো হতে পারে, আবার বেশ বড়োও হতে পারে, তবে পপুলেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর অন্তর্ভুক্ত জীবের **ঘনত্ব ও বিস্তার** (density and dispersion)। পপুলেশন এতো বড়ো হতে পারে যে সামগ্রিকভাবে এটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না, পর্যবেক্ষণ করতে হয় নমুনা অংশের। বিভিন্ন নমুনা অংশের পর্যবেক্ষণের পর ঘনত্বের বিচারে তা প্রকাশ করা হয়। **একটি সময়ে একটি একক আয়তন জায়গায় কোনো প্রজাতির কতটি সদস্য আছে তা হলো পপুলেশনের ঘনত্ব** (population density)। যেকোনো প্রজাতির পপুলেশন ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নতর হয়ে থাকে। আবার একই অবস্থানের বিভিন্ন ঋতুতে বা ভিন্ন ভিন্ন বছরে কোনো প্রজাতির পপুলেশন ঘনত্ব ভিন্নতর হয়।

কোনো পপুলেশন বণ্টনের ভৌগোলিক বিস্তারের সীমাকে বলা হয় ঐ পপুলেশনের **বিস্তার পরিসর** (range)। বিস্তার পরিসরে কোনো প্রজাতির বিস্তার সমপ্রকৃতির (uniform) হতে পারে, অসমপ্রকৃতির (random) হতে পারে, আবার গুচ্ছাকারও (clustered) হতে পারে।

২। জন্ম-মৃত্যুর হার : প্রতিটি পপুলেশনের জন্ম ও মৃত্যু হার থাকে। সময়ের সাথে পপুলেশনের পরিবর্তন ঘটে, আবার পৃথিবীর অঞ্চলভেদেও এর পরিবর্তন ঘটে। জন্ম ও মৃত্যুর কারণে এরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে **প্রতি বছর প্রতি হাজারে কতটি শিশু জন্ম নিল তাকে জন্মহার বলা হয়**। জন্ম ও মৃত্যু হার সমান হলে পপুলেশন বৃদ্ধি শূন্য (zero population growth) হয়।

৩। সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি : প্রতিটি পপুলেশনের একটি **প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি** (biotic potential) থাকে। সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিবেশে কোনো পপুলেশন সর্বাধিক কতটা বৃদ্ধি পেতে পারে তাকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি। বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি ভিন্নতর হয়ে থাকে। দেখা গেছে একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ দশ ঘণ্টায় সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭,৩৭,৪১,৮২৪টি হতে পারে। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যাবৃদ্ধির শক্তি তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

৪। সীমিতকরণ শক্তি : প্রকৃতিই পপুলেশনের বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে। কাজেই কোনো পপুলেশনই তার প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধির শক্তিকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজে লাগাতে পারে না। পরিবেশীয় প্রভাবকসমূহ পপুলেশনের বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে। বিবর্তনের কার্যক্রম পপুলেশনেই শুরু হয়।

৫. বয়সের বণ্টন : পপুলেশনে বিভিন্ন বয়স দল (Age group) থাকে। বিভিন্ন বয়সের উদ্ভিদ মিলে উদ্ভিদ পপুলেশন গঠন করে। পপুলেশনে বিদ্যমান বিভিন্ন বয়স দল বা Age group এর শতকরা হারকে বয়সের বণ্টন বলে। বয়সের বণ্টন পপুলেশনের জন্মহার ও মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে।

৬. জীবগোষ্ঠীর ভারসাম্য : পরিবেশের ক্ষতিকারক উপাদান যদি না থাকে এবং বহন ক্ষমতা যদি ঠিক থাকে তাহলে জীবগোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হবে।

৭. জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধি : জীবগোষ্ঠীর হ্রাস-বৃদ্ধি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। জীবগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সদস্য সংখ্যা বাড়লে (জন্মগ্রহণ ও বাইরে থেকে আগমন ঘটলে) জীবগোষ্ঠীর আকারও বড়ো হয়। পরিবেশে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান সদস্য সংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবগোষ্ঠীরও বৃদ্ধি ঘটে।

পপুলেশন বা উদ্ভিদ প্রজাতি বণ্টনে প্রধান প্রভাবকসমূহ

১। **জলবায়ুগত প্রভাবক :** যেমন— সূর্যালোক, পানি ও বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ইত্যাদি পপুলেশনের সার্বিক গঠনে ভূমিকা রাখে।

২। **মৃত্তিকাজনিত প্রভাবক :** যেমন— মাটিতে পানির পরিমাণ, মাটির তাপমাত্রা, মাটির বিক্রিয়া, মাটির জৈব পদার্থ, মাটির বাতাস ইত্যাদি।

৩। **ভূ-সংস্থান সম্পর্কিত প্রভাবক :** যেমন— সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, পাহাড়ের ঢাল ইত্যাদি।

৪। **জীব সম্পর্কিত প্রভাবক :** যেমন– উদ্ভিদের সাথে উদ্ভিদের সম্পর্ক, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্পর্ক, ধারক উদ্ভিদ ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ সম্পর্ক ইত্যাদি।

জীব সম্প্রদায় (Biotic Community)

সাধারণত পৃথিবীর কোনো স্থানে বা কোনো পরিবেশেই এককভাবে কোনো জীব বা জীবগোষ্ঠী বাস করে না বা বাস করতে পারেও না। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের জীবসমূহ একই পরিবেশে একই স্থানে মিলেমিশে বাস করে। একই পরিবেশে, একই স্থানে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব প্রজাতিকে একত্রে বলা হয় জীব সম্প্রদায়। **জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের প্রাকৃতিক সমাবেশ, যারা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি সহনশীল ও নির্ভরশীল এবং পরস্পর ক্রিয়াশীল** (A biotic community is a naturally occurring assemblage of plants and animals that live in the same environment are mutually sustaining and interdependent and are constantly fixing and dissipating energy- Smith 1966)। সহজভাবে বলা যায়, জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে জীবসমূহের সমষ্টিগত অবস্থান। একটি বড়ো মরুভূমি বা তৃণভূমির যেমন নির্দিষ্ট জীব সম্প্রদায় থাকে, আবার ছোটো একটি ডোবা, তারও একটি জীব সম্প্রদায় থাকে।

জীব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য

১। **প্রজাতির বিভিন্নতা :** প্রত্যেক জীব সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত। এদের সংখ্যা ও অবস্থান সম্প্রদায়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ভিন্নতর হয়। প্রত্যেক জীব সম্প্রদায়ের জীবসমূহ খাদ্য, আশ্রয়, প্রজনন ইত্যাদি ব্যাপারে একে অন্যের ওপর ও জড় পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল হয়।

২। **বৃদ্ধির ধরন ও গঠন :** একটি জীব সম্প্রদায়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবের বৃদ্ধির ধরন ও গঠন বিভিন্ন রকম হয়।

৩। **আধিপত্য :** জীব সম্প্রদায়ের প্রকৃতি নির্ণয়ে সম্প্রদায়ভুক্ত সব প্রজাতি সমান ভূমিকা পালন করে না। সম্প্রদায়ভুক্ত বহু প্রজাতির মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি এদের সংখ্যা, আকার ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড দ্বারা পুরো সম্প্রদায়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে।

৪। **স্তরবিন্যাস :** প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের অবস্থান অনুযায়ী লম্বালম্বি স্তরবিন্যাস থাকে, যেমন একটি বন সম্প্রদায়ে (forest community)– (i) **ওভারস্টোরি স্তর-** সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষগুলো এ স্তর গঠন করে থাকে এবং অন্যদের ওপর ছায়া দিয়ে থাকে। এ স্তরে বসবাসকারী পাখিও ভিন্ন প্রজাতির হয়। (ii) **আন্ডারস্টোরি-** ওভারস্টোরি থেকে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার বৃক্ষ প্রজাতিগুলো নিয়ে এ স্তর গঠিত। এরাও তেমন ছায়াপ্রিয় নয়। (iii) **ট্রানগ্রেসিভ স্তর-** ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো নিয়ে এ স্তর গঠিত। (iv) **চারাস্তর-** বড়ো বৃক্ষের চারা এবং তৃণজাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে এ স্তর গঠিত। (v) **ভূ-সংলগ্ন স্তর-** এ স্তরে প্রচুর হিউমাস থাকে এবং এ স্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও পোকামাকড় ইত্যাদি থাকে। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হলো **বিয়োজক** অর্থাৎ জৈব বস্তুর পঁচনে সাহায্য করে।

৫। **ক্রমাগমন :** কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জীব সম্প্রদায় বহুদিন বসবাসের কারণে ঐ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে কোনো কোনো জীবপ্রজাতির অবলুপ্তি ঘটে আর কোনো কোনো জীবপ্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত এমন হতে থাকে। একটি পুকুর বহুদিনের ব্যবধানে একটি জঙ্গলে পরিণত হতে পারে।

৬। **খাদ্যস্তর গঠন ও পুষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতা :** একটি সম্প্রদায়ভুক্ত জীবপ্রজাতিসমূহের মধ্যে একটি খাদ্য শৃঙ্খল ও একটি শক্তি প্রবাহ নিশ্চিত হয়। এতে উৎপাদনকারী, তৃণভোজী, মাংসভোজী, পচনকারী সব ধরনের জীবেরই সমাবেশ ঘটে।

৭। **সময়ের সাথে সম্প্রদায়ের পরিবর্তন :** সময় ও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সম্প্রদায়ভুক্ত জীব প্রজাতিরও পরিবর্তন হয়। তাই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জীবপ্রজাতির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীত, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে এ পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।

বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম (Ecosystem)

কোনো স্থানের (একটি পুকুর, তৃণভূমি, চারণভূমি, জঙ্গল) **জীব সম্প্রদায় ও এদের পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম।** **জড়** (মাটি, পানি, আলো, জৈব ও অজৈব বস্তু) এবং **জীব** (উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক, অণুজীব) উপাদান দিয়ে একটি বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয়।

কোনো **জীব সম্প্রদায়ের** (Community) জীবসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচতে পারে না–তারা তাদের চারপাশের জড় (অজীব) উপাদান, যেমন— বায়ু, পানি, মাটি/পাথর ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। জীবসমূহ তাদের **অজৈব পুষ্টি** (Inorganic nutrient), যেমন— কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং অন্যান্য রাসায়নিক মৌল জড় পরিবেশ থেকেই গ্রহণ করে থাকে। একটি জীব সম্প্রদায়ের জীবসমূহ তাদের চারপাশের জড় তথা অজৈব (abiotic) পরিবেশের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে তুলে একটি **ইকোসিস্টেম**।

ইকোসিস্টেম সুদীর্ঘ সময় টিকে থাকার মতো সামর্থ্য থাকে। টিকে থাকার জন্য তিনটি বিষয় দরকার; যথা— (i) পুষ্টির প্রাপ্যতা– পুষ্টি সীমাহীনভাবে রিসাইকল হয়; (ii) বর্জ্য পদার্থের বিষাক্ততা নাশ– বিয়োজক কর্তৃক নিঃসৃত অ্যামোনিয়া বিষাক্ত কিন্তু এটি *Nitrosomonas* গ্রহণ করে এবং তার শক্তির জন্য ব্যবহার করে; (iii) শক্তির প্রাপ্যতা– শক্তি পুনঃউৎপাদন (রিসাইকল) হয় না, তাই বাইর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পেতে হয় যা সূর্য থেকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে আসে।

ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় আলোক/সূর্য শক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে কার্বন যৌগে স্থান লাভ করে। কার্বন যৌগের রাসায়নিক শক্তি খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। শ্বসনের মাধ্যমে নির্গত শক্তি জীবিত জীবসমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এবং তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাপ শক্তি ইকোসিস্টেম থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু পুষ্টি উপাদান ইকোসিস্টেমে থেকে যায় অফুরন্ত সময়ের জন্য।

যে ইকোসিস্টেম পুষ্টি উপাদান চারপাশের পরিবেশের সাথে বিনিময় করে না, তা হলো **বদ্ধ ইকোসিস্টেম** (Closed ecosystem)। একটি স্থল-ইকোসিস্টেমে পুষ্টি উপাদান সঞ্চয় করে রাখার মতো তিনটি স্থান আছে; যথা— (i) **বায়োমাস** (জীবিত জীব); (ii) **লিটার** (মৃত জৈববস্তু) এবং (iii) **মাটি**। পুষ্টি উপাদান এই তিনটি স্থানের মধ্যে প্রবাহিত হয়। **উন্মুক্ত ইকোসিস্টেমে** (Open ecosystem) পুষ্টি উপাদান এই তিনটি স্থানের মধ্যে এবং চারপাশের পরিবেশের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

একটি সুস্থিত (Stable) ইকোসিস্টেমে উদ্ভিদ ক্রমাগমন (succession) ঘটে না এবং সুস্থিত ইকোসিস্টেমের জীব সম্প্রদায়কে চূড়ান্ত জীব সম্প্রদায় বা **ক্লাইমেক্স কমিউনিটি** বলে। সাধারণত দুটি নিয়ামক–(i) তাপমাত্রা এবং (ii) বৃষ্টিপাত কোনো এলাকার সুস্থিত ইকোসিস্টেমের প্রকৃতি নির্ণয় করে থাকে। অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ঝড়, মানুষের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি উত্তেজনা (disturbance) কোনো ইকোসিস্টেমে পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

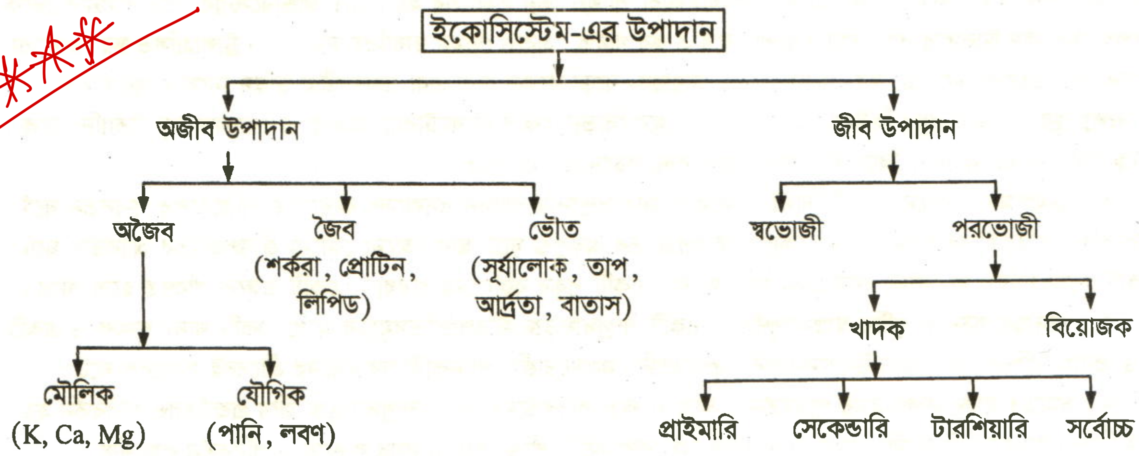

একটি বাস্তুতন্ত্রের তথা ইকোসিস্টেমের জীব উপাদান হলো :

১। **উৎপাদক (Producer) :** উৎপাদক হলো সবুজ উদ্ভিদ। পুকুর বা বিলের প্রধান উৎপাদক হলো **ফাইটোপ্লাংক্টন** (ভাসমান ক্ষুদ্র উদ্ভিদ = *Spirulina, Eudorina, Pandorina* etc.)। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করে। এই খাদ্যই প্রাণিজগতকে টিকিয়ে রাখে। প্রকৃতপক্ষে সবুজ উদ্ভিদ তাদের উৎপাদিত খাদ্যের ভেতরে সূর্যশক্তি ধরে রাখে যা পরে খাদকে প্রবাহিত হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় (সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে) সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি বন্ধন হয় তাকে বলা হয় **মোট উৎপাদন** (Gross production) এবং শ্বসনকার্যে শক্তি খরচ হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় **প্রকৃত উৎপাদন** (Net production)। প্রতি ইউনিট সময়ে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয় সেই হারকে বলা হয় **Productivity**।

২। **খাদক (Consumer) :** উৎপাদক খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তারাই **খাদক**। খাদক হলো প্রাণিকুল। (i) পুকুরে **জুপ্লাংক্টন** (ক্ষুদ্রাকায় প্রাণী = *Cyclops, Cypris, Daphnia*) সরাসরি ফাইটোপ্লাংক্টন খেয়ে থাকে, তাই জুপ্লাংক্টন হলো **প্রাথমিক খাদক** (Primary consumer)। (ii) তিতপুঁটি, মলা, খলিশা ইত্যাদি জুপ্লাংক্টন খেয়ে থাকে, তাই এরা হলো **সেকেন্ডারি খাদক**। (iii) গজার, শোল, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি মলা, খলিশা মাছ খেয়ে থাকে তাই এরা হলো **টারশিয়ারি খাদক**। মাছরাঙা, বক এরাও টারশিয়ারি খাদক হতে পারে।

৩। **বিয়োজক (Decomposer) :** বাস্তুতন্ত্রের মৃত জীবদেহ বা দেহাংশ পচিয়ে জৈব ও অজৈব পদার্থরূপে রূপান্তর করে থাকে কতক মৃত্তিকাবাসী ও জলবাসী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক। বিয়োজক জীবসমূহ আমিষ, স্টার্চ, লিপিড এবং অন্যান্য প্রায় সকল জৈববস্তু বিশ্লেষণ করে রূপান্তর করার এনজাইম তৈরি করে থাকে এবং রূপান্তর কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। তাই ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হলো **বিয়োজক**। মৃত জীবের জৈব পদার্থ খেয়ে থাকে বলে এদেরকে বলা হয় **স্যাপ্রোফায** (saprophage)। এদেরকে **ট্রান্সফরমারও** বলা হয়। যারা মৃত জৈববস্তু থেকে বাহ্যিক হজম (external digestion) প্রক্রিয়ায় পুষ্টি গ্রহণ করে তারা Saprotrophs নামেও পরিচিত। এরা মৃত জৈব বস্তুতে হজমকারী এনজাইম নিঃসৃত করে ফলে দেহের বাইরেই খাদ্য হজম হয়, তখন এরা শোষণ করে তা দেহে গ্রহণ করে। কতক জীব অভ্যন্তরীণ হজম (internal digestion) প্রক্রিয়ায় মৃত জৈববস্তু থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে, এরা হলো Detritivores, যেমন কেঁচো। অবশ্য এরা খাদ্য শৃঙ্খলের অংশ নয়, তবে বিয়োজক না থাকলে খাদ্য শৃঙ্খল বন্ধ হয়ে যায়।

খাদ্য শৃঙ্খল (Food Chain) : উৎপাদক থেকে চূড়ান্ত খাদক পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের জীবসমূহ একক অনুক্রমে একটি সরল অশাখ চেইনের মতো অবস্থান করলে তাকে **খাদ্য শৃঙ্খল** বা **ফুড চেইন** বলে। একটি খাদ্য শৃঙ্খলে প্রতিটি খাদক স্তরের জীবসমূহ তার পূর্ববর্তী স্তরের জীবসমূহকে খেয়ে থাকে। খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে শক্তি একস্তর থেকে পরবর্তী স্তরে প্রবাহিত হয়। খাদ্য শৃঙ্খলে বিভিন্ন খাদ্যস্তরকে **ট্রফিক লেভেল** (trophic level) বলে।

কয়েকটি খাদ্য শৃঙ্খল :

উৎপাদক	→ প্রাথমিক খাদক →	সেকেন্ডারি খাদক	→ টারশিয়ারি খাদক	পরিবেশ
১। ফাইটোপ্লাংক্টন	→ জুপ্লাংক্টন	→ ছোটো মাছ (মলা, তিতপুঁটি)	→ শোল, গজার, বোয়াল বা মাছরাঙা, বক	১। পুকুর বা বিলের খাদ্য শৃঙ্খল
২। ফাইটোপ্লাংক্টন	→ জুপ্লাংক্টন	→ ছোটো মাছ (হেরিং ফিস)	→ হাঙ্গর	২। সমুদ্রের খাদ্য শৃঙ্খল
৩। সবুজ উদ্ভিদ	→ গ্রাসহপার	→ ব্যাঙ	→ বাজপাখি	৩। স্থল পরিবেশের খাদ্য শৃঙ্খল

খাদ্য জাল (Food Web) : যেকোনো জীবসম্প্রদায়ে (Biotic community) বা ইকোসিস্টেমে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল বিরাজ করে। একটি খাদ্য শৃঙ্খলের কতক খাদক অন্য এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের জীবও খেয়ে থাকে। এর ফলে খাদক পর্যায়ে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর সংযুক্ত থাকে। কোনো জীবসম্প্রদায় বা ইকোসিস্টেমে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর যুক্ত থাকার অবস্থাকে **খাদ্য জাল** বা ফুডওয়েভ বলে।

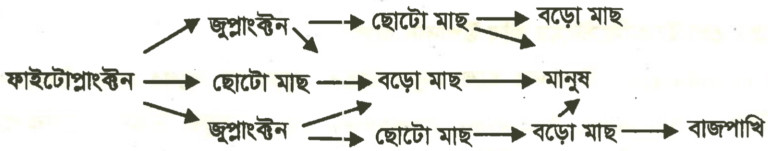

চিত্র: একটি ছোটো খাদ্যজালের নকশা

মানুষ, *Spirulina* (উৎপাদক), মলা মাছ (সেকেন্ডারি খাদক), শোল, গজার, বোয়াল মাছ (টারশিয়ারি খাদক) সবই খায়। **তাই মানুষ সর্বভুক।**

ইকোলজিক্যাল পিরামিড (Ecological Pyramid)

সাধারণত দেখা যায় একটি ইকোসিস্টেমে **উৎপাদকের** (সবুজ উদ্ভিদ) তুলনায় **প্রাথমিক খাদকের** (যারা সরাসরি সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে) সংখ্যা কম থাকে, আবার প্রাথমিক খাদকের তুলনায় **সেকেন্ডারি খাদকের** সংখ্যা কম থাকে; সেকেন্ডারি খাদকের তুলনায় **টারশিয়ারি খাদকের** সংখ্যা আরও কম থাকে। খাদ্যস্তরগুলোর মধ্যকার এরূপ সম্পর্ক নিয়ে নকশা আঁকলে দেখা যাবে একটি পিরামিডের আকৃতি ধারণ করেছে। **বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের খাদ্যশৃঙ্খলের বিন্যাস সম্পর্কিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে।** ইকোলজিক্যাল পিরামিড নিম্নরূপ হতে পারে-১। সংখ্যার পিরামিড, ২। বায়োমাস-এর পিরামিড এবং ৩। শক্তির পিরামিড। [DAT:22-23]

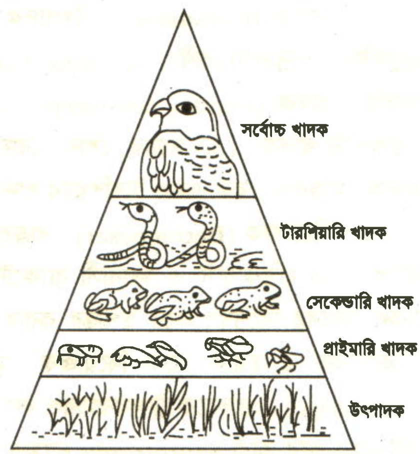

চিত্র ১২.১ : তৃণভূমির একটি সংখ্যার পিরামিড।

১। সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of numbers) : সাধারণত প্রারম্ভিক খাদ্যস্তরে (প্রডিউসার) জীবের সংখ্যা শেষ খাদ্যস্তরের জীবের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি থাকে। **কোনো ইকোসিস্টেমে খাদ্যস্তরের জীবের সংখ্যাভিত্তিক সম্পর্ক দেখানোর জন্য অঙ্কিত নকশাকে সংখ্যার পিরামিড** বলে। তৃণভূমির একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জন্মানো উদ্ভিদের সংখ্যার তুলনায় ঐ তৃণসমূহের ওপর নির্ভরশীল প্রাথমিক খাদকের সংখ্যা কম হবে। আবার ঐ খাদকের সংখ্যার তুলনায় এদের ওপর নির্ভরশীল সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যা আরও কম হবে। সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যার তুলনায় টারশিয়ারি খাদকের সংখ্যা আরও কম হবে। **অর্থাৎ জীবের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে একটি ত্রিকোণাকার পিরামিড আকৃতি ধারণ করে।** সর্বোচ্চ খাদকের সংখ্যা সবচেয়ে কম। **সংখ্যার পিরামিডে প্রতিটি খাদ্যস্তরে** (trophic level) **জীবের সংখ্যা দেখানো হয়।**

কিন্তু সবসময় সংখ্যার পিরামিড ঊর্ধ্বমুখী হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বৃক্ষের বাস্তুতন্ত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। বড়ো একটি বৃক্ষে শত শত কীট-পতঙ্গ বাস করে। এসব কীট-পতঙ্গনির্ভর পরজীবী অণুজীবের সংখ্যা কীট-পতঙ্গ অপেক্ষা শত শত গুণ বেশি হতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদক, প্রাইমারি খাদক ও সেকেন্ডারি খাদক সংখ্যার ভিত্তিতে সাজানো হলে একটি **উল্টানো পিরামিডের** মতো দেখায়।

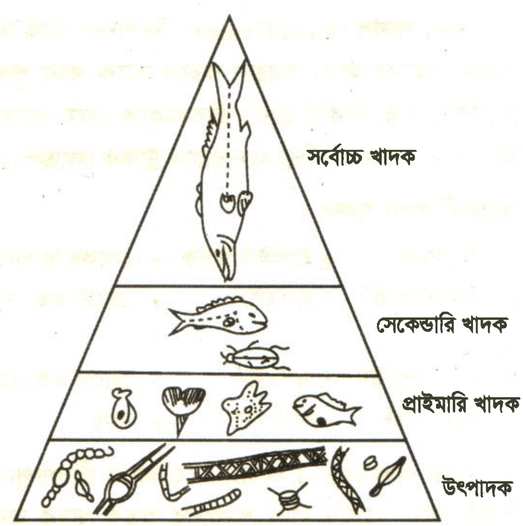

চিত্র ১২.২ : পুকুরের একটি সংখ্যার পিরামিড।

২। জীবভর বা বায়োমাস-এর পিরামিড (Pyramid of biomass) : বায়োমাস (biomass) হলো কোনো একটি

ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থিত সকল জৈববস্তুর মোট ভর (mass) বা মোট পরিমাণের (amount) হিসাব (Biomass is a quantitative estimate of the total mass or amount of living material)। অর্থাৎ, **জীবজ পদার্থের মোট শুষ্ক ওজনই হলো বায়োমাস**। বায়োমাস, মোট ঘনফল হিসেবে (total volume), শুষ্ক ওজন হিসেবে (dry weight) এবং তাজা ওজন হিসেবে (fresh weight) প্রকাশ করা যায়। **কোনো একটি ইকোসিস্টেমের খাদ্যস্তরগুলোর বায়োমাস নির্ণয় করে এদের ফলাফল দিয়ে অঙ্কিত রৈখিক চিত্রকে বায়োমাস-এর পিরামিড বলে।** উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি বটবৃক্ষের বায়োমাস, এর ওপর নির্ভরশীল পাখির বায়োমাস হতে বেশি। আবার পাখিগুলোর বায়োমাস, তাদের ওপর নির্ভরশীল পরজীবী পোকামাকড়গুলোর বায়োমাস অপেক্ষা বেশি। **বায়োমাসের পিরামিডে প্রতিটি খাদ্যস্তরের (trophic level) মোট বায়োমাসের পরিমাণ দেখানো হয়।** তবে পরজীবী (parasite) খাদ্য শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে বায়োমাসের পিরামিড বিপরীতমুখী হয়।

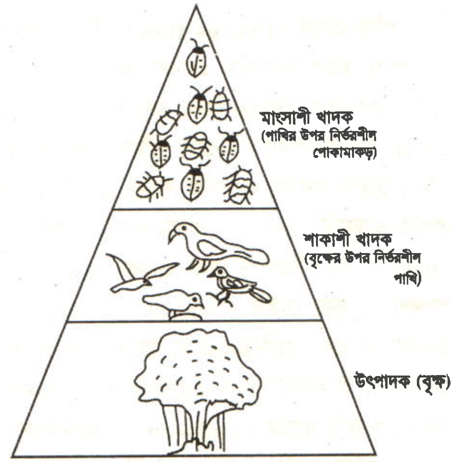

চিত্র ১২.৩ : একটি বায়োমাস-এর পিরামিড।

৩। শক্তির পিরামিড (Pyramid of energy) : একটি ইকোসিস্টেমের নির্দিষ্ট এলাকাতে এবং নির্দিষ্ট সময়কালে বিভিন্ন খাদ্যস্তরের জীব কর্তৃক ব্যবহৃত মোট শক্তির হিসাব অনুযায়ী অঙ্কিত নকশাকে **শক্তির পিরামিড** বলা হয়। সাধারণত কোনো ইকোসিস্টেমের **এক বর্গমিটার এলাকা** এবং **এক বছর সময়কালের** একক হিসেবে ব্যবহৃত শক্তির হিসাব করা হয়।

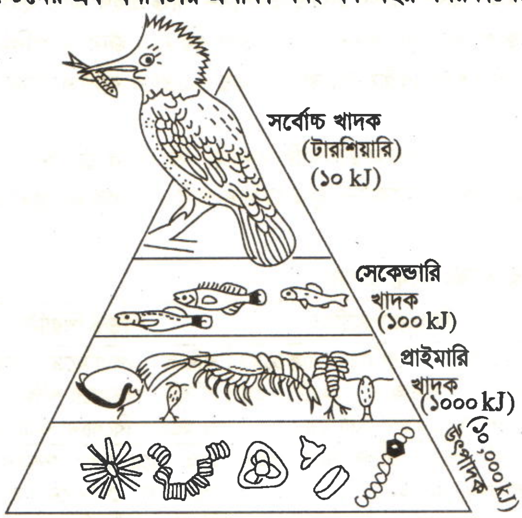

চিত্র ১২.৪ : পুকুরের একটি শক্তির পিরামিড (শক্তির দশমাংশ লক্ষ্যণীয়)।

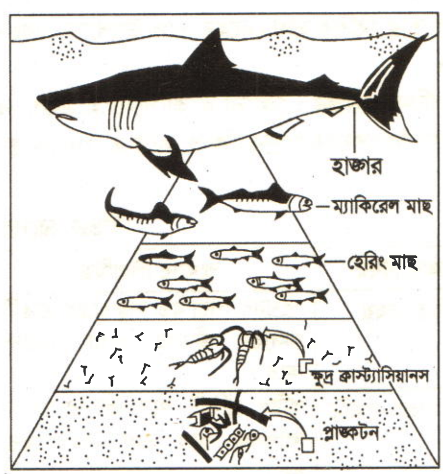

চিত্র ১২.৫ : সমুদ্রের একটি শক্তির পিরামিড।

কোনো ইকোসিস্টেমের এক বর্গমিটার এলাকায় এক বছর সময়কালে প্রথম খাদ্যস্তরের জীব তথা উৎপাদক যে পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করে, তা দ্বিতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি থেকে বেশি; আবার দ্বিতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি তৃতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি থেকে বেশি। চতুর্থ স্তরের জীব সবচেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে। **শক্তির পিরামিডে প্রতি খাদ্যস্তরের বায়োমাসে শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।**

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি পুকুরের ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যা অত্যধিক। এরা যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তা অল্পসংখ্যক মাছের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি। আবার দ্বিতীয় খাদ্যস্তরে মাছের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা শেষ খাদ্যস্তরের মাংসাশী প্রাণীর চেয়ে বেশি। সুতরাং দেখা যায়, শক্তির পিরামিড সবসময় সোজা আকৃতির হয়।

শক্তি প্রবাহ (Energy flow) : ইকোসিস্টেমের মধ্যদিয়ে সূর্য শক্তির একমুখী চলনকে শক্তি প্রবাহ বলে। সূর্য থেকে যে গতিশক্তি ইকোসিস্টেমে প্রবেশ করে তার একটি অতিক্ষুদ্র অংশ উদ্ভিদ কর্তৃক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ধৃত হয় এবং গ্লুকোজের মতো বিভিন্ন জৈব অণুতে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা হয়। কোষীয় শ্বসনের মাধ্যমে জৈব অণুগুলো ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয় যা শরীরে উত্তাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে খরচ হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিম্নমানের শক্তি হিসেবে পরিবেশে ফিরে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ শক্তি শূন্যে (space) চলে যায়, জীবজগৎ এ শক্তি পুনরায় ব্যবহার করতে পারে না। **কাজেই শক্তি প্রবাহ একমুখী** (linear)। শক্তি প্রবাহিত হয় ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে। **ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ ঘটে খাদ্য শৃঙ্খলে** (food chain)। যে গতিপথে খাদ্য একস্তর (trophic or feeding level) থেকে পরবর্তী স্তরে স্থানান্তরিত হয় সেই গতিপথকে **খাদ্য শৃঙ্খল** বা **ফুড চেইন** (food chain) বলে। খাদ্য শৃঙ্খলে শক্তি পর্যায়ক্রমে খাদ্যের মাধ্যমে এক জীব থেকে অন্য জীবে স্থানান্তরিত হয়। **প্রডিউসার বা উৎপাদক** সূর্য শক্তিকে গ্রহণ করে খাদ্য শৃঙ্খল তথা ফুড চেইন-এর সূচনা করে। প্রকৃতিতে যেকোনো ইকোসিস্টেমে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর সংযুক্ত থাকে। পরস্পর একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের জটিল সংযোগ অবস্থাকে **ফুড ওয়েব** (food web) বা **খাদ্যজাল** বলে। শক্তি প্রবাহ নিম্নবর্ণিত তিনটি পর্যায়ভুক্ত। যথা—

১. শক্তি অর্জন : শক্তির মূল উৎস হলো সূর্যালোক। পৃথিবীতে যে পরিমাণ সূর্যালোক বিকিরিত হয় তার মাত্র ০.০২ ভাগ সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিল কর্তৃক শোষিত হয় এবং রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উৎপন্ন খাদ্যের স্থিতিশক্তিরূপে আবদ্ধ থাকে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আগত আলোক শক্তির ০.০১% মাত্র সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়। সালোকসংশ্লেষণের সময় উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি সংবদ্ধন হয় তাকে **মোট উৎপাদন** (gross production) এবং শ্বসনে ব্যবহৃত হওয়ার পর যে শক্তি অবশিষ্ট থাকে তাকে **প্রকৃত উৎপাদন** (net production) বলে।

২. শক্তির ব্যবহার : প্রাইমারি খাদক প্রথম খাদ্যস্তরের অর্থাৎ উৎপাদকের প্রকৃত উৎপাদন শক্তি গ্রহণ করে থাকে। পরে তা সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি প্রভৃতি খাদকে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু শক্তি অর্জন কখনও ১০০ ভাগ হয় না। জীব যে পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে তার বেশির ভাগ দেহের তাপ উৎপাদন এবং নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যয় হয়। এভাবে ব্যয়িত শক্তিকে **শ্বসন শক্তি** বলে।

৩. শক্তির স্থানান্তর : কোনো ইকোসিস্টেমে উৎপাদক থেকে শক্তি প্রথমে প্রাইমারি খাদকে, তা থেকে সেকেন্ডারি খাদকে এবং এভাবে টারশিয়ারি খাদক কিংবা সর্বোচ্চ খাদকে স্থানান্তরিত হয়। যেকোনো ফুড চেইনে শক্তির এ ধরনের স্থানান্তর দেখা যায়।

বিভিন্ন ধরনের পিরামিডের মধ্যে তুলনা

পার্থক্যের বিষয়	সংখ্যার পিরামিড	জীবভর পিরামিড	শক্তির পিরামিড
১। বিবেচিত বিষয়	সংখ্যার পিরামিড বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি খাদ্যস্তর জীবের সংখ্যা নির্দেশ করে।	জীবভরের পিরামিড বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি খাদ্যস্তরে মোট শুষ্ক ওজনকে বিবেচনা করা হয়।	শক্তির পিরামিডে বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি খাদ্যস্তরে শক্তির ব্যবহার ও হস্তান্তর বিবেচনা করা হয়।
২। তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	পুষ্টির প্রতিটি স্তরে জীবের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।	প্রতিটি স্তরের জীবসংখ্যার ওজন লিপিবদ্ধ করা হয়।	প্রতি স্তরে জীব শুকানো হয়। পরে তা পোড়ানো হয় এবং কিলোক্যালরি দিয়ে তাপ নির্ণয় করা হয়।
৩। সুবিধা	সহজেই গণনা করা যায়, কোনো জীবকে মারতে হয় না।	শীর্ষের দিকে ক্রমে আকার সরু থাকে।	রূপান্তরের দক্ষতা প্রদর্শন করে।
৪। অসুবিধা	জীবের আকার অগ্রাহ্য করে।	সকল জীবকে ধরা ও ওজন করা কঠিন।	সকল জীব থেকে তাপশক্তি বের করা কঠিন।
৫। গঠনাকৃতি	ত্রিকোণাকৃতির বা উল্টো আকৃতির পিরামিড হতে পারে।	ত্রিকোণাকৃতির বা উল্টো আকৃতির হয়।	সর্বদাই ত্রিকোণাকৃতির বা সোজা আকৃতির হয়।
৬। ব্যবহৃত একক	সংখ্যার পিরামিডে ব্যবহৃত একক জীবের সাধারণ সংখ্যা।	জীবভর পিরামিডে শুষ্ক ওজন প্রতি বর্গমিটারে গ্রাম বা gm/m^2 হিসেবে পরিমাপ করা হয়।	শক্তির পিরামিডে কিলোক্যালরি/বর্গমিটার/বছর হিসেবে পরিমাপ করা হয়।

শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য : ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১। শক্তি প্রবাহ একমুখী।

২। শক্তির মূল উৎস সৌরশক্তি।

৩। সৌরশক্তি প্রথমে উৎপাদকের দেহে আহরিত হয় এবং পরে তা বিভিন্ন খাদকে স্থানান্তরিত হয়।

(i) **সূর্য** → (ii) **উৎপাদক** → (iii) **খাদক** (প্রাথমিক → সেকেন্ডারি → টারশিয়ারি)।

৪। খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু থেকে যত শেষের দিকে যাওয়া যায় ততই শক্তির ক্রমব্যয় ঘটে।

৫। শক্তি প্রবাহে **থার্মোডিনামিক্স** (thermodynamics) এর ১ম ও ২য় সূত্র সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। প্রথম সূত্রানুযায়ী, শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না বরং এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী, শক্তির রূপান্তরের সময় রূপান্তরের প্রয়োজনে কিছু শক্তির অপচয় ঘটে।

শক্তি ইকোসিস্টেমে (খাদ্য হিসেবে) নিম্নরূপে প্রবাহিত হয় :

১। **উৎপাদক** (Producer) → ২। **তৃণভোজী খাদক** (Herbivores) → ৩। **মাংসাশী খাদক** (Carnivores)

শক্তি প্রবাহের দশমাংশ নিয়ম : খাদকরা যত উৎপাদককে ভক্ষণ করে তার **দশমাংশ মাত্র ব্যবহারকারীর (খাদকের) দেহ গঠনের কাজে** লাগে। যেমন— ১টি হরিণ যদি ১০০ কেজি তৃণ আহার করে তাহলে মাত্র ১০ কেজি তার দেহ গঠনে কাজে লাগে। ১টি বাঘ যদি হরিণের ১০ কেজি মাংস খায় তাহলে ঐ মাংসের মাত্র ১ কেজি বাঘের দেহ গঠনে কাজে লাগে। শক্তি প্রবাহ ব্যাখ্যায় এটি **১০ শতাংশ নিয়ম নামে পরিচিত**। শতকরা ৯০ ভাগ শক্তি তাপ শক্তি হিসেবে পরিবেশে ফিরে যায়। **Lindenmann (1942) এ মতবাদের প্রবর্তক। (চিত্র : ১২.৪ দ্রষ্টব্য)**

বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন

পরিবেশ থেকে জীবদেহে বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ ও জমা হতে পারে। দেহে জমাকৃত বিষাক্ত পদার্থের ঘনত্ব নিম্নস্তরের জীবদের (যেমন-উৎপাদক) তুলনায় পরবর্তী স্তরের জীবদেহে অধিক থাকে। খাদ্য শৃঙ্খলে নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে অবস্থানরত জীবদেহে বিষের ক্রমবর্ধমান ঘনত্বের এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় **বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন** (Biological Magnification)। আমেরিকাতে (১৯৫০ দশকে) ফসলে DDT প্রয়োগের বিষক্রিয়ায় ঈগল (খাদ্য শৃঙ্খলে সর্বোচ্চ স্তরে) প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। পরবর্তীতে সরকার DDT নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

> **কাজ :** সংখ্যার পিরামিড ও বায়োমাসের পিরামিড দুটির মধ্যে তুলনা কর। লক্ষ্য করো একটি অপরটির উল্টো। সংখ্যার পিরামিড ও শক্তির পিরামিড এর মিল খুঁজে দেখো। তোমার মতো করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

জীবের অভিযোজন (Adaptation of organisms)

পরিবেশের সাথে জীবের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সব পরিবেশে সব ধরনের জীব বাস করতে পারে না। প্রতিটি জীব তখনই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে যখন সে তার সুবিধা অনুযায়ী একটি সুন্দর পরিবেশ পায়। **একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনো জীবের খাপ খাইয়ে নেয়াটাই হলো ঐ জীবের অভিযোজন।** কোনো নিবাসে বসবাসের জন্য একটি জীব যে বৈশিষ্ট্যগুলো **অর্জন করে তাকে অভিযোজন বলে।** কতক জীব মিঠা পানিতে বাস করে, কতক জীব লোনা পানিতে বাস করে, কতক জীব মরুভূমিতে বাস করে, আবার কতক জীব স্বাভাবিক স্থলভাগে বাস করে। বাসস্থানে পানির প্রাপ্যতা ও ধরন এখানে একটি বড়ো নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পানিতে বাসকারী জীবের গঠন বৈশিষ্ট্য এক রকম, স্থলে বাসকারী জীবের গঠন বৈশিষ্ট্য অন্য রকম। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বাসকারী জীবের গঠন ও আচরণ মরুভূমিতে বাসকারী জীবের গঠন ও আচরণ থেকে পৃথক ধরনের। কাজেই দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশীয় অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য (অভিযোজনের জন্য) ঐ পরিবেশে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়ের গঠনগত ও আচরণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ ঐ জীব সম্প্রদায়ের গঠনগত ও আচরণগত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা ঐ বিশেষ পরিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। জলাময় (জলজ), মরুময় (মরুজ) এবং লবণাক্ত পরিবেশে বাস করতে গিয়ে পরিবেশ অনুযায়ী জীব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। **ওয়ার্মিং** (Warming-1909) মাটির প্রকৃতি ও মাধ্যমে পানির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদগুলোকে প্রধানত

তিনটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করেন; যেমন— **হাইড্রোফাইট, জেরোফাইট** এবং **মেসোফাইট**। লোনা পানির অঞ্চলে পানির লবণাক্ততার জন্য বিশেষ ধরনের লবণ সহনীয় উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। এরা **হ্যালোফাইট** বা লোনা মাটির উদ্ভিদ। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইটস (Hydrophytes)

জলে (পানিতে) যাদের জন্ম তারাই জলজ। **যেসব উদ্ভিদ পানিতে জন্মে এবং পানিতে বিস্তার লাভ করে সেসব উদ্ভিদকে বলা হয় জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইটস** (গ্রিক *hydro* = পানি, *phyte* = উদ্ভিদ)। জলজ উদ্ভিদ পানিতে নিমজ্জিত, পানিতে ভাসমান বা উভচর হতে পারে। পানিতে জন্ম ও সফল বৃদ্ধির জন্য জলজ উদ্ভিদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

জলজ উদ্ভিদের প্রকারভেদ

বর্ণনা বা পাঠদানের সুবিধার জন্য জলজ উদ্ভিদসমূহকে তাদের সঠিক অবস্থা ও অবস্থানের ভিত্তিতে চার প্রকারে ভাগ করা হয়ে থাকে।

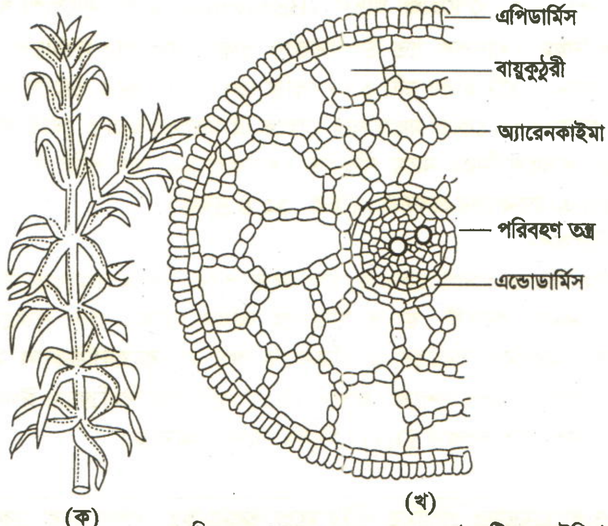

চিত্র ১২.৬ : *Hydrilla verticillata* (একটি জলজ উদ্ভিদ)
(ক) বাহ্যিক গঠন, (খ) কাণ্ডের অন্তর্গঠন।

১। **মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ (Rooted submerged hydrophytes)** : যেসব উদ্ভিদ মূল দ্বারা পানির নিচে মাটিতে আবদ্ধ থাকে এবং সমস্ত দেহটিই পানির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে সেসব উদ্ভিদকে মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ বলে। হাইড্রিলা (*Hydrilla verticillata*), পাতা শেওলা (*Vallisneria spiralis*), পাতা ঝাঁঝি (*Potamogeton nodosus*), সিরাটোফাইলাম (*Ceratophyllum demersum*), শ্যামা কলা (*ottelia*) ইত্যাদি নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ।

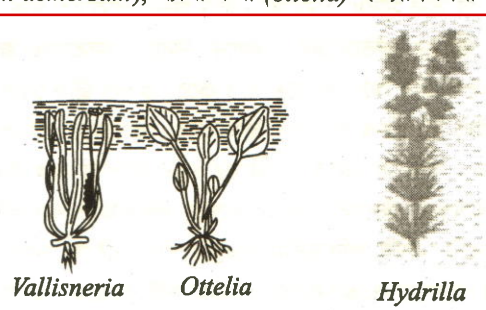

চিত্র ১২.৭ : কয়েকটি মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ।

২। **মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Free floating hydrophytes)** : জলাশয়ে পানির নিচে মাটির সাথে যেসব উদ্ভিদের কোনো সংযোগ থাকে না, ফলে পানির উপরিতলে মুক্তভাবে ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করে তাদেরকে মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বলে। কচুরিপানা (*Eichhornia crassipes*), ক্ষুদিপানা (*Lemna minor*), গুঁড়িপানা (*Wolffia microscopica*),

টোপাপানা (*Pistia stratiotes*), কুতিপানা (*Azolla*), মুসাকানিপানা (*Salvinia*) এসব মুক্ত-ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ। *Utricularia rosettifolia* Alfasane et Hassan নামক একটি জলজ উদ্ভিদ বাংলাদেশ থেকে নতুন প্রজাতি জলজ উদ্ভিদ হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে।

চিত্র ১২.৮ : কয়েকটি ভাসমান জলজ উদ্ভিদ

৩। **মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Rooted floating hydrophytes) :** যেসব জলজ উদ্ভিদের মূল জলাশয়ের পানির নিচে মাটিতে সংযুক্ত থাকে কিন্তু দীর্ঘ বোঁটার কারণে পাতাগুলো পানির ওপরে ভাসমান থাকে তাদেরকে বলা হয় মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ। সাদা শাপলা (*Nymphaea pubescens*), লাল শাপলা (*Nymphaea rubra*), নীল শাপলা (*Nymphaea nouchali*), পদ্ম (*Nelumbo nucifera*) কয়েকটি মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ।

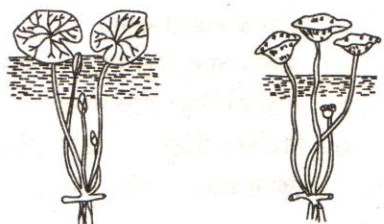

চিত্র ১২.৯ : মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ।

৪। **উভচর উদ্ভিদ (Amphibious plants) :** যেসব উদ্ভিদ জলাশয়ের কিনারে মাটিতে শিকড়াবদ্ধ থাকে এবং কাণ্ডের অধিকাংশই পানিতে ভাসমান থাকে সেসব উদ্ভিদকে উভচর উদ্ভিদ বলে। কলমিলতা (*Ipomoea aquatica*), হেলেঞ্চা (*Enhydra fluctuans*), কেশরদাম (*Ludwigia repens*) কয়েকটি উভচর উদ্ভিদের উদাহরণ। হেলেঞ্চা মাটিতে আবদ্ধ উভচর, ভাসমান এবং স্থলজ হিসেবে জন্মাতে পারে।

জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড নরম, দুর্বল, সরু ও লম্বা মধ্যপর্ব বিশিষ্ট হয়। মাটিতে নোঙ্গরাবদ্ধ ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় হয়।

২। জলজ উদ্ভিদের মূল সুগঠিত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে মূল থাকে না বললেই চলে।

৩। কাণ্ড ও পাতার বহিঃত্বক কিউটিনযুক্ত থাকে না; পত্ররন্ধ্র থাকে না, বা কম থাকে। পত্ররন্ধ্রে প্রহরী (রক্ষীকোষ) কোষ নাও থাকতে পারে।

৪। এদের মূল ও কাণ্ডে বড়ো বড়ো বায়ুকুঠুরী থাকে। বায়ুকুঠুরী বিশিষ্ট গঠনকে **অ্যারেনকাইমা** বলে।

৫। জলজ উদ্ভিদের ভাস্কুলার বান্ডল অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে; অনেক সময় জাইলেম অনুপস্থিত থাকে। মেকানিক্যাল টিস্যু খুবই কম থাকে, তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব শক্ত হয় না।

৬। অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদে অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

৭। যান্ত্রিক টিস্যু কম থাকে। এজন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃঢ় হয় না।

জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Hydrophytes)

অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন (Morphological adaptation)

১। মূল সুগঠিত হয় না, সংক্ষিপ্ত ও দুর্বল প্রকৃতির হয়। অনেক উদ্ভিদের (যেমন- গুঁড়িপানা = *Wolffia*) মূল থাকেই না।

২। মূলে মূলরোম অনুপস্থিত (কারণ পানি শোষণের জন্য মূলরোমের দরকার হয় না)।

৩। কোনো কোনো উদ্ভিদের অস্থানিক ভাসমান মূল (যেমন- কেশরদাম- *Jussiaea repens*) থাকে। ভাসমান মূল উদ্ভিদকে ভাসতে সাহায্য করে।

৪। নিমজ্জিত উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও স্পঞ্জি হয়, মধ্যপর্ব লম্বা হয়। ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা হয়। মাটিতে আবদ্ধ উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় ও নরম হয়।

৫। পাতা সাধারণত পাতলা ও নরম থাকে। তাই পানির টানে ছিঁড়ে যায় না। অনেক উদ্ভিদের পত্রবৃন্ত স্ফীত হয় যা উদ্ভিদকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। যেমন— কচুরিপানা।

৬। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের পাতা আলোর জন্য ভেদ্য ও স্বচ্ছ।

৭। কখনো একই উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের পাতার উপস্থিতি দেখা যায়। প্রজাতিভেদে পাতা বিভিন্ন আকৃতির হয়। কিছু উদ্ভিদের পাতা (আমাজান লিলি) এতো চওড়া যে একটি ছোট শিশুর ভর বহন করতে পারে।

অন্তর্গঠনগত অভিযোজন (Anatomical adaptation)

১। ত্বকে কিউটিকল থাকে না, অথবা খুবই পাতলা থাকে। কারণ পানির অপচয় রোধ করার প্রয়োজন হয় না।

২। নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ডের ত্বকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তাই সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।

৩। কাণ্ড ও পাতার অভ্যন্তরে বড়ো বড়ো বায়ুকুঠুরী থাকে। বায়ুকুঠুরী বায়ু (O_2, CO_2) ধরে রাখে। বায়ুকুঠুরী উদ্ভিদকে ভাসতে সাহায্য করে।

৪। মেকানিক্যাল টিস্যু থাকে না বা কম থাকে। তাই সহজে পানির টানে ভেঙ্গে যায় না।

৫। পরিবহণ টিস্যু থাকে না বা অগঠিত, কারণ পানি পরিবহণের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

৬। নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতায় স্টোম্যাটা থাকে না, অন্যান্য উদ্ভিদেও স্টোম্যাটা কম থাকে। কারণ, গ্যাস নিয়ন্ত্রণের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological adaptation)

১। সব অঙ্গ দিয়েই পানি শোষণ করতে পারে (ত্বকে কিউটিকল না থাকায়), পানি শোষণের জন্য মূল ও মূলরোমের প্রয়োজন হয় না।

২। কাণ্ড ও পাতার ত্বকেও ক্লোরোফিল থাকে, তাই পানির নিচে কম আলোতে ও কম CO_2 যুক্ত পরিবেশে প্রয়োজনীয় সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।

৩। অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদ অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে (কারণ পরাগায়ন অনিশ্চিত)।

৪। কাণ্ড ও পাতার বায়ুকুঠুরীতে বায়ু জমা থাকায় শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষণের অসুবিধা হয় না।

৫। প্রস্বেদন হার কম কারণ পানি শোষণের জন্য প্রস্বেদনের টান দরকার হয় না।

জলজ প্রাণীর অভিযোজন (Aquatic adaptation of animals)

জলজ প্রাণীরা জলে বাস করতেই বিশেষভাবে অভিযোজিত। জলজ প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশই হলো মাছের বিভিন্ন প্রজাতি। পানিতে থাকার সুবিধার জন্য এদের দেহের ভেতরে পটকা নামক বায়ু থলি থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ফুলকা থাকে। পানিতে চলাচলের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাখনা থাকে। দেহের আকৃতিও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া ব্যাঙ, কাছিম, কুমির, সাপ এগুলোও পানিতে বাস করতে পারে। এদের দেহের বিশেষ গড়ন, লোমহীন পুরু ত্বক, পা বা লেজ দিয়ে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা এবং পানির নিচে অক্সিজেন গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

মরুজ উদ্ভিদ (Xerophytes)

মরু পরিবেশে অর্থাৎ বৃষ্টিপাতবিহীন শুষ্ক ও বালুকাময় অঞ্চলে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সেসব উদ্ভিদই মরুজ উদ্ভিদ। মরু অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত সাধারণত ২৫ সেমি (১০ ইঞ্চি)-র কম, তাই মাটিতে পানির পরিমাণও অনেক কম। অধিকাংশ মরু অঞ্চল কংকর ও বালিময়, মাটি প্রায় পানিশূন্য অবস্থায় থাকে, তারপরও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তেমন প্রতিকূল পরিবেশেও কিছু উদ্ভিদকে জন্মাতে দেখা যায়। এসব উদ্ভিদ সাধারণ বৃষ্টিশূন্য খরা অঞ্চলেও সহজেই জন্মাতে পারে। আবার আমাদের দেশের মতো স্বাভাবিক পরিবেশেও জন্মাতে পারে। দেহে পানি সংরক্ষণ, অল্প আয়াসে মূল দিয়ে পানি শোষণ এবং

কাণ্ড বা পাতার মাধ্যমে পানির অপচয় রোধকরণ— এ তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো একটি বা সবকটি বৈশিষ্ট্যই একটি মরু উদ্ভিদে থাকতে পারে।

যেখানে পানির পরিমাণ কম কিন্তু প্রস্বেদনের হার বেশি সেখানে মরুজ উদ্ভিদ অধিক জন্মে। ওপেনাইমার (Oppenhelmer, 1960) মরুজ উদ্ভিদ বলতে সেসব উদ্ভিদকে বুঝিয়েছেন যারা আবাসস্থলে পানির অভাব মেটানোর জন্য নিজেদের বহির্গঠন, অন্তর্গঠন ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। মরুজ উদ্ভিদকে সাধারণত নিম্নলিখিত ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা–

১। **খরা এড়ানো উদ্ভিদ** (Drought escaping plants)
২। **কৌশলে খরা এড়ানো উদ্ভিদ** (Drought evading plants)
৩। **খরা সহ্যকারী উদ্ভিদ** (Drought enduring plants)
৪। **খরা প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ** (Drought resistant plants)

মরুজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। মূল বিস্তৃত অথবা মাটির গভীরে প্রসারিত থাকে।
২। কাণ্ড ও পাতা চ্যাপ্টা ও রসালো।
৩। পাতা অনেক ক্ষেত্রে কণ্টক-এ রূপান্তরিত হয়, কোনো কোনো পাতা গুটানো ও ভাঁজ করা থাকে।
৪। কোষের আকার অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়, কোষপ্রাচীর পুরু ও কিউটিকল যুক্ত থাকে।
৫। কোষের প্যালিসেড প্যারেনকাইমা সুগঠিত ও বেশ দৃঢ়, কোষাবকাশ কম।

Reading

মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Xerophytes)

বাহ্যিক অভিযোজন

১। মরুজ উদ্ভিদসমূহ সাধারণত আকারে ছোটো ও ঝোপযুক্ত হয়। এ ধরনের উদ্ভিদ বালির ঝাপটা ও বায়ুর ঝাপটা সহ্য করতে পারে, তাই ভেঙ্গে যায় না।
২। মূল মাটির উপরিতলের কাছাকাছি অথবা খুবই গভীরে প্রলম্বিত। তাই ওপর থেকে সামান্য বৃষ্টির পানি যেমন শোষণ করতে পারে, দ্রুত মাটির গভীরে চলে যাওয়া পানিও শোষণ করতে পারে। অর্থাৎ এদের মূল সুগঠিত।
৩। অনেক উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ড চ্যাপ্টা, রসালো ও সবুজ থাকে। তাই পানি ধরে রাখতে পারে।
৪। পাতা অপেক্ষাকৃত ছোটো, পুরু বা কাঁটায় রূপান্তরিত। তাই পানির অপচয় রোধ হয়।

অন্তর্গঠনগত অভিযোজন

১। পাতার কিউটিকল পুরু, কাণ্ড ও পাতায় মোমের আবরণ থাকে। তাই প্রস্বেদন হ্রাস পায়।
২। পাতার প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ঘন ও সুদৃঢ়, স্টোম্যাটা (পত্ররন্ধ্র) ত্বকের গভীরে (লুক্কায়িত) অবস্থিত, অনেক সময় লম্বা রোম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাই পানি বাষ্পায়ন ও নির্গমন কম হয়।
৩। প্যারেনকাইমা কোষ স্ফীতিশীল ও রসালো। তাই প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখতে পারে।
৪। এপিডার্মিস বহুস্তরবিশিষ্ট। তাই পানির অপচয় রোধ ও খরায় নেতিয়ে পড়ে না।
৫। কাণ্ডের মেকানিক্যাল টিস্যু ও পরিবহণ টিস্যু সুগঠিত, মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট ও ঘন সন্নিবেশিত। এটি পানির অপচয় রোধ, পানি ধরে রাখা এবং গাছকে খরাসহিষ্ণু করার কৌশল।

শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন

১। মরু উদ্ভিদের অভিস্রবণিক চাপ বেশি। তাই পানি শোষণ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পানি শোষণ সহজ হয়, পানি খরচ কম হয় এবং অপচয় রোধ হয়।
২। প্রস্বেদনের হার খুবই কম। তাই শোষিত পানির পরিমাণ কম হলেও তা দেহাভ্যন্তরে ধরে রাখতে পারে।
৩। বৃষ্টির সাথে সাথে পানি শোষণ করে নিতে সক্ষম।

৪। বর্ষজীবী উদ্ভিদসমূহ বৃষ্টির পরপরই অতি অল্প সময়ে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে সক্ষম।

৫। কম পানি, অতি উত্তাপ ইত্যাদি কারণে এনজাইমের ক্রিয়া কিছুটা কম থাকে তাই অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ধীর গতি হয়।

৬। পাতার নিম্নত্বকে ভেতরের দিকে পত্ররন্ধ্র থাকে।

মরুজ উদ্ভিদের উদাহরণ : খেজুর (*Phoenix dactylifera*), শতমূলী (*Asparagus racemosus*), শতাব্দী উদ্ভিদ (*Agave americana*), আকন্দ (*Calotropis procera*), ঘৃতকুমারী (*Aloe vera*), করবী (*Nerium indicum*), ফণিমনসা (*Opuntia dillenii*), পাথরকুচি (*Bryophyllum*), ইউফরবিয়া (*Euphorbia*), বিভিন্ন ক্যাক্টাস প্রজাতি ইত্যাদি মরু উদ্ভিদের কতিপয় উদাহরণ। এর সবকটিই বাংলাদেশে স্বাভাবিক পরিবেশে জন্মে থাকে।

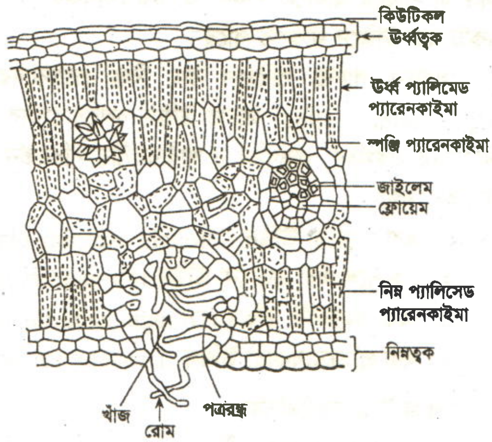

চিত্র ১২.১০ : *Nerium* (করবী- একটি মরু উদ্ভিদ) পত্রের প্রস্থচ্ছেদ।

মরুজ প্রাণীর অভিযোজন

মরুজ পরিবেশ চরমভাবাপন্ন। এখানে খুব কম সংখ্যক প্রাণী প্রজাতিই বাস করে। তীব্র আলো, উচ্চতাপ, উষ্ণ বালি-পাথর এবং স্বল্পপানি—এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা। উট, সাপ, বিশেষ ধরনের ইঁদুর, মরু গিরগিটি, পাখি, মরু বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী মরু অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

এদের অনেকেই দিনের বেলায় গর্তে লুকানো থাকে এবং রাত্রিতে বাইরে বের হয়। এরা অধিকাংশই দ্রুতগামী। মরুবাসী প্রাণী দীর্ঘদিন পানি পান না করে থাকতে পারে। এদের অধিকাংশই রসালো খাদ্যে বিদ্যমান পানি দ্বারা পানির অভাব পূরণ করে। এদের অনেকের গায়ের ত্বক পুরু থাকে যাতে পানির অপচয় কম হয় এবং তাপ সহ্য করতে পারে। মরু ঝড়ের বালি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এদের অনেকের নাকের ছিদ্র অত্যন্ত সরু থাকে, কানের ছিদ্র আঁইশ বা লোমাবৃত থাকে। চোখ ঢেকে রাখার আবরণ থাকে, অনেকের পায়ের তলায়ও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। দিনের কড়া তাপ এড়ানোর জন্য অধিকাংশ প্রাণী নিশাচর প্রকৃতির হয়। উটের দেহাভ্যন্তরে পানি জমা করে রাখার ব্যবস্থা আছে। অনেকে গাছের কচি পাতা ও বাকল চিবিয়ে পানির অভাব পূরণ করে।

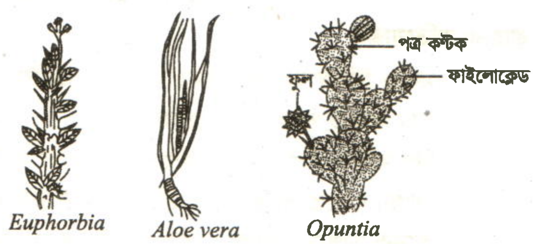

চিত্র ১২.১১ : কয়েকটি মরুজ উদ্ভিদ

লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophytes)

লোনা পরিবেশে অধিকাংশ উদ্ভিদই জন্মাতে পারে না, তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কতিপয় উদ্ভিদ প্রজাতি জন্মাতে পারে। **যেসব উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে** (মাটিতে ও পানিতে) **সহজেই জন্মাতে ও বিস্তার লাভ করতে পারে সেসব উদ্ভিদই লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট** (Halophytes)। এ ধরনের আবাসে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ ($NaCl$, $MgCl$, $MgSO_4$) বেশি থাকায় সাধারণ উদ্ভিদ সেখান থেকে পানি শোষণ করতে পারে না। তাই সেখানে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। সমুদ্র উপকূলবর্তী জোয়ারভাঁটা অঞ্চলে যে বিশেষ ধরনের হ্যালোফাইট জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে সেসব উদ্ভিদকে **ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ** (mangrove) বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যথা- সুন্দরবনে এ জাতীয় উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

চিত্র ১২.১২ : লোনামাটির উদ্ভিদের শ্বাসমূল

লোনামাটির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। লোনামাটির উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা রসালো থাকে।

২। এদের **স্তম্ভমূল** বা **ঠেসমূল** থাকে যা মাটির সামান্য নিচে বিস্তৃত থাকে।

৩। মাটিতে O_2 কম থাকায় অনেক উদ্ভিদে **শ্বাসমূল** বা **নিউমেটোফোর** (pneumatophore or breathing root) সৃষ্টি হয়। মাটির নিচের শাখা মূল থেকে শ্বাসমূল মাটির উপরে উঠে আসে। এদের গায়ে শ্বাসছিদ্র থাকে, যা দিয়ে বায়ু থেকে O_2 গ্রহণ করে।

৪। মূলের অভ্যন্তরে (কর্টেক্স-এ) বড় বড় **বায়ুকুঠুরী** থাকে।

৫। লোনামাটির উদ্ভিদে প্রস্বেদন কম হয়।

৬। অনেক উদ্ভিদে **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম** (viviparous germination) হয়, যেমন— *Rhizophora* গণের প্রজাতি।

৭। এদের কোষস্থ প্রোটোপ্লাজম কিছুটা আঠালো হয় এবং এদের অভিস্রাবণিক চাপ বেশি থাকে।

৮। উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত খর্বাকার হয় এবং এদের এপিডার্মিস বহুস্তর বিশিষ্ট হয়।

লবণাক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptaion of Halophytes)

১। মাটির গভীরতার সাথে সাথে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, তাই অধিকাংশ উদ্ভিদের মূলতন্ত্র মাটির খুব গভীরে না গিয়ে মাটির উপরের স্তরেই বিস্তৃত থাকে।

২। অধিক লবণাক্ত পানি শোষণ করতে অসুবিধা হয়, তাই বৃষ্টির সময় লবণাক্ততা কিছুটা কমে আসলে উদ্ভিদ দ্রুত পানি শোষণ করে তাদের প্যারেনকাইমা কোষে সঞ্চয় করে রাখে। এ কারণে এদের কাণ্ড, পাতা ও মূলকে কিছুটা রসালো দেখায়।

৩। জোয়ার-ভাটার সময় পানির টানকে সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনেক উদ্ভিদে **স্তম্ভমূল** বা **ঠেসমূল** থাকে।

৪। শ্বাসমূলের ভেতরে **বায়ুকুঠুরী** থাকে এবং সে কুঠুরীতে বায়ু (O_2) ধরে রাখতে পারে। শ্বাসমূলের কারণে মূল ও বাইরের সাথে গ্যাসের বিনিময় সহজ হয়।

চিত্র ১২.১৩ : *Rhizophora* উদ্ভিদের জরায়ুজ অংকুরোদগম।

৫। লবণাক্ত মাটিতে এবং জোয়ার-ভাটার স্থানে বীজ এক স্থানে টিকে থাকা কঠিন। তাই বহু উদ্ভিদে গাছে থাকা অবস্থায়ই বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হয়ে লম্বা ভ্রূণমূল সৃষ্টি হয়। মূল একটু বড় ও ভারী হলে মাটিতে পড়ে এবং কিছুটা কাদা মাটিতে ঢুকে যায় ও স্থায়ী হয়। ফলে জোয়ার-ভাঁটার টানে তা ভেসে যায় না। **উদ্ভিদে থাকা অবস্থায় ফলের অভ্যন্তরে বীজের অঙ্কুরোদগমকে বলা হয় জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (Viviparous germination)।** ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠালে মৌসুমের শেষ দিকে ফলের ভেতরেই বহু বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মূলতন্ত্র প্রকাশ করে কিন্তু ফলের বাইরে চলে আসে না। এরূপ অবস্থাকে **ক্রিপ্টো ভিভিপ্যারি** বলা যায়।

৬। শ্বাসমূলের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

৭। যথেষ্ট পরিমাণ পানি শোষণ করতে পারে না বলে প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রিত থাকে।

লবণাক্ত উদ্ভিদের উদাহরণ : গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), গরান (*Ceriops roxburghii*), কাঁকড়া (*Bruguiera gymnorrhiza*) এবং বাইন (*Avicennia officinalis*), বোরা (*Rhizophora conjugata*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), পশুর (*Zylocarpus moluccensis*), গোলপাতা (*Nipa fruticans*), হারগোজা (*Acanthus illicifolius*), সুন্দরি (*Heritiera fomes*)। [MAT:18-19]

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ (Mangrove Vegetation) : যেসব লোনামাটির উদ্ভিদ স্থায়িভাবে অগভীর লবণাক্ত পানিতে বা কম লবণাক্ত পানিতে অথবা জোয়ারের সময় লবণাক্ত হয় এমন পানিতে উৎপন্ন হয় সেসব উদ্ভিদকে **ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ** বলে।

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের আবাসস্থলের মাটি সর্বদাই কর্দমাক্ত থাকে। এসব উদ্ভিদের পাতা মসৃণ ও চকচকে থাকে। কাণ্ডের নিম্নভাগ থেকে ঠেসমূল উৎপন্ন হয় যার মাধ্যমে কর্দমাক্ত নরম মাটিতে দৃঢ়ভাবে সোজা থাকে। উদ্ভিদের গোড়ার অংশ পানিতে থাকার ফলে মূল ঠিক মতো O_2 গ্রহণ করতে পারে না। তাই অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বিশেষ এক ধরনের মূল মাটি ভেদ করে উল্টোদিকে প্রসারিত হয়ে পানির ওপর ওঠে আসে। এগুলোর নাম হচ্ছে– **নিউম্যাটোফোর** বা **শ্বাসমূল**। ছিদ্রের সাহায্যে O_2 গ্রহণ এবং শ্বসন চালু রাখে। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বীজের **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম**। এ অঙ্কুরোদগমে ফল গাছে ঝুলে থাকা অবস্থায়ই বীজ অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করে। গাছ থেকে ফল বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই বীজের ভেতরের ভ্রূণমূল ফলের প্রাচীর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বর্ধিত হয়। ভ্রূণমূল ক্রমান্বয়ে স্ফীত হয়ে গদাকার ধারণ করে এবং ওজনেও বাড়ে ফলে, ভ্রূণমূলের ভারে অঙ্কুরিত বীজ ফল থেকে খসে খাড়াভাবে নিচে পড়ে যায় এবং কর্দমাক্ত নরম মাটিতে প্রোথিত হয়। এরপর মূল নির্গত হয় এবং চারা মাটির সঙ্গে আটকে যায়। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়। সুন্দরবনে যেসব প্রজাতি পাওয়া যায় তার মধ্যে সুন্দরি, গরান, গেওয়া, পশুর, গোলপাতা, হারগোজা, কেওড়া, কাঁকড়া অন্যতম।

লবণাক্ত পরিবেশে প্রাণীর অভিযোজন

লবণাক্ত পরিবেশ বলতে এখানে সুন্দরবনের পরিবেশকে ধরে নেয়া হয়েছে, বিশাল সমুদ্রকে নয়। এখানে আছে অসংখ্য প্রজাতির মাছ, পাখি, সাপ, হরিণ, বাঘ, বানর, বনমোরগ, শুকর, কাছিম, কাঁকড়া ইত্যাদি। লোনা পানিতে যেসব মাছ বাস করে তারা লোনা পানি গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে। স্তন্যপায়ীরাও অধিক সময় পানির নিচে থাকতে পারে এবং পানির উপরিতলে এসে শ্বাস নেয়। সুন্দরবনের অন্যন্য প্রায় সব প্রাণীই প্রচুর খাদ্য প্রাপ্তির উপর অভিযোজিত। এরা খাদ্যের অভাব হলে স্থান ত্যাগ করতে পারে। কাছিম ডাঙ্গায় এসে বালির গর্তে ডিম পাড়ে। পানিতে সাঁতার কাটতে এরা অভিযোজিত।

মেসোফাইট (Mesophytes)

যে মাটিতে মিষ্টি পানি (লোনা পানি নয়) প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক মাত্রায় (কম বা অধিক নয়) থাকে সে মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদই হলো **মেসোফাইট** (Mesophyte)। আমাদের অধিকাংশ ফলদ বৃক্ষ, ফসল উদ্ভিদ, বাড়ির আশপাশের ঝোপ, রাস্তার ধারের আগাছা হলো মেসোফাইট। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, শাল, সেগুন এসব মেসোফাইটের উদাহরণ।

কাজ : একটি ছকের মাধ্যমে জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জন্মানো উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলনা করে দেখাও। তুলনা করার আগে বিষয়টি বার বার ভালোভাবে পড় এবং বুঝে নাও। মাটিতে পানির পরিমাণ, লবণাক্ততা, মূলের গঠন, কাণ্ডের অভ্যন্তরীণ গঠন, স্টোম্যাটা, জনন ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা কর।

[বি. দ্র. উদ্ভিদ নিশ্চল, প্রাণী সচল এবং প্রয়োজনে স্থান ত্যাগ করতে পারে। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণীর অভিযোজন একই রকম নয়।]

জলজ, মরুজ ও লোনামাটির উদ্ভিদের মধ্যে তুলনা

বৈশিষ্ট্য	জলজ উদ্ভিদ	মরুজ উদ্ভিদ	লোনামাটির উদ্ভিদ
১. মূল	মূল সুগঠিত নয়।	মূল সুগঠিত এবং মাটির উপরিতল অথবা নিচে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।	মূল সুগঠিত।
২. কাণ্ড	কাণ্ড নরম হয়। অভ্যন্তরে বাতাবকাশ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।	কাণ্ড শক্ত হয়। বাতাবকাশ খুবই কম থাকে।	কাণ্ড শক্ত বা নরম হতে পারে। বাতাবকাশ তেমন থাকে না।
৩. পাতার আকার	পাতা বড় ও নরম হয়।	পাতা ক্ষুদ্রাকৃতির।	পাতা ক্ষুদ্র ও স্ফীত হতে পারে।
৪. কিউটিকল	নিমজ্জিত পাতায় কিউটিকল থাকে না। বায়বীয় অংশ ও ভাসমান পাতায় পাতলা কিউটিকলের স্তর থাকে।	কাণ্ড ও পাতার ত্বকে কিউটিকলের মোটা স্তর থাকে।	কাণ্ড ও পাতার উপরিভাগে পুরু কিউটিন স্তর থাকে।
৫. মোম	নিমজ্জিত অংশে মোমজাতীয় কোনো পদার্থ থাকে না।	পাতার উপর পৃষ্ঠ ও রূপান্তরিত কাণ্ডের পৃষ্ঠ মোমাবৃত থাকে।	পাতা ও কাণ্ডের উপর পৃষ্ঠে পুরু মোমাবৃত থাকে।
৬. পত্ররন্ধ্র	নিমজ্জিত অংশে পত্ররন্ধ্র নেই।	পাতার নিম্নপৃষ্ঠ ও কাণ্ডে লুক্কায়িত পত্ররন্ধ্র থাকে।	পত্ররন্ধ্র ক্ষুদ্র ও স্বল্পসংখ্যক।
৭. পরিবহণ টিস্যু	পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ ক্ষীণ ও দুর্বল।	পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ সুগঠিত।	পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ সুগঠিত।

জীবভূমি বা বায়োম (Biome)

একটি বড়ো বাস্তুতন্ত্র তথা ইকোসিস্টেমই একটি বায়োম। তুন্দ্রা অঞ্চল একটি বায়োম, মরুভূমি একটি বায়োম, ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট একটি বায়োম। **একই ধরনের জলবায়ু, একই ধরনের মাটি, একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমকে বলা হয় বায়োম**। প্রধানত ভূমিরূপ, জলবায়ু ও প্রধান ভেজিটেশন (উদ্ভিজ্জ) মিলিতভাবে এক একটি বায়োম সুনির্দিষ্ট করে। সারা বিশ্বে অনেক বায়োম আছে। বায়োম প্রধানত দুভাগে বিভক্ত– ১। **স্থলজ বায়োম** ও ২। **জলজ বায়োম**। নিচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

১। **স্থলজ বায়োম (Terrestrial biome)** : যেসব বায়োম স্থলভাগে অবস্থিত তাদের **স্থলজ বায়োম** বলে। স্থলজ বায়োম প্রধানত নিম্নরূপ :

(ক) মরুভূমি বায়োম (Desert biome) : মরুভূমি হলো এমন ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে বাৎসরিত বৃষ্টিপাত ২৫ সেমি (১০ ইঞ্চি)-এর কম। এখানে বাষ্পায়ন হার অনেক বেশি। এখানে জলীয় বাষ্প থাকে না। মাটিতে জৈব পুষ্টি খুব কম। মাটিতে পুষ্টি থাকলেও পানির খুব অভাব থাকে।

এ ধরনের মরুভূমি উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের 30° ল্যাটিচুডে অবস্থিত। সব মরুভূমি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত নয়। সবচেয়ে বড়ো মরুভূমি **সাহারা**, যা আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় অর্ধেক স্থান জুড়ে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মরুভূমি আছে। মরুভূমিতে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য 30°C পর্যন্ত হতে পারে। মরুভূমিতে অভিযোজিত উদ্ভিদকে **জেরোফাইট** বলা হয়। মরুভূমিতে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উভয় প্রকার উদ্ভিদ জন্মে। সাধারণত বছরে একবারই বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির সাথে সাথেই আগের বছরের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং খুব অল্প দিনেই প্রস্ফুটিত হয়ে ফুলে-ফলে ভরে যায়। সংক্ষিপ্ত জীবন শেষে এরা মরেও যায়। মরুভূমির উদ্ভিদের স্টোম্যাটা সাধারণত রাত্রিতে খোলে, তাই পানির অপচয় হয় না। এরা অধিকাংশই CAM উদ্ভিদ। ক্যাকটাস, বাবলা, খেজুর, কিছু ইউফরবিয়া, কিছু লিগিউম এবং অ্যাস্টারেসির কিছু উদ্ভিদ জন্মে থাকে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উট, দুম্বা, ক্যাঙ্গারু, র‍্যাবিট, খেকশিয়াল প্রধান। সরীসৃপের মধ্যে হর্ণ লিজার্ড, কোরাল সাপ, গিলা মনস্টার ইত্যাদি। পাখিদের মধ্যে শকুন, দাড়কাক, মধু পাখি উল্লেখযোগ্য। প্রাণীরা সাধারণত রাত্রে বেশি চলাফেরা করে।

[MAT:14-15]

(খ) তৃণভূমির বায়োম (Grassland biome) : এ বায়োমে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫–৭৫ সেমি (১০–৩০ ইঞ্চি), সাধারণত বছরে এক মৌসুমেই বৃষ্টিপাত হয়। ঘাস হলো তৃণভূমি বায়োমের প্রধান ভেজিটেশন। মধ্য কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়াতে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আছে। তৃণভূমি নানাবিধ তৃণভোজী প্রাণীর চারণ ক্ষেত্র। ঘাসের পাতা সরু এবং খাড়াভাবে থাকে, তাই প্রস্বেদন কম হয়। মাটি হিউমাস সমৃদ্ধ। দিনে ও রাতে তাপমাত্রা কম-বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীতকালে তাপমাত্রা 15°C এ নেমে যায় আর গ্রীষ্মকালে 32°C এর ওপরে ওঠে আসে। বড়ো ঘাস ১২-১৫ সে.মি. লম্বা হয়। যব, গম, রাই বেশি জন্মে। প্রধান প্রধান তৃণভোজী প্রাণী হলো বাইসন, জেব্রা, জিরাফ, ঘোড়া, এন্টিলোপ, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি। এদের ভক্ষক হলো সিংহ, হায়না ও খেকশিয়াল। কীটপতঙ্গের মধ্যে উঁইপোকা, ঘাসফড়িং, মৌমাছি, প্রজাপতি এবং এদের খাদক হিসেবে পাখি, টিকটিকি, সাপ ও ব্যাঙ বাস করে।

(গ) সাভানা বায়োম (Savanna biome) : এ বায়োমে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০–১৫০ সেমি (৪০–৬০ ইঞ্চি)। সাভানা এক বিশেষ ধরনের তৃণভূমি, মাঝে মাঝে ছোটো বৃক্ষ বা ঝোপ থাকে, যা তৃণভূমিতে থাকে না। সাভানাতে দীর্ঘ শুকনো মৌসুম থাকে। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের সীমানায় সাভানা সৃষ্টি হয়েছে। আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়াতে সাভানা আছে।

(ঘ) তুন্দ্রা বায়োম (Tundra biome) : সবচেয়ে উত্তরের স্থল ভাগের বায়োম হলো তুন্দ্রা। সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ, গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা ও উত্তর মেরু অঞ্চল নিয়ে তুন্দ্রা বায়োম গঠিত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কখনো ১৫ সেমি (৫ ইঞ্চি) বা তারও কম, যা বরফ হিসেবে পড়ে। দীর্ঘ শীতকালে এখানে বরফ জমা হয়ে থাকে। ছয় থেকে আট সপ্তাহের গ্রীষ্মকাল দেখা যায় যখন ওপরের কিছু বরফ গলে যায় এবং ছোটো ছোটো জলাভূমি সৃষ্টি হয়। এখানে সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে। মৃত জীবদেহ পুষ্টির প্রধান উৎস, যা নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সমৃদ্ধ।

তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ মস ও লাইকেন। এখানে বৃক্ষ প্রজাতি কম। উঁচু পর্বতশৃঙ্গে এরূপ অঞ্চল আছে, যাকে **আলপাইন তুন্দ্রা** বলে। স্তন্যপায়ীর মধ্যে বলগা হরিণ, খরগোস, নেকড়ে, মেরুভাল্লুক প্রধান। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন,

বাজপাখি, হাঁস, পেঁচা, স্যান্ড পাইপার প্রধান। গ্রীষ্মকালে কিছু মশা ও মাছির আগমন ঘটে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে শামুক, জোঁক, জলজ বিটল উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) বনভূমির বায়োম (Forestland biome) : পৃথিবীপৃষ্ঠের এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি দিয়ে আবৃত থাকে। এটা বৃষ্টিপাত প্রবণ এলাকা হওয়ায় প্রধান জীবগোষ্ঠী হলো বৃক্ষ এবং কাষ্ঠল উদ্ভিজ্জ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের বনভূমি দেখা যায়। বনভূমি বায়োম বিভিন্ন ধরনের :

(i) ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট (Tropical rain forest) : বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কমপক্ষে ২৫০ সেমি থেকে ৪৫০ সেমি (১০০ ইঞ্চি থেকে ১৮০ ইঞ্চি)। **বৃষ্টিপাত প্রায় সারা বছরই হয়,** তবে বর্ষাকালে অধিক। সবচেয়ে বড়ো ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট হলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান রেইন ফরেস্ট, এর আয়তন ৭০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার, এতে আছে ১৬,০০০ প্রজাতির ৩৯০ বিলিয়ন বৃক্ষ। এর ৬০% ব্রাজিলে অবস্থিত। বাকি অংশ পেরু, বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম প্রভৃতি দেশে অবস্থিত। **আমাজান রেইন ফরেস্টকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। সমগ্র বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২০% অক্সিজেন এ বনে নির্গত হয়।** দ্বিতীয় বৃহত্তম **ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ,** এরপর আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, ভারত, বার্মা, মধ্য আমেরিকা এবং ফিলিপাইনের অংশবিশেষে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট অবস্থিত।

ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে অসংখ্য প্রজাতির উঁচু বৃক্ষ জন্মে। বনের মেঝে (floor) অন্ধকার ও ভেজা থাকে। এসব বনে কোনো একক প্রজাতির উদ্ভিদ আধিপত্য বিস্তার করে না। বনের ওপরে ক্যানোপি (canopy) তৈরি হয় ৩০-৪৫ মিটার উঁচু বৃক্ষের প্রজাতি দিয়ে। কিছু উঁচু বৃক্ষ (৬০ মিটার বা বেশি) এ ক্যানোপি ভেদ করে ওপরে ওঠে যায়, যাদেরকে **ইমার্জেন্ট** (emergent) বলে। বৃক্ষকে অবলম্বন করে প্রচুর কাষ্ঠল লতা ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে স্পিসিস ডাইভারসিটি অধিক। এ সব ফরেস্টে অসংখ্য প্রজাতির পতঙ্গ, পাখি, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী ও উভচর প্রাণী বাস করে।

আফ্রিকার ফুসফুস : কঙ্গোলিয়ান রেইন ফরেস্টকে বলা হয় আফ্রিকার ফুসফুস। ২০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে এই বনে। ক্যামেরুন, গ্যাবন, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, নিরক্ষীয় গিনি অঞ্চলগুলো নিয়ে এই রেইন ফরেস্টের অবস্থান। বাংলাদেশের ফুসফুস সুন্দরবন।

(ii) ট্রপিক্যাল সিজনাল ফরেস্ট (Tropical seasonal forest) : ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট অঞ্চল থেকে এখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কিছুটা কম, তবে এখানকার বৃষ্টিপাত সারাবছর না হয়ে বিশেষ মৌসুমে (বর্ষাকালে) হয়ে থাকে। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সময় এ বন ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের মতোই, শীতকালে কিছু বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। **বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বন কতকটা এ জাতীয়। বার্মার (মিয়ানমার) সেগুন বন এ জাতীয়।**

(iii) পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous forest) : ডেসিডুয়াস ফরেস্টে বৃক্ষের পাতা বছরে একবার (বিশেষত শীতকালে বা শুকনো মৌসুমে) ঝরে যায়। ডেসিডুয়াস ফরেস্ট আবার দু'ধরনের, টেম্পারেট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট এবং ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট। নিচে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

(a) টেম্পারেট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট : এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ১০০ সেমি (৩৯ ইঞ্চি), কিন্তু তাপমাত্রা কম। শীতকালে সব বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। উঁচু বৃক্ষের মধ্যে ওক (Oak), ম্যাপল (maple), বীচ (Beech), বার্চ (Birch), চেস্টনাট প্রধান। আমেরিকা (পূর্ব দিক), কানাডা (উত্তর-দক্ষিণ দিক) ইউরোপ (মধ্য ও উত্তর ব্রিটেন, নরওয়ে, সুইডেন), রাশিয়া, পূর্ব এশিয়া, চায়না, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে এ বন আছে। এ অঞ্চলে তুষারপাত হয়।

(b) ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট : এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশি (২০০ সেমি, ৭০–৭৫ ইঞ্চি); শীত অপেক্ষাকৃত কম, বরফ পড়ে না। এ বনের অধিকাংশ বৃক্ষই পত্রঝরা। শাল, কড়ই, চালতা, কুম্ভি, কুরচি ইত্যাদি এ বনের প্রধান বৃক্ষ। **বাংলাদেশের শালবন ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট।**

(iv) কনিফার ফরেস্ট (Conifer forest) : এ অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫০–১০০ সেমি (২০–৪০ ইঞ্চি); দীর্ঘ শীতকাল ও সংক্ষিপ্ত গ্রীষ্মকাল থাকে। তাপমাত্রা $-30°C$ থেকে $30°C$, মাটি উর্বর এবং লিটার সমৃদ্ধ তাই অম্লীয়। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কনিফার ফরেস্ট আছে। প্রধান বৃক্ষ পাইন, স্প্রুস, ফার, রেডউড, হেমলক ইত্যাদি। এদের অধিকাংশই চিরসবুজ। প্রাণীর মধ্যে শিয়াল, নেকড়ে, সিংহ, হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, কাঠবিড়ালী, ইঁদুর এবং অসংখ্য পোকামাকড় এখানে জন্মে। সামান্য কিছু সরীসৃপ প্রাণীও আছে।

(v) ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove forest) : এ ধরনের বনাঞ্চল ৩২° উত্তর এবং ৩০° দক্ষিণ এর মধ্যবর্তী উপকূলীয় গড়ান অঞ্চলে (intertidal zone) জন্মে। বাংলাদেশের সুন্দরবন-এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের বন আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে আছে। প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটার কারণে মাটি সিক্ত, কর্দমাক্ত এবং লবণাক্ত হয়। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৬০–২০০ সেমি। এজন্য বনভূমি তেমন সমৃদ্ধ নয়। এমন পরিবেশে বিশেষ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ লক্ষ্য করা যায় (যেমন-শ্বাসমূল, জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম, স্তম্ভমূল ও ঠেসমূল)।

উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরী, কেওড়া, গরান, গেওয়া, হিজল, গোলপাতা, বাইন, বোরা ইত্যাদি প্রধান। এছাড়া কেয়া, টাইগার ফার্ন, বিভিন্ন ধরনের আরোহী লতা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রাণীগুলো হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতা বাঘ, চিত্রা হরিণ, কুমীর, বন্য শূকর, বানর, নানা ধরনের শামুক, সাপ ও পাখি।

২। **জলজ বায়োম (Aquatic biome) :** পৃথিবীপৃষ্ঠে জলময় পরিবেশের বায়োমগুলো একত্রে জলজ বায়োম নামে পরিচিত। জলজ বায়োম মিঠা পানি এবং সাগরে পৃথক প্রকৃতির। মিঠাপানির বায়োম নদী, হ্রদ, হাওর, বাঁওড়, জলাভূমি (wetlands) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। ম্যানগ্রোভস্ (mangroves) বনাঞ্চল ওয়েটল্যান্ড বায়োমের অন্তর্গত। ম্যানগ্রোভস্ ৩২° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ ল্যাটিচুডের মাঝামাঝি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

জলজ বায়োম প্রধানত দু'প্রকার। মিঠাপানির (স্বাদু পানির) ও লোনাপানির বায়োম।

(ক) মিঠাপানি বা স্বাদু পানির বায়োম (Freshwater biome) : পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মিঠাপানির বায়োম দিয়ে আবৃত। এগুলো ছোটো, অগভীর এবং বিচ্ছিন্ন। এগুলো কয়েক ধরনের।

(i) নদী (River) : নদীতে সাধারণত একমুখী স্রোত থাকে। ঝর্ণা, হ্রদ বা হিমবাহ থেকে নদীর উৎপত্তি হয়ে থাকে। নদীর উৎসে প্রচুর পরিমাণে নুড়ি পাথর থাকে। সেখানে পানির স্রোত বেশি থাকে। তাপমাত্রা কম থাকে। পানি স্বচ্ছ এবং প্রচুর O_2 থাকে। মাঝামাঝি সমতল অংশ বেশ চওড়া এবং শেষ দিকে পানিতে প্রচুর পলিমাটি থাকায় পানি ঘোলাটে হয়। মাঝামাঝি সমতল অংশে প্রচুর শৈবাল এবং সবুজ উদ্ভিদ জন্মে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে নানা ধরনের মাছ প্রধান, সরীসৃপের মধ্যে কুমির, ঘড়িয়াল, সাপ, কাছিম আর স্তন্যপায়ীর মধ্যে শুশুক।

(ii) জলাভূমি (Wetlands) : রামসার কনভেনশন (১৯৭১) অনুসারে বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত জলাভূমি সুন্দরবন ও টাঙ্গুয়ার হাওর। এছাড়া সারাদেশে ছোটো-বড়ো অনেক জলাভূমি আছে। এগুলো স্থায়ী বা অস্থায়ী, মিঠাপানি বা লোনা পানির জলাধার, এদের স্রোত বা বন্ধ জলাশয় থাকে। সারা বিশ্বের জলাভূমিতে ৫০০০ এর বেশি সপুষ্পক উদ্ভিদ জন্মে থাকে। বাংলাদেশে এর সংখ্যা প্রায় ১৫৪টি। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য জলজ উদ্ভিদ হলো-পানিফল, মাখনা, পদ্ম, শাপলা, হোগলা, অ্যাজুলা, স্যালভিয়া, কচুরীপানা ইত্যাদি। প্রাণীর মধ্যে ৭৫০ প্রজাতির পাখি, ৭৬০ প্রজাতির মিঠা ও লোনাপানির মাছ, ঝিনুক, শামুক, সাপ ও বহু অমেরুদণ্ডী প্রাণী বসবাস করে।

(iii) হ্রদ ও পুকুর (Lakes & Ponds) : এমন জলাশয়ের আয়তন কয়েক মিটার থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের গভীরতাও বেশ তারতম্য হয়ে থাকে। অনেক পুকুর শীতকালে শুকিয়ে যায়। হ্রদের গভীরতা অনেক (বৈকাল হ্রদ ৪৭৪২ ফুট) এবং স্থায়ী জলাধার। গভীর হ্রদগুলো আনুভূমিক তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত।

(a) বেলা অঞ্চল (Litoral zone) : এটি হ্রদের কিনারার উষ্ণ অঞ্চল। এখানে বিভিন্ন ধরনের শৈবাল, মূলবদ্ধ ও ভাসমান উদ্ভিদ জন্মে থাকে। প্রাণীদের মধ্যে স্নেইল, পতঙ্গ, ক্রাস্টাশিয়ান, মাছ ও উভচর প্রাণী বাস করে। পতঙ্গের মধ্যে ড্রাগন ফ্লাই এবং মিজেস প্রধান। এ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো ডাহুক, সাপ ও কচ্ছপের খাদ্য।

(b) অগভীর অঞ্চল (Limnetic zone) : এটি হ্রদের ওপরের মুক্ত অঞ্চল। এ অঞ্চল আলোকিত এবং প্রধানত ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্লাংকটন থাকে। এছাড়া কিছু ক্ষুদ্রাকার মাছও এখানে দেখা যায়।

(c) গভীর অঞ্চল (Profundal zone) : হ্রদের গভীরে ক্ষীণ আলোকিত অঞ্চলকে বোঝায়। এখানকার পানি ঠাণ্ডা। প্রাণীগুলো পরভোজী প্রকৃতির কারণ এরা মৃতদেহ ভক্ষণ করে থাকে।

(খ) সামুদ্রিক বা লোনাপানির বায়োম (Oceans & Seas) : মহাসাগর, সাগর ও মোহনা মিলে পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় ৩/৪ ভাগ দখল করে আছে লোনাপানির বায়োম। **এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো এবং প্রথম বায়োম।** সাগরের লবণাক্ততা প্রায় ৩৫ ppm এবং pH_8। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে পৃষ্ঠতলে পানির তাপমাত্রা 27°C আর মেরু অঞ্চলে 3°C। সাগরের ৪টি অঞ্চলেই প্রচুর জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান।

(i) গড়ান অঞ্চল (Intertidal zone) : যেহেতু এ অঞ্চলটি প্রতিদিন দু'বার জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয় তাই এখানে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। ওপরের অংশে কয়েকটি প্রজাতির ডায়াটম, বাদামি শৈবাল, লোহিত শৈবাল ও কিছু সবুজ শৈবালও জন্মে থাকে। প্রাণীদের মধ্যে স্নেইল, ক্রাবস, ছোটো ছোটো মাছ থাকে। এছাড়া ক্রাস্টাশিয়ান ও মোলাস্কা প্রাণী থাকে।

(ii) পেলাজিক অঞ্চল (Pelagic zone) : সাগরের পৃষ্ঠীয় যুক্ত অঞ্চলকে বোঝায়। এ অঞ্চলে আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে থাকে। এর পাশাপাশি প্লাংকটনও থাকে। প্রাণীদের মধ্যে নানা ধরনের মাছ, ডলফিন, হাঙ্গর ও তিমি থাকে।

(iii) বেনথিক অঞ্চল (Benthic zone) : পেলাজিকের নিচে অল্প আলো বা আলোহীন অঞ্চলকে বোঝায়। এখানে বালু, নুড়ি এবং মৃতদেহ থাকে। মূলত সামুদ্রিক আগাছা, ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, স্পঞ্জ, সি-স্টার মাছ থাকে।

(iv) এবিসাল অঞ্চল (Abyssal zone) : এটি সমুদ্রের গভীরতম স্থানকে বোঝায়। তাপমাত্রা প্রায় 3°C। পানির চাপ অনেক। পুষ্টি খুব কম থাকে। অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণী, মাছ এবং কেমোসিনথেটিক ব্যাক্টেরিয়া থাকে।

প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল (Zoogeographical regions)

পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র একই রকম নয়। এর কোথাও বরফ শীতল, কোথাও নাতিশীতোষ্ণ, আবার কোথাও উষ্ণ; এর কোথাও তৃণভূমি, কোথাও জলাভূমি, কোথাও মরুভূমি বা গভীর অরণ্যভূমি। এসব পরিবেশের কোনোটাই জীবপ্রজাতিবিহীন নয়। প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবেশেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু জীবপ্রজাতি রয়েছে। তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিকাংশ জীবপ্রজাতিই মরু অঞ্চলে পাওয়া যায় না। উদ্ভিদ তার স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে পারে না, কাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতি জন্মাতে দেখা যায়। প্রাণীরা প্রয়োজনে তাদের বাসস্থান ত্যাগ করে এদিক ওদিক যেতে পারে, তারপরও ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী লক্ষ্য করা

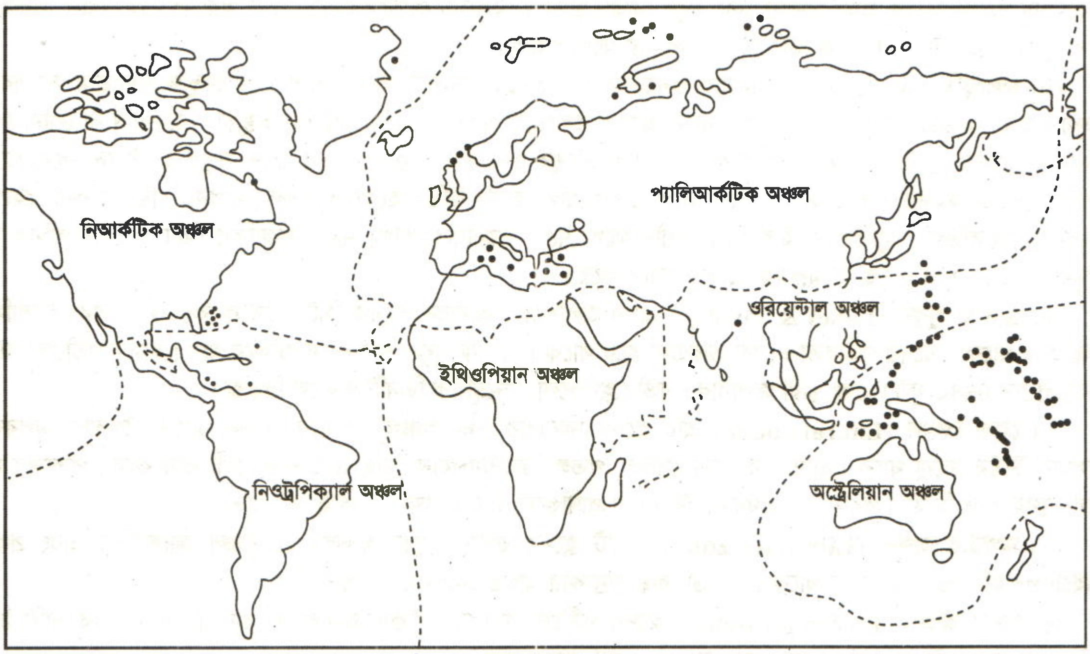

চিত্র ১২.১৪ : পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ।

যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থান ও বিস্তৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বুকে **মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অবস্থান ও বিস্তৃতির ওপর ভিত্তি করে** P. L. Sciater ১৮৫৭ সালে পৃথিবীকে মোট ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে A. R. Wallace সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে ঐ ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলকে সমর্থন করেন। ছয়টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল নিম্নরূপ :

১। প্যালিআর্কটিক অঞ্চল, ২। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল, ৩। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল, ৪। নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল, ৫। ইথিওপিয়ান অঞ্চল, ৬। নিআর্কটিক অঞ্চল।

একনজরে **A. R. Wallace** কর্তৃক প্রদত্ত ছক অনুসারে পৃথিবীর প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর নাম, সেই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের নাম এবং সেসব অঞ্চলের প্রধান কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম দেওয়া হলো :

অঞ্চলের নাম	অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের নাম	প্রধান মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম
১। প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic region)	ইউরোপের সমগ্র অংশ, আফ্রিকার উত্তরাংশ, এশিয়ার উত্তরাঞ্চল, হিমালয়ের উত্তর অংশ, চীন, জাপান ও কোরিয়ার উত্তর অংশ, ইরান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশসমূহ।	হরিণ, ভালুক, ভোঁদর, বলগা হরিণ, উঁট, গরু, কবুতর, ফ্লেমিংগো, উটপাখি, পেলিকন, চায়নিজ এলিগেটর, প্যাডেল ফিস, সাকারফিস, ক্যাটফিস।
২। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental region)	বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ভূটান, ফিলিপাইন, তাইওয়ান ইত্যাদি।	হাতি, বাঘ, গীবন, ভালুক, ওরাংওটাং, টাপীর, বাদুর, কবুতর, ফিঙে, কোকিল, ব্লু বার্ড, ময়ূর, কুমির, গুইসাপ, রুই, কাতলা, মৃগেল, ক্যাটফিস।
৩। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian region)	অস্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া, নিউজিল্যান্ড, নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চল ও প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দ্বীপ।	ক্যাঙ্গারু, ওয়াল্লাবি, কোয়েলা, ওমব্যাট, প্লাটিপাস, অপোসাস, লায়ার বার্ড, ক্যাসোয়ারি কাকাতুয়া, টিয়া, এমু, বার্ডস অব প্যারাডাইস, কাঠঠোকরা, কিউই, স্ফেনোডন, টিফলপস।
৪। নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical region)	মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইত্যাদি।	ভালুক, হরিণ, কুকুর, লামা, অপোসাম, উটপাখি, রিয়া, অস্ট্রিচ, সারস, বাজ, প্যাঁচা, হামিংবার্ড, কুমির, কচ্ছপ, কোরাল, সাপ, বোয়া, ভাইপার, বাইন মাছ, ক্যাটফিস, লাংফিস।
৫। ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopian region)	আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ অঞ্চল, আরবের দক্ষিণ অঞ্চল, মাদাগাস্কার (বা মালাগাছি) ও মাদাগাস্কারের নিকটবর্তী কিছু মহাসাগরীয় দ্বীপ।	গরিলা, শিম্পাঞ্জী, লেমুর, হাতি, ভোঁদর, হায়না, গণ্ডার, আর্মাডিলো, জিরাফ, জেব্রা, জলহস্তী, উটপাখি, বাজ, শকুন, সারস, ফিঙে, কুমির, গুইসাপ, বোয়াপাইথন, ক্যাটফিস, লাংফিস।
৬। নিআর্কটিক অঞ্চল (Nearctic region)	গ্রিনল্যান্ড, মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চল, কানাডা, উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ, আইসল্যান্ড ইত্যাদি এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।	ঘোড়া, উট, লামা, আলপাকা, গোয়াস্কা, নেকড়ে, মেরুশিয়াল, ভালুক, ক্যাঙারু, বাইসন, লালহরিণ, পেলিকান, শকুন, টার্কিস, হামিংবার্ড, ফিঙে, কচ্ছপ, এলিগেটর, কুমির, প্রবাল, সাপ, স্যালামান্ডার, প্যাডেল ফিস, বো ফিন, সাকার ফিস, ক্যাটফিস ইত্যাদি।

পৃথিবীর ছয়টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্য থেকে এখানে কেবল ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental Region)

ভৌগোলিক সীমানা : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উত্তরে আফগানিস্তান ও চীন, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে ইরান ও আরব এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত।

অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ : ক্রান্তীয় এশিয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন, শ্রীলংকা, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, নেপাল, ভূটান ইত্যাদি ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের অন্তর্গত।

এ অঞ্চলটি প্রধান চারটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত; যথা—

১। **ভারতীয় উপ-অঞ্চল (Indian subregion) :** এ উপ-অঞ্চলটি সিন্ধুনদ ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে গোয়া হয়ে মহীশুর, সমগ্র মধ্য ও উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত। **বাংলাদেশ** ভারতীয় উপ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

২। **সিংহলীয় উপ-অঞ্চল (Ceylonese subregion) :** ভারতীয় উপদ্বীপের অংশবিশেষ এবং সমগ্র শ্রীলংকা এ উপ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৩। ইন্দোচীন উপ-অঞ্চল (Indo-China subregion) : চীনের প্যালিআর্কটিক সীমানার দক্ষিণাংশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, আন্দামান ও হাইনান দ্বীপপুঞ্জ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

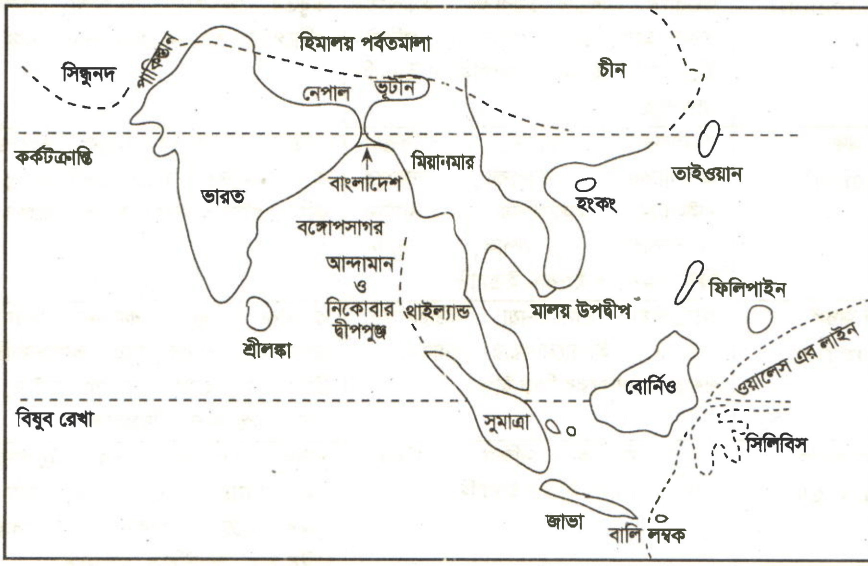

চিত্র ১২.১৫ : ওরিয়েন্টাল প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের মানচিত্র।

৪। ইন্দোমালয় উপ-অঞ্চল (Indo-Malayan subregion) : মালয় উপদ্বীপ ও ইস্ট ইন্ডিজের কতগুলো দ্বীপ যেমন বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা এবং নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

জলবায়ু : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের প্রায় সমগ্র অংশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। এ অঞ্চলের পূর্বাংশে স্টেপ ও প্রেইরি তৃণভূমি, মধ্যভাগে মৌসুমি উদ্ভিদবিশিষ্ট সাভানা তৃণভূমি এবং সীমিত অঞ্চলে ক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের দিনরাত্রি প্রায় সমান।

উদ্ভিদকুল (Flora) : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এখানকার জলবায়ু আর্দ্র ও গরম বিধায় এখানে চিরসবুজ বৃক্ষের গভীর বনাঞ্চল এবং সিক্ত পত্রঝরা বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০ সে.মি.। এ অঞ্চলে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট, ডেসিডুয়াস ফরেস্ট, ট্রপিক্যাল গ্রাসল্যান্ড এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দেখা যায়। এখানে প্রচুর শাল (*Shorea robusta*), গর্জন (*Dipterocarpus turbinatus*), সুন্দরী (*Heritiera fomes*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), পশুর (*Zylocarpus granatum*), গোলপাতা (*Nipa fruticans*), বেত (*Calamus rotung*), নারিকেল (*Cocos nucifera*), সুপারি (*Areca catechu*), রাবার (*Hevea brasiliensis*), হেতাল (*Phoenix paludosa*), আম (*Mangifera indica*), জাম (*Syzygium cumini*), কাঁঠাল (*Artocarpus heterophyllus*), সিঙ্কোনা (*Cinchona officinalis*), কফি (*Coffea arabica*), চা (*Camellia sinensis*), পাট (*Corchorus capsularis*), কার্পাস তুলা (*Gossypium herbaceum*) ইত্যাদি গাছ জন্মে। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উপকূলে গরান (*Ceriops decandra*) বা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দেখা যায়।

প্রাণিকুল (Fauna) : এ অঞ্চলে বহু ধরনের প্রাণী রয়েছে। এদেরকে নিম্নলিখিত উপায়ে সাজানো যায় :

মিঠা বা স্বাদুপানির মাছ : ইলিশ (*Tenualosa ilisha*), রুই মাছ (*Labeo rohita*), মাগুর মাছ (*Clarius batrachus*), লইট্যা মাছ (*Harpodon nehereus*), হাঙ্গর মাছ (*Scoliodon sorrakowah*), কই মাছ (*Anabus testudineus*), ফলি মাছ (*Notopterus notopterus*), পাবদা মাছ (*Ompok pabda*), তারাবাইন (*Macrognathus oral*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

উভচর : কুনোব্যাঙ (*Duttaphrynus melanostictus*), সোনাব্যাঙ (*Haplobatrachus tigerinus*), গেছোব্যাঙ (*Rhacophorus fergusonil*), স্যালামান্ডার (*Tylotoriton vercossa*), ইক্‌থিওফিস্ (*Ichthyophis*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সরীসৃপ : গোখরা (*Naja naja*), স্থল কচ্ছপ (*Indotestudo elongata*), গুইসাপ (*Varanus bengalensis*), কমোডোড্রাগন, গিরগিটি, ড্রাকো, রক্তচোষা (*Calotes versicolor*), কেউটে, উড়ুক্কু, টিকটিকি (*Draco maculatus*), চন্দ্রবোড়া, অজগর (*Python morulus*) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী।

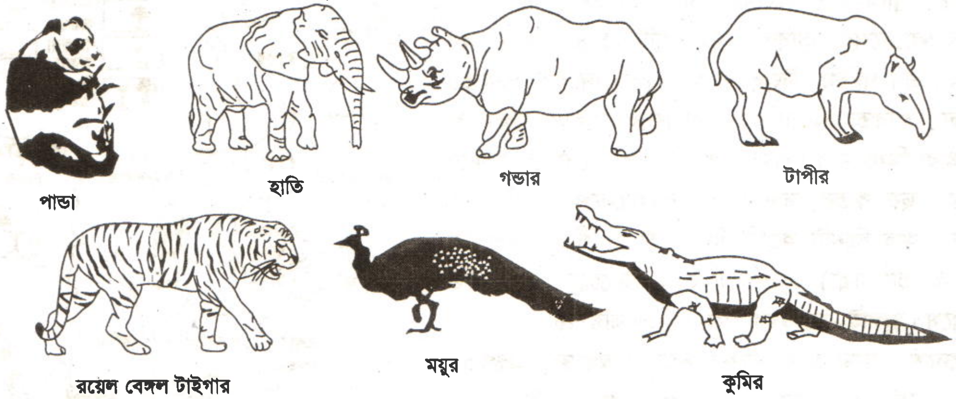

চিত্র ১২.১৬ : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণিকুল।

পক্ষীকুল : টিয়া (*Psittacula eupatria*), কবুতর (*Columba livia*), শ্বেত কাকাতুয়া (*Cacatua alba*), ফিঙ্গে, কোকিল (*Phaenicopheus* sp), ময়ূর (*Pavo cristatus*), ব্লু বার্ড, বনমোরগ (*Gallus gallus*), বাবুই, শালিক, মাছরাঙ্গা, দোয়েল (*Copsychus saularis*), পাহাড়ি ঘুঘু (*Columba puncicea*), হলদে পাখি, রাজশকুন (*Sarcogyps calvus*), বুলবুলি, হাঁস, প্যাঁচা (*Bubo bubo*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

স্তন্যপায়ী : এ অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার (*Panthera tigris*), চিতাবাঘ (*Banis javanica*), হাতি (*Elephas maximus*), উল্লুক (*Hylobates hoolock*), ভাল্লুক (*Melarsus ursinus*), ওরাংওটাং (*Pongo pygmaeus*), বানর (*Macaca mulatta*), বুনো মহিষ (*Bubalus bubalis*), দ্বিশৃঙ্গী গণ্ডার (*Dicerorhinus sumatrensis*), চিত্রা হরিণ (*Axis axis*), খরগোশ, শুশুক (*Platanista gangetica*), সজারু, টাপীর, বাদুর (*Pteropus* sp), বন্যশূকর, সিংহ (*Panthera leo*), চশমাপড়া হনুমান (*Trachypithcus phayrei*), হায়েনা (*Hyaena* sp), বড়ো বেজী (*Herpestes edwardsi*), বনরুই (*Manis crassicaudata*), পাণ্ডা (*Ailuropoda melanoleuca*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

Endemic (আঞ্চলিক) : কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক **অঞ্চলে সীমাবদ্ধ** উদ্ভিদ বা প্রাণীকে উক্ত অঞ্চলের এন্ডেমিক **উদ্ভিদ/প্রাণী** বলে।

Exotic (বিদেশি) : এক ভৌগোলিক অঞ্চল (দেশ) থেকে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চল (দেশ)-এ প্রবর্তনকারী উদ্ভিদ বা প্রাণীকে আগত অঞ্চলের **Exotic উদ্ভিদ/প্রাণী** বলে; যেমন—পেঁপে, আনারস, তেলাপিয়া ও সিলভার কার্প মাছ বাংলাদেশের Exotic (পরদেশি)।

মিঠাপানির এন্ডেমিক : পাবদা [DAT: 22-23]

ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের কয়েকটি এন্ডেমিক ফনা (প্রাণী)

শ্রেণি	সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
Osteichthyes (মাছ)	নাপতি কই সবুজ রুই	*Badis badis* *Lubeo fisheri*
Amphibia (উভচর)	গারো পাহাড়ি ব্যাঙ ড্যানিয়েল ব্যাঙ	*Rana garoensis* *Rana daniel*
Reptilia (সরীসৃপ)	ঘড়িয়াল সিলেটি কাছিম	*Gavialis gangeticus* *Kachuga sylhetensis*
Aves (পাখি)	বর্মী ময়ূর শ্বেত কাকাতুয়া	*Pavo muticus* *Cacatua alba*
Mammalia (স্তন্যপায়ী)	সিংহলেজী বানর শুশুক	*Macaca silenus* *Orcaella brevirostris*

বাংলাদেশের বনাঞ্চল (Forest of Bangladesh)

বাংলাদেশ ২০°৩০´ থেকে ২৬°৪৫´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮° থেকে ৯২°৫৬´ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত একটি জনবহুল ছোট্ট দেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের আয়তন মোটামুটি ১,৪৮,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার। এর পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব– তিন দিকেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার দক্ষিণাংশ নাফ নদী দ্বারা মিয়ানমার (বার্মা) থেকে পৃথক। দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ছয় ঋতুর দেশ হলেও বাংলাদেশে তিনটি ঋতু উল্লেখযোগ্য। ঋতু তিনটি হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। সবচেয়ে গরম (অধিক তাপমাত্রা) এপ্রিল-মে এবং সবচেয়ে বেশি শীত জানুয়ারি মাসে। জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে অধিক বৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের বড়ো অংশ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। বাকি অংশে ছোটো বড়ো অনেক বন দেখা যায়। একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা উচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে বনাঞ্চল কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১০ ভাগের মতো। প্রয়োজনের তুলনায় এ পরিমাণ অনেক কম।

বনের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের বনকে নিম্নলিখিত উপায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

১। চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বনাঞ্চল, ২। পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল এবং ৩। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

চিত্র ১২.১৭ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল।

১। **চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বনাঞ্চল (Evergreen and semi-evergreen forest) :** চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বন অবস্থিত।

এ বনের বৈশিষ্ট্য

(i) বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২২৫ সে.মি (চট্টগ্রামে) থেকে ৫০০ সে.মি. (সিলেট), তাই বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে।

(ii) মাটিতে হিউমাস অধিক, মাটি অ্যাসিডিক (অম্লীয়)।

(iii) বন অপেক্ষাকৃত ঘন।

(iv) ভূমিরূপ : ছোটো ছোটো পাহাড় ও মাঝে মাঝে খাদ।

(v) অধিকাংশ উদ্ভিদ চিরসবুজ প্রকৃতির।

প্রধান প্রধান উদ্ভিদ

সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষের মধ্যে সিভিট (*Swintonia floribunda*), গর্জন (*Dipterocarpus turbinatus*), চন্দুল (*Tetrameles nudiflora*); দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃক্ষের মধ্যে নাগেশ্বর (*Mesua ferrea*), বাটনা (*Quercus* spp.), পিতরাজ (*Amoora wallichii*) প্রধান। পত্রঝরা বৃক্ষের মধ্যে কড়ই (*Albizia procera*), গামার (*Gmelina arborea*), ভাদি (*Lannea coromandelica*), চাপালিশ (*Artocarpus chaplasha*), উদাল (*Sterculia vilosa*) ইত্যাদি প্রধান। এ বনে প্রচুর পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, কচু জাতীয় উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ন জন্মে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক দুর্গম ও বিস্তর এলাকা নিয়ে **বাঁশবন** অবস্থিত। অধিকাংশ বাঁশই মূলী বাঁশ (*Melocanna baccifera*)। খাড়া ঢাল ও অগভীর খাতের কারণে কৃষি কাজের অনুপযোগী। তবে কোনো কোনো এলাকায় জুম চাষ (Jhum cultivation) হয়ে থাকে। জুম চাষের পর দীর্ঘদিন পড়ে থাকা এলাকায় **ছনবন** সৃষ্টি হয়। ছন বনের প্রধান উদ্ভিদ ছন (*Imperata cylindrica*) এবং খাগড় বা কাশ (*Saccharum spontaneum*)।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সেগুন বন লাগানো। ১৮৬১ সালে বার্মা থেকে বীজ এনে প্রথম সেগুন বাগান করা হয় কাপ্তাই এলাকায়। সেগুন *(Tectona grandis)* কাঠ বাংলাদেশের প্রথম সারির কাঠ।

সোয়াম্প ফরেস্ট হলো মিঠাপানি বা স্বাদুপানির জলাশয় দ্বারা জলাবদ্ধ বন। সিলেটের উত্তরাংশে **জলাবদ্ধ বন** (Swamp forest) আছে। এটি **রাতারগুল জলাবন** হিসেবে পরিচিত। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ নল খাগড়া (*Phragmitis karka*), কাশ (*Saccharum spontaneum*) এবং ইকড়া ঘাস (*Erianthus ravennae*)। বৃক্ষের মধ্যে হিজল (*Barringtonia acutangula*) এবং করচ গাছ (*Pongamia pinnata*) প্রধান। বাংলাদেশের **একমাত্র বন্য গোলাপ** (*Rosa involucrata*) এখানে পাওয়া যায়। রাতারগুল বন দেখার জন্য প্রচুর পর্যটক এসে থাকে। এখানে একটি **পর্যবেক্ষণ টাওয়ার** আছে।

চিত্র ১২:১৮ : সিলেটের রেমা-কেলেঙ্গা বনের অংশবিশেষ।

[DAT:18-19]

বৃহত্তর সিলেটের বনাঞ্চলের মধ্যে রেমা-কেলেঙ্গা, লাওয়াছড়া, সাতছড়ি উল্লেখযোগ্য নাম। সিভিট ও গর্জন চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যথেষ্ট পাওয়া গেলেও সিলেটের বনে এগুলো কম। সিলেটে প্রচুর বেত জন্মে।

প্রাণিকুলের মধ্যে আসামী বানর, চশমা হনুমান, মুখপোড়া হনুমান, উল্লুক, গেছোভাল্লুক, বুনো শূকর, উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, শেয়াল ইত্যাদি প্রধান।

২। **পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous forest) :** যে বনের সকল বৃক্ষের পাতা একসাথে ঝরে যায় তাদের দিয়ে গঠিত বনকে পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বন বলে। এ বন ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, কুমিল্লার ময়নামতি এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত। ময়নামতির বন **শালবন বিহার** নামে, শেরপুর জেলার উত্তরে পাহাড়ি এলাকায় **রাংটিয়া বন ও গজনী বন** নামে পরিচিত।

বরেন্দ্র বনাঞ্চল : রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় অবস্থিত।

মধুপুর বনাঞ্চল : টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বেশ কিছু অংশ নিয়ে গঠিত।

রাজেন্দ্রপুর বনাঞ্চল : গাজীপুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত।

চন্দ্রা বনাঞ্চল : গাজীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে এটি অবস্থিত।

লালমাই শালবন অঞ্চল : এটি কুমিল্লা জেলায় লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত।

চিত্র ১২.১৯ : শালবন।

পত্রঝরা বনের বৈশিষ্ট্য

(i) বসন্তকালে গাছে নতুন পাতা গজায় আর শীতকালে এ বনের বৃক্ষরাজির পাতা ঝরে যায়।

(ii) বার্ষিক বৃষ্টিপাত কম, ১২৫ সেমি (বরেন্দ্র অঞ্চলে) থেকে ১৭৫ সেমি (ঢাকায়), তাই বাতাসের আর্দ্রতা অপেক্ষাকৃত কম।

(iii) লৌহের (আয়রন-অক্সাইড হিসেবে) পরিমাণ অধিক থাকায় মাটির বর্ণ লাল বা হলুদাভ, মাটি বেশ অ্যাসিডিক, বর্ষায় কর্দমাক্ত ও শীতে শুকনো।

(iv) বন তুলনামূলকভাবে কম ঘন, তবে মধুপুর অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ঘন।

(v) উঁচু **'চালা'** এবং ফাঁকে ফাঁকে সমতলভূমি **'বাইদ'** অবস্থিত। চালায় বন এবং বাইদে ধান চাষ হয়।

(vi) গড় তাপমাত্রা শীতকালে 17.8°C এবং গ্রীষ্মকালে 26.70°C।

প্রধান প্রধান উদ্ভিদ

এ বনের প্রধান বৃক্ষ শাল। শাল বৃক্ষের পরিমাণ কোনো কোনো স্থানে শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ পর্যন্ত। তাই এ বনের অপর নাম **শালবন**। বর্তমানে অধিকাংশ মূল শালবৃক্ষই কর্তিত। মূল বৃক্ষের গোড়া থেকে গজানো চারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান বন, তাই এ বনের আরেক নাম **গজারী বন**।

প্রধান বৃক্ষ শাল (*Shorea robusta*)। এ ছাড়াও চালতা (*Dillenia pentagyna*), কড়ই (*Albizia procera*), গাছিগজারী (*Miliusa velutina*), কুম্ভী (*Careya arborea*), বহেড়া (*Terminalia bellirica*), কুরচি (*Holarrhena antidysenterica*) ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে থাকে। শতমূলী (*Asparagus racemosus*), উলট চণ্ডাল (*Gloriosa superba*) এবং সর্পগন্ধা (*Rouvolfia serpentina*) তিনটি বিপদাপন্ন ভেষজ উদ্ভিদ এ বনে দেখা যায়।

এ বনে প্রাণীদের মধ্যে মায়া হরিণ (*Muntiacus muntjak*), বানর (*Macaca mulatta*), মুখপোড়া হনুমান, শেয়াল (*Canis aureus*), বুনো শূকর, সজারু, বাদুর, বেজি, খাটাস (*Viverricula indica*) ভুতুম পেঁচা (*Bube zeylonensis*) মেছো বিড়াল (*Felis viverrinus*) প্রধান।

৩। ম্যানগ্রোভ বা উপকূলীয় বনাঞ্চল (Mangrove or Tidal forest) : লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত ভেজা মাটির বনকে **ম্যানগ্রোভ বন** বলে। বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবন হলো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড়ো ম্যানগ্রোভ বনভূমি। ম্যানগ্রোভ বনের বড়ো অংশ পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে বৃহত্তর খুলনা পাড় হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কাছে রায়মঙ্গল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশ **সুন্দরবন** নামে পরিচিত। এছাড়া মাতামুহুরী নদীর মোহনায় **চকোরিয়া সুন্দরবন**ও ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত এবং নাফ নদীর তীরে কিছু **ম্যানগ্রোভ** বন দেখা যায়। সুন্দরবনের অর্থাৎ ম্যানগ্রোভের ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রায় ৬২% বাংলাদেশে অবস্থিত। সুন্দরবনের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেমি এবং প্রাণিকুলে প্রজাতির সংখ্যা স্থলভাগে ২৮৯টি এবং জলভাগে ২১৯টি প্রজাতি রয়েছে।

ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য

(i) এ বন চিরসবুজ বন।

(ii) বনের নিম্নাঞ্চল দৈনিক দু'বার জোয়ারের পানিতে সিক্ত হয়।

(iii) মাটি এবং পানি লবণাক্ত। মাটির pH ৭ এর কাছাকাছি।

(iv) মাটিতে অক্সিজেনের অভাব থাকায় অধিকাংশ বৃক্ষের শ্বাসমূল বা নিউমেটোফোর হয়।

(v) লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক ওজনের ১০–৫০ ভাগ।

(vi) জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়।

(vii) অসংখ্য নদী-উপনদী ও চ্যানেল দ্বারা সুন্দরবন ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত।

প্রধান প্রধান উদ্ভিদ

নদীপাড়ের কম লবণাক্ত (হালকা) পানিতে গোলপাতা (*Nipa fruticans*), হিতাল (*Phoenix paludosa*), সুন্দরী (*Heritiera fomes*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), আমুর (*Amoora cucullata*), গরান (*Ceriops decandra*) জন্মে থাকে। অধিক লবণাক্ত (চরম) অঞ্চলে কাঁকড়া (*Bruguiera gymnorrhiza*), বাইন (*Avicennia officinalis*), পশুর (*Xylocarpus moluccensis*), ধুন্দুল (*Xylocarpus granatum*) জন্মে থাকে। প্রধান লতা সুন্দরীলতা (*Brownlowia lanceolata*) এবং গুল্মজাতীয় বোহাল (*Hibiscus tiliaceous*) ও হাড়গোজা (*Acanthus ilicifolius*) প্রধান। সুন্দরবনে টাইগার ফার্নের (*Acrostichum aureum*) ঝোপ আছে। সুন্দরবনে কোনো বাঁশ জন্মে না। হরেক রকমের অর্কিড জন্মে।

(১) গোলপাতা (২) টাইগার ফার্ন

চিত্র ১২.২০ : সুন্দরবনের (১) গোলপাতা, (২) টাইগার ফার্ন।

প্রাণিকুল : উদ্ভিদের মতো সুন্দরবন প্রাণিকুলেও সমৃদ্ধ। এখানকার স্থলভাগে ২৮৯টি প্রাণী এবং জলভাগে ২১৯টি প্রাণী প্রজাতি রয়েছে। এছাড়া এখানে ৩১৫টি প্রজাতির পাখিও রয়েছে।

(১) হিতাল (২) হরিণ

চিত্র ১২.২১ : সুন্দরবনের (১) হিতাল, (২) হরিণ।

সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ২০১৩ সালের হিসাব মতে যার সংখ্যা ৪৪০টি। এখানে বর্তমানে হরিণ আছে ৮০-৮৫ হাজার, বানর ৪০-৫০ হাজার, লোনাপানির কুমির ২০০-২৫০টি। এখানে ১২০ প্রজাতির মাছ এবং ২৭০ প্রজাতির পাখি আছে। এছাড়াও আছে বনমোরগ, অজগর, বাদামি কাঠবিড়ালী, বুনোশূকর, পেরাবন সাপ ইত্যাদি।

সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট (বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা) : সুন্দরবনের তিনটি বন্যজীব অভয়ারণ্য নিয়ে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট গঠিত। এর আয়তন ১৪০০ বর্গকিলোমিটার, যার মধ্যে ৯১০ বর্গকিলোমিটার বনভূমি আর ৪৯০ বর্গকিলোমিটার জলাভূমি। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে UNESCO-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি ১৯৯৭ সালে তাদের ২১তম সেশনে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ-এর অংশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এবং বাংলাদেশ সরকার একে ১৯৯৯ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে।

উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সবুজ বেষ্টনী (Costal-tidal forest & Green belt)

উপকূলীয় বনাঞ্চল উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। উপকূলীয় বনাঞ্চলের বেশির ভাগ উদ্ভিদ বহুবর্ষজীবী ও দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হয়।

২। লবণাক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌন জননের ঘটনা কমে যায়।

৩। বিভিন্ন ধরনের **ক্লোনাল বংশবৃদ্ধি** পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

৪। বৃদ্ধির হার শস্য উদ্ভিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম।

৫। দ্রবীভূত নাইট্রোজেনের ঘনত্ব বেশি থাকে।

৬। পাতার অভ্যন্তরীণ লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক ওজনের শতকরা ১০-৫০ ভাগ।

৭। জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম দেখা যায়।

৮। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্বাসমূল থাকে। জোয়ারে প্লাবিত বা সিক্ত মাটি থেকে পর্যাপ্ত O_2 না পেলে শ্বাসমূল বাতাস থেকে O_2 গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে উপকূলীয় বনাঞ্চল

বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক স্থলবেষ্টিত কিন্তু দক্ষিণ দিকে রয়েছে উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলো, বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা সরাসরি সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়াও সাগরবক্ষে সন্দীপ, হাতিয়া, মহেশখালী, উড়িরচর, চর কুকড়ি-মুকড়িসহ অসংখ্য ছোটো-বড়ো দ্বীপ ও চর এলাকা রয়েছে। সম্পূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় ৭১০ কিমি. লম্বা।

ভূমি ও উদ্ভিজ্জের ভিত্তিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় বনাঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল : বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে বদর মোকাম থেকে ফেনী নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে পাহাড় আছে। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ১৪৫ কিমি. দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত আছে। বাংলাদেশের একমাত্র **প্রবাল দ্বীপ** সেন্টমার্টিন এ অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বাইন, গরান, গেওয়া প্রধান উদ্ভিদ। এছাড়া গোলপাতা, টাইগার ফার্ন, হাড়গোজা ইত্যাদি দেখা যায়।

২। মধ্য উপকূলীয় অঞ্চল : ফেনী নদীর মোহনা থেকে সুন্দরবনের পূর্ব পর্যন্ত সমতল বিস্তৃত অংশ। এখানে ৬০টির মতো দ্বীপ আছে এবং প্রধান উদ্ভিদ কেওড়া। এছাড়া এখানে বাইন, গেওয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ দেখা যায়।

৩। পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল : সম্পূর্ণ সুন্দরবন এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলে বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি গড়ে ওঠেছে। সুন্দরী, গেওয়া, গরান, বাইন, গোলপাতা, হাড়গোজা, টাইগার ফার্ন প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ।

প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ একটি ঝড়প্রবণ এলাকা। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সিডর, টর্নেডো, ফনি, বুলবুল আম্পান, মোখা ইত্যাদি নামের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছরই উপকূলীয় জেলাসমূহে আঘাত হানে। এর ফলে ব্যাপক প্রাণ ও সম্পদহানি ঘটে। সমুদ্রের দ্বীপ ও চর এলাকা বলতে গেলে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আমাদের এ বিস্তীর্ণ এলাকাকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সিডর, ঘূর্ণিঝড় এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার একটি চমৎকার উপায় হলো উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টিকরণ। সবুজ বেষ্টনী হলো উপকূলীয় বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে একটি শক্ত ও মজবুত সবুজ বেষ্টনী তৈরি করা।

১৯৯১ সনে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এর প্রেক্ষিতেই উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত মানুষ ও তাদের সম্পদ রক্ষার ব্রত নিয়ে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং উপকূলীয় বনবিভাগ নামে একটি বনবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। প্রাথমিকভাবে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার ৩০০ কিলোমিটার উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী (Costal-tidal Green belt)

বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে ঋতু পরিবর্তনের সময় বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে ভূখণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। ঘরবাড়ি, বড়ো বড়ো গাছপালা ও প্রাণিসম্পদের প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়। তাই ঝড়ের কবল থেকে ঘরবাড়ি, ফসল, কৃষিজমি ও বনাঞ্চল রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিবেশতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় বৃক্ষ রোপণ করা যেতে পারে। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে উপকূল বরাবর এবং প্রধান বায়ু প্রবাহের সমকোণে রোপিত একফালি শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ বৃক্ষকে বায়ু প্রবাহ রোধক বেষ্টনী বা সবুজ বেষ্টনী বলে।** আর যে একফালি ভূখণ্ডের ওপর সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয় সেই ভূ-খণ্ডকে **আশ্রয় ফালি** (Shelter belt) বলে। চিরহরিৎ বৃক্ষের উঁচু প্রজাতিগুলো সবুজ বেষ্টনী হিসেবে অধিক কার্যকর। তবে আশ্রয় ফালির শুধুমাত্র কেন্দ্রাংশ বরাবর সর্বোচ্চ বৃক্ষ রোপণ করতে হয় এবং তার উভয় পাশে ক্রমশ কম উচ্চতার বৃক্ষ, গুল্ম, উপগুল্ম ও তৃণলতা রোপণ করতে হয়। এর ফলে বনের ক্যানোপির (Canopy) প্রস্থচ্ছেদ ত্রিকোণাকার হয়।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা (Necessity of tidal green belt)

১। সবুজ বেষ্টনী সমুদ্র থেকে আসা জলোচ্ছ্বাসকে প্রাথমিকভাবে প্রতিহত করে এবং জলোচ্ছ্বাসের গতি, প্রচণ্ডতা ও উচ্চতা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়।

২। জলোচ্ছ্বাসকালীন ভাটার টানে মানুষ, পশু ও অন্যান্য সম্পদ ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

৩। ঝড়ের গতিবেগ, ঝাপটা ও ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

৪। বাসস্থান গভীর পানিতে তলিয়ে গেলে বৃক্ষের ওপর ওঠে মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে।

৫। সবুজ বেষ্টনীতে লাগানো বৃক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জ্বালানি, কাঠ, খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেতে পারে।

সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষের ধরন বা বৈশিষ্ট্য

১। উপকূলীয় অঞ্চল জোয়ারের পানিতে নিয়মিত সিক্ত হয় এবং পানি লবণাক্ত। একটু উঁচু জায়গায়ও মাঝে মাঝে জোয়ারের পানি ঢুকে যায়। কাজেই লবণাক্ত পানিতে জন্মাতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি সবুজ বেষ্টনীর জন্য নির্বাচন করতে হবে।

২। মূলতন্ত্রের মাধ্যমে মাটি ধরে রাখতে পারে এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৩। ঝড়ের ঝাপটায় ভেঙে না যায় বা মূলোৎপাটিত না হয় এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৪। সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ থেকে খাদ্য, পশুখাদ্য, পানীয়, জ্বালানি, কাঠ ও অন্যান্য অর্থকরী সম্পদ প্রাপ্তির সুবিধা থাকতে হবে।

কেওড়া, সুন্দরী, বাইন, রাইজোফোরা, পশুর, নারিকেল, সুপারি, গাব, বিলাতি গাব ইত্যাদি বৃক্ষ-প্রজাতি নির্বাচন করা যেতে পারে। মৃদু লবণাক্ত পানি এদের জন্য অসুবিধা হয় না। কেওড়া পাতা হরিণের প্রিয় খাদ্য, এর মূল মাটি ধরে রাখতে পারে, এ থেকে জ্বালানি ও কাঠ পাওয়া যায়। সুন্দরী থেকে কাঠ পাওয়া যায়। গাব থেকে জ্বালানি, মাছের জাল শক্ত করার উপাদান এবং খাওয়ার যোগ্য ফল পাওয়া যায়। এছাড়া গাব গাছ অত্যন্ত শক্ত, ঝড়ের ঝাপটা সামাল দিয়ে টিকে থাকতে পারে। ভেতরের দিকে লাগানো নারিকেল এবং সুপারি বাগান খাদ্য, পানীয় ও অর্থ যোগান দিতে পারে।

রেইনট্রি, গগন শিরিষের মতো কম শক্ত কাঠের বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত নয়। প্রচণ্ড ঝড়ে বা জলোচ্ছ্বাসে এরা নিজেরাই ভেঙে যায় এবং বসতবাড়ি, মানুষ ও পশুপাখির মৃত্যুহার বাড়িয়ে দেয়। এ জাতীয় বৃক্ষই ঝড়ের কবলে পড়ে ভেঙ্গে যায় এবং প্রচুর বাড়ি-ঘর ও মানুষের ক্ষতি হয়।

অর্থের লোভে যেন কেউ সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ নিধন না করতে পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখতে হবে।

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় জীবের পরিচিতি

প্রকৃতিতে যে সকল জীব (প্রাণী ও উদ্ভিদ) পূর্বে ছিল কিন্তু বর্তমানে তাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না সে সকল জীবদের বলা হয় **বিলুপ্ত জীব**। বিভিন্ন কারণে সময়ের ব্যবধানে কিছু কিছু প্রজাতি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে এমনকি পৃথিবীর বুক থেকেও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ধরনের বিলুপ্তিকে **নেপথ্য বিলুপ্তি** বলে। হঠাৎ করে পৃথিবীব্যাপী বিপুল সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার ইতিহাস আছে। এ ধরনের বিলুপ্তিকে বলা হয় **গণবিলুপ্তি** (mass extinction)। গণবিলুপ্তি পৃথিবীতে পাঁচ বার ঘটেছে। যে উদ্ভিদ বা প্রাণীকে নির্দিষ্ট প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের বাইরে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না তাকে **এন্ডেমিক উদ্ভিদ বা এন্ডেমিক প্রাণী** বলে। ৪৫০ মিলিয়ন বছর আগে (অর্ডোভিসিয়ান যুগেরও শেষ দিকে) প্রথম গণবিলুপ্তি ঘটে যখন শতকরা ৮৫ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সর্বশেষ গণবিলুপ্তি ঘটেছে প্রায় ৭০-৮০ মিলিয়ন বছর আগে ক্রিটাসিয়াস যুগে যখন শতকরা ৭৬ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর আর কোনো গণবিলুপ্তি ঘটেনি বরং ধীরে ধীরে বিভিন্ন জীব প্রজাতির উন্মেষ ঘটেছে।

জীববৈচিত্র্যের রেকর্ড শুরু হয় কার্যত ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে। এর পূর্বে কোনো দেশেরই জীববৈচিত্র্যের তালিকা তৈরি হয়নি, এখনও পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যাদের জীববৈচিত্র্যের তালিকা করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য সংকটে পড়েছে। তালিকাভুক্ত অনেক প্রজাতি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং বহু প্রজাতি বিলুপ্ত প্রায় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক প্রজাতি আছে যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হলেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলাদেশেও এমন অনেক জীব প্রজাতি আছে যা পূর্বে সচরাচর দেখা গেলেও এখন আর দেখা যায় না।

বাংলাদেশের কতিপয় বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ (বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা শতাধিক)

শ্রেণি	বৈজ্ঞানিক নাম	স্বরূপ	প্রাপ্তিস্থান
ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ	১। *Psilotum triquetrum*	পরাশ্রয়ী	বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা
	২। *Tectaria chattagramica*	স্থলজ	চট্টগ্রাম
নগ্নবীজী উদ্ভিদ	১। *Cycas pectinata*	গুল্ম	চট্টগ্রাম, বাড়িয়াঢালা, গারো পাহাড়
	২। *Podocarpus nerifolia*	বৃক্ষ	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
	৩। *Gnetum funiculare*	লতা গুল্ম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট
আবৃতবীজী উদ্ভিদ	১। *Aldrovanda vesiculosa* (মল্লিকা ঝাঁঝি)	জলজ, পতঙ্গভূক	রাজশাহী, পাবনা
	২। *Aquillaria agallocha* (আগর)	বৃক্ষ	পাথারিয়া বন-মৌলভীবাজার
	৩। *Corypha taliera* (তালিপাম)	তাল জাতীয় বৃক্ষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা
	৪। *Knema bengalensis* (ক্ষুদে বড়লা)	বৃক্ষ	ডুলাহাজরা-কক্সবাজার (এন্ডেমিক)
	৫। *Licuala peltata* (কোরুদ)	তালজাতীয় বৃক্ষ	চট্টগ্রাম, কাসালং-রাঙামাটি, সিলেট
	৬। *Rotala simpliciuscula* (রোট্যালা)	উভচর জাতীয় উদ্ভিদ	চট্টগ্রাম (এন্ডেমিক)
	৭। *Rosa involucrata* (জংলি গোলাপ)	জলজ, গুল্ম	সিলেট এর হাওর

* আগর বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে, তাই আর বিলুপ্তপ্রায় নয় এবং *Chlorophytum repalense* (বীরুৎ) উদ্ভিদটি বর্তমানে বাংলাদেশে আর পাওয়াই যাচ্ছে না। তালিপামটি এখন নাই, এর অনেক চারা বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও দু'টি চারা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। তালিপাম (Tali palm)

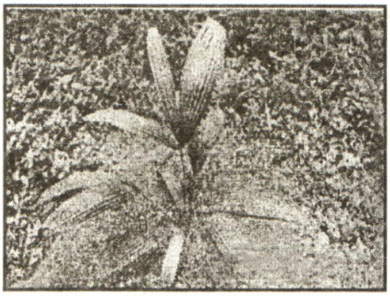

তালিপামের চারা

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের মধ্যে তালিপাম অন্যতম। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Corypha taliera* Roxb. গাছটি দেখতে প্রায় তাল গাছের মতোই, তাই এর বাংলা নাম হলো তালি বা তালিপাম। এটি Arecaceae (Palmae) গোত্রের অন্তর্গত।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনের কাছে অবস্থিত তালিপাম গাছটি ১৯৭৯ সালে কেটে ফেলার পর বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত তালিপাম গাছটিই ছিল বিশ্বের একমাত্র বন্য তালিপাম গাছ। তালিপাম জীবনে মাত্র একবারই ফুল ও ফল উৎপাদন করে এবং পরে তার মৃত্যু ঘটে। ঢাকার গাছটিও ২০১০ সালে ফুল ও ফল উৎপাদন শেষে ২০১২ সালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে মৃত্যুর আগে গাছটি বহু ফল উৎপাদন করে গেছে যা থেকে অসংখ্য চারা করে বন বিভাগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাগানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সামনেও একটি চারা লাগানো হয়েছে।

মঞ্জরীসহ তালিপাম (*Corypha taliera*)

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাঙ্গণের গাছ দু'টি অনেক বড়ো হয়েছে। স্যার এফ রহমান হল প্রাঙ্গণের চারা দু'টিও অনেক বড়ো হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের কোথাও বন্য অবস্থায় আর কোনো তালিপামের খবর জানা নেই। আমাদের লাগানো চারাগুলোর প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া আবশ্যক, যাতে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং ৬০–৭০ বছর পর মৃত্যুর আগে প্রচুর ফল উৎপাদন করে যেতে পারে। বাংলার বাইরে এ গাছ নেই। **এটি বৃহত্তর বাংলার এন্ডেমিক।**

ড. আখতারুজ্জামান চৌধুরী চারা উৎপাদন করে বনবিভাগসহ বিভিন্ন স্থানে এর চারা লাগাতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। এর ফুল-ফল থেকে

ঠেসমূল

শ্বাসমূল (নিউমেটোফোর)

জরায়ুজ অংকুরোদগম

সুন্দরী গাছ (*Heritiera fomes*)

গোলপাতা (*Nipa fruticans*)

তালিপাম (*Corypha taliera*)

মল্লিকা ঝাঁঝি (*Aldrovanda vesiculosa*)

ক্ষুদে বড়লা (*Knema bengalensis*)

কোরুদ (*Licuala peltata*)

রোট্যালা (*Rotala simpliciuscula*)

জংলি গোলাপ (*Rosa involucrata*)

চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ

১৩টি রাসায়নিক যৌগ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন। যার ওপর গবেষণা করে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আমরা ইতোমধ্যেই তালিপামের পুষ্পায়ন, বীজের অঙ্কুরোদগম, কচি ফলের বায়োক্যামিকেল বিশ্লেষণ, ব্যাক্টেরিয়া বিরোধী ক্ষমতা, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা শেষে ফলাফল প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি, যা আগামী ৬০–৭০ বছরে আর সম্ভব হবে না। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসে লাগানো গাছটিতে (১৭ জুন ২০১২ সালে লাগানো) ফুল এসেছে, বীজও হচ্ছে।

২। মল্লিকা ঝাঁঝি (Malacca Jhangi)

মল্লিকা ঝাঁঝি বাংলাদেশের আরেকটি বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Aldrovanda vesiculosa* Linn. এবং গোত্র Droseraceae। মল্লিকা ঝাঁঝি একটি জলজ উদ্ভিদ এবং পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মল্লিকা ঝাঁঝি পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালে রাজশাহীর পটিয়া উপজেলার অন্তর্গত একটি বিল থেকে। পরবর্তীতে চলন বিল (পাবনা) থেকেও একবার সংগ্রহ করা হয়েছিল কিন্তু এর পর আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো জায়গা থেকে মল্লিকা ঝাঁঝি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এটি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে সতর্ক পর্যবেক্ষণে হয়ত কেউ এটি পেয়েও যেতে পারেন। অবশ্য এশিয়া, আফ্রিকা, সেন্ট্রাল ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়াতেও মল্লিকা ঝাঁঝি জন্মে থাকে।

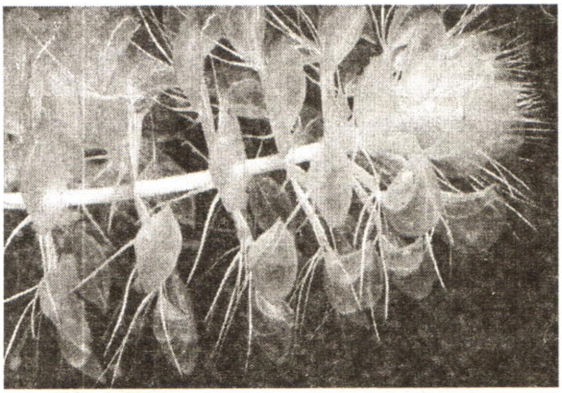

মল্লিকা ঝাঁঝি (*Aldrovanda vesiculosa*)

৩। ক্ষুদে বড়লা (Khude barala)

ক্ষুদে বড়লা বাংলাদেশের একটি **এন্ডেমিক উদ্ভিদ**। বাংলাদেশে এন্ডেমিক অর্থ হলো বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনো দেশে এখনো এটি পাওয়া যায়নি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Knema bengalensis* de Wilde, গোত্র Myristicaceae। এ উদ্ভিদটি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করা হয় ১৯৫৭ সালে কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরা বনাঞ্চল থেকে। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে কক্সবাজার জেলার আপার রিজু বনবিট অফিসের কাছে একটি গাছের সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্ষুদে বড়লা একটি মধ্যম আকারের বৃক্ষ, কাণ্ডে ক্ষত হলে রক্ত বর্ণের কষ বের হতে থাকে। ক্ষুদে বড়লার পুরুষ ও স্ত্রী বৃক্ষ পৃথক। এখনো কোনো স্ত্রী বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় নি। আপার রিজু অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করে এর স্ত্রী বৃক্ষ আবিষ্কার করতে হবে এবং ঐ বৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহ করে চারা করার মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে হবে অথবা টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা করতে হবে। এর সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

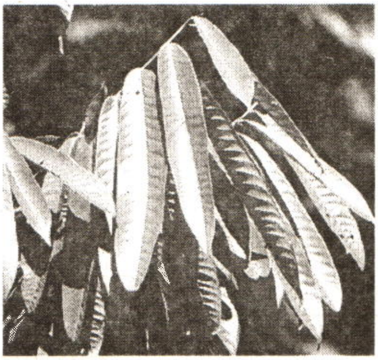

ক্ষুদে বড়লা (*Knema bengalensis*)

৪। কোরুদ (Kurud)

কোরুদ একটি পামজাতীয় উদ্ভিদ যা চট্টগ্রাম, রাঙামাটি (কাসালং) এবং সিলেটের গহীন বনে জন্মে থাকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Licuala peltata* Roxb। গোত্র Arecaceae. এটি ছোটো আকৃতির গাছ, মাত্র ২-৩ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। এর পাতা দিয়ে এক রকম ছাতা তৈরি করা হয়, আবার ঘরের ছাউনিও দেয়া হয়। বাংলাদেশের বাইরে মিয়ানমার এবং ভারতের বিহার, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে এটি দ্রুত কমে যাচ্ছে। এর ইন-সিটু ও এক্স-সিটু উভয় প্রকার সংরক্ষণ অতি জরুরি। বন বিভাগ এ দিকে নজর দিবেন আশা করি।

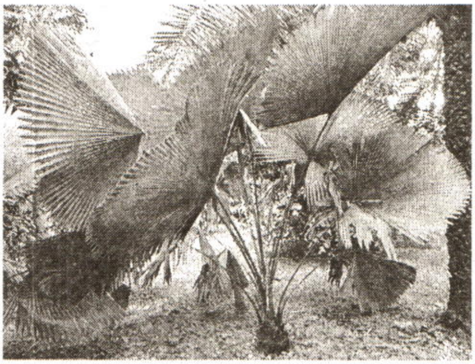

কোরুদ (*Licuala peltata*)

৫। রোট্যালা (Rotala)

রোট্যালা বাংলাদেশের একটি **এন্ডেমিক উদ্ভিদ**। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Rotala simpliciuscula* (S. Kurz) Koehne (1880), গোত্র Lythraceae. বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন হুকার ও থমসন (Hooker and Thomson) এবং সেই নমুনার ওপর ভিত্তি করে S. Kurz এর নামকরণ করেছিলেন *Ammannia simpliciuscula* Kurz (1871)।

রোট্যালা একটি উভচর জাতীয় উদ্ভিদ, জলসিক্ত স্থানে জন্মে থাকে। তবে হুকার ও থমসনের সংগ্রহের পর আর দ্বিতীয় বার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, কাজেই এটি বাংলাদেশ থেকে এমনকি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে অনুমান করা যায়।

আমাদেরকে এ গাছটিকে খুঁজতে হবে এবং পাওয়া গেলে ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোট্যালা (*Rotala simpliciuscula*)

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় (বিপদাপন্ন) কয়েকটি প্রাণী (Endangered Animals)

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণি	প্রাপ্তিস্থান
রাজশকুন	*Sarcogyps calvus*	Aves	রাজশাহী, সিলেট
ঘড়িয়াল	*Gavialis gangeticus*	Reptilia	পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র
মিঠাপানির কুমির	*Crocodylus palustris*	Reptilia	সুন্দরবন
নীলগাই	*Boselaphus tragocamelus*	Mammalia	দিনাজপুর (তেঁতুলিয়া অঞ্চল)
শুশুক	*Platanista gangetica*	Mammalia	পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র
তক্ষক	*Gekko gecko*	Reptilia	প্রায় সর্বত্র
রাজ ধনেশ	*Buceros bicornis*	Aves	সিলেট
উল্লুক	*Hylobates hoolock*	Mammalia	সিলেট
লজ্জাবতী বানর	*Nycticebus coucang*	Mammalia	সিলেট
হাতি	*Elephas maximus*	Mammalia	সিলেট, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি প্রাণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। রাজশকুন (Red-headed vulture)

রাজশকুন বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই একটি বিপন্ন পাখি, বাংলাদেশে এটি মহাবিপন্ন বলে চিহ্নিত। এটি বাংলাদেশের প্রাক্তন আবাসিক পাখি, তবে বর্তমানে আর দেখা যায় না। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর বিস্তৃতি।

রাজশকুনের বৈজ্ঞানিক নাম *Sarcogyps calvus* (Scopoli, 1786); ইংরেজি নাম Red-headed Vulture or King Vulture. এর মাথা লাল, পালক কাল। পুরুষ ও স্ত্রী পাখির চেহারা অভিন্ন। অন্যান্য শকুনের মতো এরা দলবদ্ধ নয়, একা বা জোড়ায় দেখা যায়। খাবারের তালিকায় মৃত পশুর দেহ। উঁচু গাছের ডালে পাতা দিয়ে বাসা বানায় এবং একটি মাত্র ডিম পাড়ে। ৪৫ দিনে ডিম ফোটে। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এটি সংরক্ষিত প্রজাতি।

রাজশকুন (*Sarcogyps calvus*)

২। ঘড়িয়াল (True gavial)

ঘড়িয়াল বাংলাদেশে একটি অতি বিপদাপন্ন সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। ধরে নেয়া হয় বাংলাদেশে এটি প্রায় বিলুপ্ত, যদিও ভারতের উজান থেকে আসা ঘড়িয়াল কদাচিৎ নদীতে দেখা যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis gangeticus* (Gmelin, 1789).

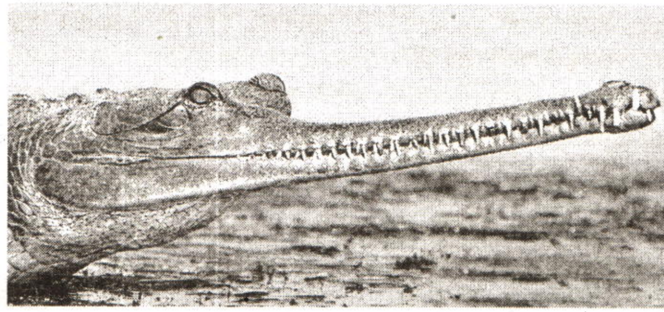

ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*)

ঘড়িয়াল পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক, পুরুষ ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য ৬.৫ মিটার এবং স্ত্রী ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য ৪.৫ মিটার। ঘড়িয়াল গভীর ও দ্রুত প্রবাহমান পানিতে বাস করে। এদের প্রধান খাদ্য মাছ। নভেম্বর-জানুয়ারি এদের প্রজনন মাস। স্ত্রী ঘড়িয়াল বালুতে তৈরি গর্তে ৩০–৫০টি ডিম পাড়ে। ডিম অনেক বড়ো। ৩ মাস তা দেয়ার পর ডিম থেকে বাচ্চা হয়।

এদেরকে ব্রহ্মপুত্র নদে (ভারত ও ভুটান), সিন্ধু নদ (পাকিস্তান), গঙ্গা নদী (ভারত ও নেপাল) এবং মহানদীতে (ভারত) পাওয়া যায়। মিয়ানমার ও পাকিস্তানেও এ প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত।

সাধারণত জেলেদের মাছ ধরার জালে আটকা পড়ে এদের জীবনাবসান ঘটে এবং এটি বিলুপ্তির একটি বড়ো কারণ। এ ব্যাপারে অবশ্যই জেলেদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৩। মিঠাপানির কুমির (Freshwater crocodyle)

মিঠাপানির কুমির বাংলাদেশে বিলুপ্ত, প্রাকৃতিকভাবে আর দেখা যায় না। বাগেরহাটের খান জাহান আলী (র) মাজারের সাথের পুকুরে কয়েকটি কুমির আছে। সম্প্রতি ভারত থেকে সাফারি পার্কে পালনের জন্য কয়েকটি কুমির আনা হয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Crocodylus palustris* (Lesson, 1768)।

মিঠাপানির কুমির (*Crocodylus palustris*)

প্রাপ্তবয়স্ক কুমিরের দেহের দৈর্ঘ্য ৩–৫ মিটার। এরা নদী, পুকুর ইত্যাদি মিঠা পানিতে বাস করে, সাধারণত জোয়ার-ভাটা এলাকায় প্রবেশ করে না। এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। এরা নদীর তীরে গর্তে ডিম পাড়ে, ৫০–৫৫ দিনে ডিম ফোটে। যে কয়টি মিঠাপানির কুমির এখন বাংলাদেশে আছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪। নীলগাই (Nilgai)

নীলগাই বাংলাদেশের আর একটি বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ী প্রাণী। ১৯৪০ সালের দিকে বর্তমান বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া অঞ্চলে নীলগাই পাওয়া যেতো বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে এরা বিলুপ্ত। এরা সমতল ভূমিতে বাস করে। নীলগাই-এর বৈজ্ঞানিক নাম *Boselaphus tragocamelus* (Pallas, 1766)। প্রজনন সময় ছাড়া সাধারণত বছরের অন্যান্য সময় ষাঁড় ও গাভী পৃথকভাবে বিচরণ করে। গাভীর লোম হলুদ-বাদামি, প্রাপ্তবয়স্ক ষাঁড়ের লোম নীল-ধূসর। ৪ সেপ্টেম্বর (২০১৮) ঠাকুরগাঁও এর রানীশংকৈল থেকে স্থানীয়রা একটি গর্ভবতী নীলগাই উদ্ধার করে। বনবিভাগ সেই নীলগাইটিকে রামসাগর জাতীয় উদ্যানে নিয়ে এসেছে। আঘাতপ্রাপ্ত থাকার কারণে গর্ভপাতের পর বাচ্চাটি মারা যায় তবে মা নীলগাইটিকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। এখন এটি

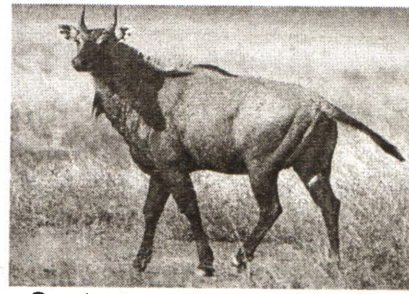

নীলগাই (*Boselaphus tragocamelus*)

রামসাগর জাতীয় উদ্যানেই আছে। এর কিছুদিন পর নওগাঁর মান্দা উপজেলার জোতবাজার এলাকায় একটি পুরুষ নীলগাই ধরা পড়ে। এদেরকে একসাথে রামসাগর জাতীয় উদ্যানে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মা নীলগাইটির মৃত্যু হয়েছে গত ১৭ মার্চ ২০১৯ সালে অপঘাতে। এরই মধ্যে আরেকটি পুরুষ নীলগাই ধরা পড়েছে। ১ আগস্ট ২০২১ শ্রীপুর বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে জন্ম নিয়েছে নীলগাই-এর ২টি শাবক। মেয়ে নীলগাইটি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকষা এলাকা থেকে উদ্ধার করে গত ২১ ফেব্রুয়ারি সাফারি পার্কে দিয়েছিলেন বিজিবি। পরে রামসাগর জাতীয় উদ্যান থেকে পুরুষ নীলগাইটি এনে এখানে রাখা হয়। ধারণা করা হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে বিলুপ্তির হাত থেকে এরা রক্ষা পাবে।

৫। শুশুক (River dolphin)

শুশুক একটি স্তন্যপায়ী জলজ প্রাণী। বাংলাদেশে শুশুক এখন বিপন্ন প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। সাধারণত এরা উপকূল ও সমুদ্রে বিচরণ করে। বর্ষায় বড়ো বড়ো নদী দিয়ে অনেক ভেতরেও চলে আসে। বাংলাদেশে দু'ধরনের শুশুক পাওয়া যায়, একটির বৈজ্ঞানিক নাম *Orcaella brevirostris* এবং অপরটির বৈজ্ঞানিক নাম *Neophocaena phocaenoides*। দ্বিতীয়টির পিঠে পাখনা নেই। এরা মাঝে মাঝে পানি থেকে ওপরে লাফ দেয় এবং দল বেঁধে চলে। মাছ এদের প্রধান খাদ্য। এরা শুশুক মাছ, শিশু বা শিশু মাছ, হউম মাছ, হচ্ছুম মাছ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত।

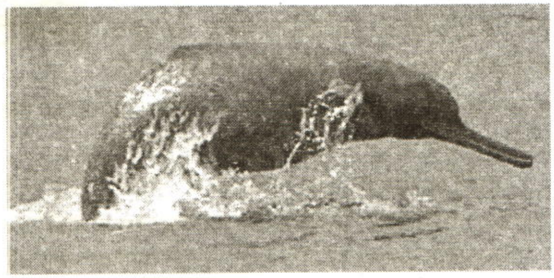

শুশুক *(Orcaella brevirostris)*

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

পৃথিবীতে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজাতির জীব ও অণুজীব রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এ যাবৎ শনাক্ত হয়েছে মাত্র ১৭.৫ লক্ষ প্রজাতির জীব। প্রকৃতিতে প্রত্যেকটি প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। জীববৈচিত্র্য হলো জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন আঙ্গিকের পার্থক্য। Bio অর্থ জীব, diversity অর্থ ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য। কাজেই Biodiversity এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে জীববৈচিত্র্য। T.E. Lovejoy (1980) তাঁর "Changes in Biological Diversity" প্রবন্ধে এবং E. A. Norse and R.E. McManus (1980) তাঁর "Ecology and Living resources–Biological Diversity" প্রবন্ধে প্রথম Biological Diversity শব্দ প্রয়োগ করেন। বিজ্ঞানী Walter G. Rosen (1986) সর্বপ্রথম Biological Diversity এর সংক্ষিপ্তরূপ হিসেবে Biodiversity শব্দটি ব্যবহার করেন। **অধ্যাপক Hamilton এর মতে, পৃথিবীর মাটি, পানি ও বায়ুতে বসবাসকারী সব উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবদের মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও পরিবেশগত (বাস্তুতান্ত্রিক) বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকেই জীববৈচিত্র্য বলে।** UNCED (1992) এর সংজ্ঞানুযায়ী–পৃথিবীর স্থলজ, সামুদ্রিক ও অন্যান্য বাস্তুতন্ত্র এবং এর সম্পর্কিত সকল স্তরের সদস্য হিসেবে বসবাসকারী জীবদের মধ্যে বিদ্যমান সকল ধরনের বৈচিত্র্যই জীববৈচিত্র্য।

বাংলাদেশে ভাস্কুলার উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ২০০১ সালের রেড ডাটা বুক অনুযায়ী ১০৬টি বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশে ৬৫০টি প্রজাতির পাখির মধ্যে ১২টি প্রজাতি বিলুপ্ত আর ৩০টি প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। ৩৪টি উভচর প্রাণীর মধ্যে ৮টি, ১৫৪টি সরীসৃপের মধ্যে ১৪টি প্রায় বিলুপ্তির পথে। যেমন— সুন্দরবন অঞ্চল থেকে বুনোমহিষ, সোয়াম্প হরিণ, হগ হরিণ, গণ্ডার, চিতা বাঘ ও গাউর পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সারাবিশ্বে ১০–৩৭% জীব আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ৫০% শৈবাল ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানে প্রতি বছরে জীব প্রজাতির বিলুপ্তির হার হলো ২৭,০০০ (০.৫%)।

জীব বিলুপ্তির কারণ (Causes of extinction of organism)

বহুবিধ কারণে বিভিন্ন জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরও অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে রয়েছে। জীব বিলুপ্তির প্রধান প্রধান কারণসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

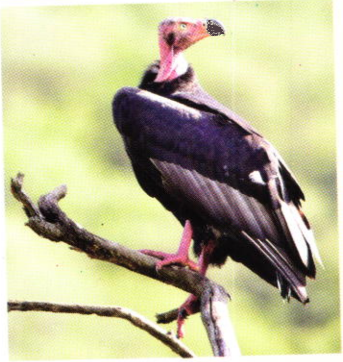

রাজশকুন (*Sarcogyps calvus*)

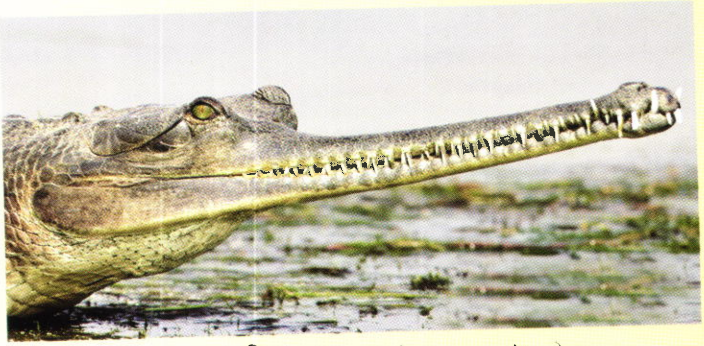

ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*)

মিঠাপানির কুমির (*Crocodylus palustris*)

নীল গাই (*Boselaphus tragocamelus*)

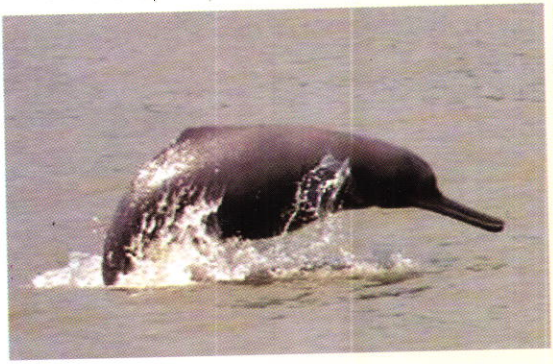

শুশুক (*Orcaella brevirostris*)

রয়েল বেঙ্গল টাইগার (*Panthera tigris*)

লজ্জাবতী বানর (*Nycticebus coucang*)

বন রুই (*Manis crausicauelafa*)

চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী

সুন্দরবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

চরকুকরি মুকড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ভোলা)

চুনাতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (চট্টগ্রাম)

পাবলাখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম)

চিত্র : বাংলাদেশে In situ পদ্ধতিতে জীব সংরক্ষণের কয়েকটি অভয়ারণ্য

মধুপুর জাতীয় উদ্যান (টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ)

নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান (নোয়াখালী)

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান (রাঙ্গামাটি)

রামসাগর জাতীয় উদ্যান (দিনাজপুর)

চিত্র : বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় উদ্যান

RMDAC

(ক) ইকোলজিক্যাল কারণ

১। **কম পপুলেশন ও কম বিস্তৃতি অঞ্চল :** কোনো প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা কম হলে এবং বিস্তৃতি অঞ্চল সংকীর্ণ হলে তার বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

২। **গুচ্ছ বন্টন :** স্থানে স্থানে গুচ্ছবণ্টিত জীব প্রজাতির সহজে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩। **বড়ো দেহ এবং খাদ্যশৃঙ্খলে ওপরে অবস্থান :** খাদ্যশৃঙ্খলে যার অবস্থান যত ওপরে তার বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

৪। **কলোনিকরণের অক্ষমতা :** যেসব প্রজাতি নতুন পরিবেশে বংশবিস্তারের মাধ্যমে কলোনি সৃষ্টি করতে পারে না সে সব প্রজাতি সহজে বিলুপ্ত হয়।

৫। **পরিবেশীয় নিয়ামকের অস্থিরতা :** পরিবেশীয় নিয়ামক (খাদ্য সরবরাহ, আবহাওয়া ইত্যাদি) সমূহের অস্থিরতায় দুর্লভ প্রজাতিগুলো টিকে থাকতে পারে না।

৬। **প্রাকৃতিক বিপর্যয় :** ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, হিমবাহ, ভূমিধস, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে সহজেই দুর্লভ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

(খ) মানব সৃষ্ট কারণ : বর্তমানকালে মানুষের কার্যকলাপই প্রজাতি ধ্বংসের মূল কারণ।

১। **বাসস্থান ধ্বংস :** জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো তাদের বাসস্থান ধ্বংস। বর্তমানে প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ৫০ একর বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। জলাভূমি ভরাট জলজ প্রজাতি বিলুপ্তির প্রধান কারণ।

২। **এক্সপ্লয়টেশন :** সম্পদের অতিমাত্রায় আহরণ বহু জীব প্রজাতি বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩। **অতিমাত্রায় পশুচারণ :** তৃণভূমিতে অতিমাত্রায় পশুচারণের ফলে অনেক প্রজতি বিলুপ্তির পথে।

৪। **পলিনেটর ধ্বংস :** মৌমাছিসহ বহু কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে। অতিমাত্রায় কীটনাশক, পতঙ্গনাশক ব্যবহারের ফলে পরাগায়নের এ বাহকগুলো কমে গিয়েছে, ফলে পরাগায়নের অভাবে প্রজাতি বিলুপ্তির পথে রয়েছে।

৫। **পরিবেশ দূষণ :** পরিবেশ দূষণ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির একটি বড়ো কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Importance of conserving endangered species)

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রথম নীতিমালা হলো **"জীবের প্রতিটি ধরনই অনন্য এবং সমাজ বা মানবতার কাছ থেকে ন্যায্যতার দাবিদার।"** এ নীতিমালার আলোকে কেবল বিলুপ্তপ্রায় জীব নয়, সকল জীব প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। প্রতিটি জীব তার পরিবেশের একটি উপাদান এবং এর সাথে পরিবেশের অন্যান্য নিয়ামকের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেবল একটি জীব প্রজাতি নয়, একটি জীব প্রজাতির কোনো একটি ইনডিভিজুয়েলের বিলুপ্তিও পরিবেশের ওপর কিঞ্চিৎ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এ প্রতিক্রিয়া সম্মিলিতভাবে একদিন পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। কাজেই সঠিকভাবে সকল প্রজাতির জীবকে সংরক্ষণ করতে হবে।

আমাদের অসচেতনতার কারণে ইতোমধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে আছে হাজার হাজার প্রজাতি। এখনই সংরক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে এগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যে জীব প্রজাতিগুলো সহসা বিপদাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই সেগুলোও সংরক্ষণের তালিকায় রাখতে হবে, তবে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রতি। পৃথিবীর বুক থেকে একবার বিলুপ্ত হয়ে গেলে আর তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। এখনো সকল জীব প্রজাতির উপকারী দিক আমাদের জানা সম্ভব হয়নি, হয়তো দেখা যাবে আজকের এ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিটি হতেই ভবিষ্যতে আমার কোনো বংশধরের জীবন রক্ষাকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হবে। বিলুপ্তপ্রায় কোনো জীব প্রজাতির মধ্যে এমন একটি 'জিন' থাকতে পারে যাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বহুদূর এগিয়ে যেতে পারবে; ঘটাতে পারবে কৃষি বিপ্লব বা শিল্প বিপ্লব। কাজেই আমরা পৃথিবীর বুক থেকে একটি জীব প্রজাতিও আর হারিয়ে যেতে দেবো না।

মনে রাখতে হবে এমনিতেই কোনো জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে এগোয়নি। এর পেছনে বহু যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। প্রথমেই ঐ কারণগুলো জানতে হবে। প্রতিটি জীবের নিজস্ব পরিবেশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ঐ রকম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এরূপ প্রতিটি জীবের বংশবিস্তার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে হবে। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা যায় কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সব রকম অসুবিধা দূর করে এবং সব রকম সুবিধা প্রদান করে আমরা বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতিগুলোকে পৃথিবীর বুকে কেবল টিকিয়েই রাখবো না, এদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করবো।

সামগ্রিকভাবে বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে নিম্নলিখিত বিষয় অনুযায়ী দেখা যায়।

(১) কৃষিজজীব ও তাদের বন্যআত্মীয় সংরক্ষণ, (২) ভেষজউদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ, (৩) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, (৪) ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ, (৫) অগ্রসরমান অর্থনীতি সংরক্ষণ, (৬) নান্দনিকতা সংরক্ষণ এবং (৭) প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার অধিকার সংরক্ষণ।

কাজ : বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি চার্ট তৈরি করো।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Biodiversity conservation)

বিশ্বকে মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে এসেছে, শুরু হয়েছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজ। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোই **হটস্পট** নামে পরিচিত।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তথা কনজারভেশন বলতে বোঝায় বর্তমান জীবকুলের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিমিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, যাতে করে একদিকে বর্তমান প্রজন্ম তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারবে এবং অপরদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন এমনিভাবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা সমুন্নত থাকবে।

অন্যভাবে বলা যায়, কনজারভেশন হলো মানুষ কর্তৃক জীবমণ্ডলের ব্যবহার সংক্রান্ত এমন ব্যবস্থাপনা যাতে করে জীবমণ্ডল বর্তমান প্রজন্মের জন্য সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় সুফল প্রদান করতে পারে অথচ একই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের সকল প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনাও সমভাবে অক্ষুণ্ন থাকে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (preservation), রক্ষণাবেক্ষণ (maintenance), সহনীয় মাত্রায় প্রয়োগ (sustainable utilization), পুনরুদ্ধার (restoration) এবং ব্যবহারের (using biodiversity) মাধ্যমে গঠিত সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন বা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলে।

বাংলাদেশের সংরক্ষিত অঞ্চল (Protected Areas of Bangladesh) : সরকারি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে (চ্যাপ্টার iv এর ১৩, ১৭, ১৮, ১৯ ধারা অনুযায়ী) সংরক্ষিত অঞ্চল (বনাঞ্চল) ঘোষণা করা হয়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। সব অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ট্রাডিশনাল হেরিটেজ অঞ্চল 'সংরক্ষিত অঞ্চলের' অন্তর্ভুক্ত।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রধানত দু'প্রকার; যথা- (ক) ইন-সিটু সংরক্ষণ এবং (খ) এক্স-সিটু সংরক্ষণ ।

(ক) প্রাকৃতিক বাসস্থানে সংরক্ষণ বা ইন-সিটু সংরক্ষণ (In-situ conservation) : মূল বাসস্থানে তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের বিবর্তনীয় গতিশীল ইকোসিস্টেমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করাকে বলা হয় ইন-সিটু সংরক্ষণ।

সুন্দরবনের কর্দমাক্ত, লবণাক্ত ও সিক্ত পরিবেশে সুন্দরী গাছ জন্মে থাকে। কাজেই সুন্দরী গাছকে সুন্দরবনের মূল বাসস্থান তথা ঐ পরিবেশতন্ত্রে সংরক্ষণ করাই হলো ইন-সিটু সংরক্ষণ বা স্বস্থানে সংরক্ষণ এর একটি উদাহরণ।

ইন-সিটু সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ

(i) কোনো প্রজাতি সংরক্ষণের সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো যে বাসস্থানে ইহা প্রাকৃতিকভাবে জন্মে সেই বাসস্থানকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। এর ফলে উক্ত প্রজাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাণিকুলও সংরক্ষিত হয়।

(ii) অনেক উদ্ভিদ তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে তাদের মাইকোরাইজাল ছত্রাকের ওপর নির্ভরশীল। ইন-সিটু সংরক্ষণের ফলে মাইকোরাইজাল ছত্রাকও সংরক্ষিত হয় এবং ঐ উদ্ভিদের টিকে থাকা নিশ্চিত হয়।

(iii) একটি প্রজাতি বা একটি উদ্ভিদ কেবলমাত্র একটি ইকোসিস্টেমের অংশই নয়, ইহা বিভিন্নভাবে আশপাশের অন্যান্য প্রজাতির সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে এবং অনেক প্রজাতিকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। ইন-সিটু সংরক্ষণে এ সুবিধা থাকে।

(iv) কোনো প্রজাতিকে তার বাসস্থানে সংরক্ষণের সবচেয়ে উপকারী দিক হলো এই যে, এতে করে বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াগুলো চালু থাকে।

(v) যে দেশ বা অঞ্চলে ফ্লোরা এখনো ভালোভাবে তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি অথবা বিশদভাবে স্টাডি করা সম্ভব হয়নি সে দেশ বা সে অঞ্চলে ইন-সিটু সংরক্ষণ আবশ্যক। অনেক দেশেই সংকটাপন্ন প্রজাতির (endangered species) তালিকা প্রস্তুত সম্পন্ন হয়নি, সেসব দেশে এক্স-সিটু অবস্থানে কোন কোন প্রজাতি সংরক্ষণ করতে হবে তাও সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়নি। কাজেই ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ করা তথা ইন-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতিই সেখানে আদর্শ সংরক্ষণ পদ্ধতি।

(vi) যে অঞ্চলে এখনো অনেক প্রজাতি অনাবিষ্কৃত রয়েছে সে অঞ্চলেও ইন-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতি আবশ্যক।

(vii) রিক্যালসিট্র্যান্ট (recalcitrant) বীজ সংরক্ষণের জন্য ইন-সিটু পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী।

ইন-সিটু সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যমগুলো নিম্নরূপ :

১। ন্যাশনাল পার্ক (National Park) বা জাতীয় উদ্যান : ন্যাশনাল পার্ক বলতে বোঝায় প্রাকৃতিকভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনামূলকভাবে বৃহৎ অঞ্চল যেখানে বন্যজীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) সুরক্ষিত থাকবে। গবেষণা ও বিনোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশ করা যায়। বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ন্যাশনাল পার্ক হলো—

বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ন্যাশনাল পার্ক (জাতীয় উদ্যান)

সংরক্ষিত এলাকার নাম		অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১। ভাওয়াল	ন্যাশনাল পার্ক	গাজীপুর	৫০২২	১৯৮২
২। মধুপুর	"	টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ	৮৪৩৬	১৯৮২
৩। রামসাগর (সবচেয়ে ছোটো)	"	দিনাজপুর	২৭.৭৫	২০০১
৪। হিমছড়ি (সর্বপ্রথম)	"	কক্সবাজার	১৭২৯	১৯৮০
৫। লাউয়াছড়া	"	মৌলভীবাজার	১২৫০	১৯৯৬
৬। কাপ্তাই	"	রাঙ্গামাটি	৫৪৬৪	১৯৯৯
৭। নিঝুমদ্বীপ (সবচেয়ে বড়ো)	"	নোয়াখালী	১৬৩৫২	২০০১
৮। মেধাকচ্ছপিয়া	"	কক্সবাজার	৩৯৫	২০০৮
৯। সাতছড়ি	"	হবিগঞ্জ	২৪২	২০০৪
১০। খাদিমনগর	"	সিলেট	৬৭৮	২০০৬
১১। বাড়ইডালা	"	চট্টগ্রাম	২৯৩৩	২০১০
১২। নবাবগঞ্জ	"	দিনাজপুর	৫১৭	২০১০
১৩। সিংড়া	"	দিনাজপুর	৩০৫	২০১০
১৪। কাদিগড়	"	ময়মনসিংহ	৩৪৪	২০১০
১৫। আলতাদিঘি	"	নওগাঁ	২৬৪	২০১১
১৬। বীরগঞ্জ	"	দিনাজপুর	১৬৮	২০১১

২। ইকোপার্ক (Ecopark) : ইকোলজিক্যাল পার্ক-এর সংক্ষিপ্তরূপ ইকোপার্ক। প্রাকৃতিক পরিবেশকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখে এবং সেখানকার জীববৈচিত্র্যের কোনো প্রকার ক্ষতি না করে চিত্তবিনোদনের সব ব্যবস্থা করা হয় ইকোপার্কে।

[MAT:22-23]

সাধারণত প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত বনাঞ্চলের অংশবিশেষকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এনে ইকোপার্ক তৈরি করা হয়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফ্লোরাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইকোপার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

(i) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (ii) বিলুপ্ত ও দুর্লভ উদ্ভিদ সংরক্ষণ, (iii) বিরাজমান জীববৈচিত্র্য ও তাদের বাসস্থান সংরক্ষণ, (iv) বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের ব্রিডিং ও উন্নয়ন, (v) পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামো নির্মাণ, (vi) স্থানীয় বাসিন্দাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং (vii) শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইকোপার্ক

(a) **সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক :** সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম। ঐতিহাসিক চন্দ্রনাথ পাহাড় ও মন্দিরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আয়তন ১৯৯৬ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৯। প্রাকৃতিকভাবে *Cycas* এখানে জন্মে থাকে। প্রায় ১৫৪ প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে পাওয়া যায়।

(b) **মধুটিলা ইকোপার্ক :** নালিতাবাড়ি উপজেলা, শেরপুর। বাংলাদেশ-ভারতের বর্ডার সংলগ্ন গারো পাহাড়ের পাদদেশে এটি অবস্থিত। আয়তন ৩৮০ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৯। ঘন বন, পাহাড়, ঝর্ণা, লেক এবং বহু টিলা নিয়ে এ পার্ক গঠিত।

(c) **মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক :** বড়লেখা উপজেলা, মৌলভীবাজার এবং পাথারিয়া হিল-রিজার্ভ ফরেস্টের অংশবিশেষ নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত। আয়তন ৫০০ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০১ সাল। দৃষ্টিনন্দন মাধবছড়া ঝর্ণা এখানে অবস্থিত। দুর্লভ দোলিচাঁপা বৃক্ষ এখানে দেখা যায়।

(d) **বাঁশখালি ইকোপার্ক :** বাঁশখালি উপজেলা, চট্টগ্রাম। জলদি অভয়ারণ্য রেঞ্জের বামের ছড়া ও ডানের ছড়া এলাকা নিয়ে এ ইকোপার্ক গঠিত। আয়তন প্রায় ৩০০০ একর। এ পার্বত্য এলাকায় বহু দৃষ্টিনন্দন কাঠামো (লেক, ঝুলন্ত সেতু) এবং হাতি, ভাল্লুক, হরিণ, অজগর দেখা যায়। প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৩ সাল।

(e) **কুয়াকাটা ইকোপার্ক :** পটুয়াখালির কলাপাড়া উপজেলা এবং বরগুনার আমতলি উপজেলার অংশ নিয়ে কুয়াকাটা ইকোপার্ক গঠিত। প্রায় ১৩ হাজার একর আয়তনের এ বিশাল ইকোপার্ক ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুয়াকাটা সাগর সৈকত এবং ম্যানগ্রোভ বন এ ইকোপার্কের অন্তর্ভুক্ত। পর্যটকদের জন্য সুব্যবস্থা আছে।

(f) **টিলাগড় ইকোপার্ক :** সিলেট কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের কাছে রিজার্ভ ফরেস্টের অংশবিশেষ নিয়ে টিলাগড় ইকোপার্ক গঠিত। অয়তন ১১২ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৬ সাল।

(g) **জাফলং ইকোপার্ক :** সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার কৌলাখাল রিজার্ভ ফরেস্টের অংশবিশেষ নিয়ে এ ইকোপার্ক গঠিত। সিলেট-তামাবিল হাইওয়ের দু'পাশে স্ট্রিপ গার্ডেন (strip gardens) করে দেয়া হয়েছে।

(h) **বঙ্গবন্ধু যমুনা ইকোপার্ক :** বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর পশ্চিম পাশে এটি বনবিভাগ কর্তৃক সৃজন করা ইকোপার্ক। আয়তন ১২৪ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৭ সাল।

(i) **বর্শিজোড়া ইকোপার্ক :** মৌলভীবাজার শহরের কাছে রিজার্ভ ফরেস্টের ৮৮৭ একর জায়গা নিয়ে ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ ইকোপার্ক। এখানে অবজার্ভেশন টাওয়ার, ইকো-কটেজ, পিকনিক স্পট এবং প্রচুর টিম্বার ও ভেষজ উদ্ভিদ আছে।

৩। সাফারি পার্ক (Safari Park) : সাফারি পার্ক এক ধরনের সংরক্ষিত বনভূমি যেখানে বন্য প্রাণীরা (হিংস্র প্রাণীসহ) ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত থাকে, মুক্তাবস্থায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং দর্শনার্থীগণ বিশেষ বাহনে অবরুদ্ধ থেকে তাদের গতিপ্রকৃতি অবলোকন করে আনন্দ লাভ করে সে পার্ক হলো সাফারি পার্ক। সাফারি পার্কে দেশের নিজস্ব এবং বিদেশ থেকে আনা বন্যপ্রাণী প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। প্রাণীরা এখানে মুক্তভাবে ব্রিডিং করতে পারে। সাফারি পার্কের উদ্দেশ্য হলো : (i) **ইকোট্যুরিজম**, (ii) **বিনোদন**, (iii) **কনজার্ভেশন এবং গবেষণা**, (iv) **জনগণের মধ্যে সংরক্ষণ সচেতনতা সৃষ্টি**। বাংলাদেশে দুটি সাফারি পার্ক আছে। যথা–

(i) **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ডুলাহাজরা**। এটি ডুলাহাজরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক নামেও পরিচিত। এর আয়তন প্রায় ২২২৪ একর। উপজেলা চকোরিয়া, জেলা কক্সবাজার। প্রতিষ্ঠা ১৯৯৯ সাল।

এখানে ১৬৫ প্রজাতির প্রায় ৪০০০ প্রাণী আছে। উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে গর্জন, বৈলাম, তেলসুর প্রধান। প্রাণীর মধ্যে অধিক সংখ্যায় হাতি আছে, আরো আছে সিংহ, ভালুক, গয়াল, কুমির, হরিণ ইত্যাদি।

(ii) **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুর।** এটি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা অঞ্চলে অবস্থিত। আয়তন ৪৯০৯ একর বনভূমি। ২০১১ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৩ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এটি থাইল্যান্ডের সাফারিওয়ার্ল্ড-এর মডেলে তৈরি করা হয়েছে। প্রধান উদ্ভিদ শাল। বন্যপ্রাণী-বাঘ, সিংহ, হাতি, সাম্বার, হরিণ, বানর, হনুমান, ভালুক, গয়াল, কুমির এবং বিভিন্ন পাখি।

৪। বন্যজীব অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary) : এমন প্রাকৃতিক অঞ্চল যেখানে মাটি, পানি, উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব সুরক্ষার জন্য অক্ষত রাখা হবে যাতে করে সব ধরনের জীব মুক্তভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে। বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বন্যজীব অভয়ারণ্য হলো—

উল্লেখযোগ্য বন্যজীব অভয়ারণ্য

সংরক্ষিত এলাকার নাম	স্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১। রেমাকেলেঙ্গা অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১৭৯৫	১৯৯৬
২। চর কুকড়ি-মুকড়ি (সবচেয়ে ছোটো) "	ভোলা (প্রথম)	৪০	১৯৮১
৩। সুন্দরবন (পূর্ব) "	বাগেরহাট	৩১২২৬	১৯৯৬
৪। সুন্দরবন (পশ্চিম) (সবচেয়ে বড়ো) "	সাতক্ষীরা	৭১৫০২	১৯৯৬
৫। সুন্দরবন (দক্ষিণ) "	খুলনা	৩৬৯৭০	১৯৯৬
৬। পাবলাখালী "	রাঙ্গামাটি	৪২০৮৭	১৯৮৩
৭। চুনতি "	চট্টগ্রাম	৭৭৬৩	১৯৮৬
৮। ফাশিয়াখালী "	কক্সবাজার	১৩০২	২০০৭
৯। দুপপুকুরিয়া-ধুপাছড়ি "	চট্টগ্রাম	৪৭১৬	২০১০
১০। হাজারিখিল "	চট্টগ্রাম	২৩৩১	২০১০
১১। টেকনাফ (এটি পূর্বে গেমরিজার্ভ ছিল) "	কক্সবাজার	১১৬১৫	২০১০
১২। সাঙ্গু "	বান্দরবান	২৩৩১	২০১০
১৩। টেংগ্রাগিরি "	বরগুনা	৪০৪৮	২০১০
১৪। দুধমুখী "	বাগেরহাট	৫৬০	২০১২
১৫। ধাংগমারি "	বাগেরহাট	৩৪০	২০১২
১৬। সোনারচর "	পটুয়াখালী	২০২৬	২০১১
১৭। নাজিগঞ্জ (ডলফিন) "	পাবনা	১৪৬	২০১৩
১৮। পদ্মা সেতু অভয়ারণ্য। এটি সৃজিত। সেতুর দক্ষিণ পাড়ে সৃজন করা হয়েছে।			

৫। গেম রিজার্ভ : এমন প্রাকৃতিক অঞ্চল যেখানে বন্যজীব সুরক্ষিত থাকবে, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে শিকার করা যাবে। বাংলাদেশের একমাত্র **গেম রিজার্ভটি ছিল কক্সবাজার জেলার নাফ নদীর তীরে অবস্থিত টেকনাফ গেম রিজার্ভ।** বর্তমানে এটি বন্যজীব অভয়ারণ্য।

৬। বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) : ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন এলাকা বা স্থাপনাকে বিশ্বসম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবনের তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এবং বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবনকে ১৯৯৯ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট ঘোষণা করে।

৭। **মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Sanctuary) :** অভয়ারণ্যে বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষিত হয়। তাই মাছের জন্য পৃথক অভয়াশ্রমের প্রয়োজন দেখা দেয়, বিশেষ করে দেশি মাছের জন্য। এ ধরনের অভয়াশ্রম হলো বৃহত্তর সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওর এবং চট্টগ্রামের মাছ প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদী।

টাঙ্গুয়ার হাওর (Tanguar Haor) : বাংলাদেশের একটি প্রখ্যাত **ওয়েটল্যান্ড** হলো টাঙ্গুয়ার হাওর। এটি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা ও তাহিরপুর উপজেলায় অবস্থিত। ৫১টি জলমহাল নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওর গঠিত। স্থানীয়ভাবে এটি **'ছয় কুড়ি বিল নয় কুড়ি কান্দা'** নামে পরিচিত। আয়তন প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার। টাঙ্গুয়ার হাওরকে ১৯৯৯ সালে ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং ২০০০ সালে একে **Ramsar site** ঘোষণা করা হয়।

এ হাওরে প্রায় ১৩৫টি প্রজাতির মাছ, ১১টি প্রজাতির উভচর, ৩৫টি প্রজাতির সরীসৃপ এবং ২০৮ প্রজাতির পাখি যার ৯২টি প্রজাতি জলচর পাখি এবং ৯৮টি প্রজাতির যাযাবর (migratory) পাখি বাস করে। টাঙ্গুয়ার হাওর মাছের এক বিশাল ভাণ্ডার এবং আমাদের দেশের মিঠাপানির (স্বাদুপানির) মাছের বংশবৃদ্ধির উন্মুক্ত স্থান। এগুলোর মধ্যে ১০টি প্রজাতি ২০০৩ সালে IUCN এর Red Data Book-এ তালিকাভুক্ত হয়েছে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে। টাঙ্গুয়ার হাওরকে বলা হয় **বিনামূল্যের সম্পদ ভাণ্ডার**। এখানকার উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ প্রজাতি হলো হিজল, করচ, বরুন ইত্যাদি।

Ramsar Site : রামসার ইরানের একটা শহরের নাম। এখানে জলজ বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এ সভায় যোগদান করেন। জলজ বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য টাঙ্গুয়ার হাওরকে এ সভায় চিহ্নিত করা হয়। তাই এ হাওরটিকে ইরানের রামসার শহরের নাম অনুসারে বলা হয় "Ramsar site"।

হাকালুকি হাওর (Hakaluki Haor) : আয়তনের দিক থেকে হাকালুকি হাওর বিশ্বের সর্ববৃহৎ। এর আয়তন ১৮১.১৫ বর্গকিলোমিটার। মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার পাঁচটি উপজেলায় (কুলাউড়া, জুরি, বড়লেখা, গোলাপগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ) এর বিস্তৃতি। ১৯৯৫ সাল হতেই এটি ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া এবং রামসার সাইট হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ হাওরে আছে বহু প্রজাতির দেশি মাছ ও অন্যান্য প্রাণী, আর আছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি। শাপলা, পদ্মসহ বহু প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ এখানে জন্মে থাকে।

হালদা নদী (Halda River) : হালদা নদী বাংলাদেশের অধিকাংশ কার্প জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিগনি) মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। এটি **খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের হালদাছড়া** থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এটি **ফটিকছড়ির রাউজান, হাটহাজারীর কালুরঘাট ও চাঁদগাঁও-এর ওপর দিয়ে** প্রবাহিত হয়ে পরিশেষে **কর্ণফুলী নদীতে** পড়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৮ কিলোমিটার। এ নদীতে সময়মতো ও সঠিক মতো

চিত্র ১২.২২ : হালদা নদীতে জেলেদের ডিম ধরার দৃশ্য

ডিমপাড়ার ওপর আমাদের মাছের চাহিদা পূরণের অনেকটাই নির্ভর করে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। বলা হয়ে থাকে এটি দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র। সাধারণত

এপ্রিলের শেষ বা মে মাসের প্রথম দিকে এখানে মা-মাছেরা ডিম পাড়ে এবং জেলেরা তা সংগ্রহ করে। নদী দূষণের কারণে ডিমের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। এ প্রজননক্ষেত্র অবশ্যই দূষণ মুক্ত রাখতে হবে। ২০২০ সালে সর্বোচ্চ পরিমাণ ডিম আহরিত হয়েছে। ২০২৩ সালের জুন মাসে মা-মাছেরা পর্যাপ্ত ডিম ছেড়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে হালদা নদীকে **"বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ"** ঘোষণা করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে হালদা নদীর দখল-দূষণ কমবে। পরবর্তীতে CCTV ক্যামেরাও লাগানো হয়েছে।

বর্ষা মৌসুমে নদীর কিছু পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের জন্য এখানে মা-মাছ ডিম ছাড়তে আসে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক।

অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় বজ্রপাতসহ প্রচুর বৃষ্টি, উজানের পাহাড়ি ঢল, তীব্র স্রোত, ফেনিল ঘোলা পানিসহ নদীর ভৌত-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বিত ক্রিয়ায় হালদা নদীতে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে রুইজাতীয় মাছ বর্ষাকালে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। এ পরিবেশ বাংলাদেশের অন্যান্য নদ-নদী থেকে স্বতন্ত্র। তাই হালদা নদী বাংলাদেশের **প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ঐতিহ্য**। হালদা নদী কেবল প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ঐতিহ্য নয়–এটি ইউনেস্কোর শর্তানুযায়ী **বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যেরও** যোগ্যতা রাখে।

(খ) কৃত্রিম বাসস্থানে সংরক্ষণ বা এক্স-সিটু সংরক্ষণ (Ex-situ conservation) : বায়োডাইভারসিটির উপাদানসমূহকে তাদের মূল বাসস্থান বা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে বাঁচিয়ে রাখাই হলো **এক্স-সিটু সংরক্ষণ**। সিলেট বনের আগর গাছকে বা সুন্দরবনের সুন্দরী গাছকে ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাগিয়ে সংরক্ষণ করা হলো এক্স-সিটু সংরক্ষণ এর একটি উদাহরণ। নিম্নলিখিত উপায়ে এক্স-সিটু সংরক্ষণ করা হয়।

১। **উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেন (Botanical garden) :** সারা বিশ্বে প্রায় ২,০০০ বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। বোটানিক গার্ডেনে সাধারণত দুর্লভ প্রজাতি, অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি এবং ট্যাক্সোনমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। বিশ্বের মোট পুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতির প্রায় চার ভাগের এক ভাগ প্রজাতির উদ্ভিদ লাগানো আছে বোটানিক গার্ডেনগুলোতে। কাজেই বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ভিদ প্রজাতিকে সংরক্ষণের একটি বড়ো উপায় হলো বোটানিক গার্ডেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক গার্ডেনে এমন কিছু প্রজাতি সংরক্ষিত আছে যা বাংলাদেশের আর কোথাও নেই।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাজ নিম্নরূপ :

(i) পাবলিক সার্ভিস (সামাজিক, কালচারাল, অর্থনৈতিক, বিনোদনমূলক, বিশেষ কাজ) যেমন—ফ্লাওয়ার শো,

(ii) শিক্ষা, (iii) কনজার্ভেশন, (iv) গবেষণা, (v) হার্বেরিয়াম এবং প্রকাশনা—

পৃথিবীর প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন ছিল থিওফ্রাস্টাস-এর স্কুল (লাইসিয়াম = Lyceum) সংলগ্ন গার্ডেন। তারপর উল্লেখযোগ্য বোটানিক্যাল গার্ডেন হলো ইতালির Lucaghini (১৪৯০–১৫৫৬) নামক উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গার্ডেন। পরবর্তীকালে বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে ইতালির Padua বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গার্ডেন (১৫৪৫) উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেন যা ১৯৪০ দশকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

এ গার্ডেনে অনেক দুর্লভ উদ্ভিদ আছে। দেশের বৃহত্তম বোটানিক্যাল গার্ডেন হলো **ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন,** মিরপুর, ঢাকা। এটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ৮৪.২ হেক্টর জায়গার এক বিশাল গার্ডেন। এ গার্ডেনে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, অর্কিড মিলে প্রায় ৫৭,০০০ উদ্ভিদ নমুনা আছে। এ গার্ডেনে কোনো হার্বেরিয়াম নেই, তবে এর এক কোণে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম অবস্থিত।

বিনোদন বা শখের বাগান বোটানিক্যাল গার্ডেন নয়। বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে সৃজন করা গার্ডেনই বোটানিক্যাল গার্ডেন।

ঈশ্চরচন্দ্র গুপ্ত ব্যবসার জন্য "চৈতন্য নার্সারি" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৯৪ সালে জামালপুরে। বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ১৯০৯ সালে ঢাকার ওয়ারীতে একটি শখের বাগান **বলধা গার্ডেন** তৈরি করেন। বহু বিদেশি দুর্লভ উদ্ভিদ

সমৃদ্ধ হয়ে এটি এখনো টিকে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বনবিভাগ এ বাগানকে বোটানিক্যাল গার্ডেন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

২। বীজ ব্যাংক (Seed bank) : সীড ব্যাংকের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ একটি সহজতর উপায়, কারণ সীড ব্যাংকে অল্প জায়গায় অল্প পরিশ্রমে ও অল্প খরচে অধিক প্রজাতি ধরে রাখা যায়। সীড ব্যাংকে এমন অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির বীজ সংরক্ষিত আছে যা বাস্তবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। *Bronus interruptus* (Kackel) Druce এবং *Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla এমন দুটি প্রজাতি যারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সীড ব্যাংকে এদের বীজ সংরক্ষিত আছে।

বীজকে শুকিয়ে –20°C তাপমাত্রায় ফ্রিজিং করলে প্রায় অধিকাংশ উদ্ভিদ প্রজাতির বীজকেই (orthodex seed) শতাব্দীর পর শতাব্দী অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসহ সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এ ধরনের বীজ মোট সবীজী উদ্ভিদের প্রায় ৭০ ভাগ। অন্য ৩০ ভাগ বীজ recalcitrant বীজ হিসেবে পরিচিত। যেসব বীজকে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তা হলো রিক্যালসিট্র্যান্ট বীজ, যেমন— আম, কাঁঠাল।

৩। ফিল্ড জিন ব্যাংক (Field gene bank) : ফিল্ড জিন ব্যাংকের মাধ্যমে রিক্যালসিট্র্যান্ট বীজবাহী উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা সম্ভব। কোনো প্রজাতির স্বাভাবিক এলাকার বাইরে অন্য কোনো স্থানে এসব প্রজাতির জীবন্ত নমুনা সংরক্ষণ করা হয়। ক্লপ প্রজাতির জন্য এ প্রক্রিয়া উত্তম। কাসাভার জন্য কলম্বিয়াতে ফিল্ড জিন ব্যাংক আছে। বাংলাদেশের হর্টিকালচার সেন্টারগুলোতে আম, লিচু ও নারিকেলের ফিল্ড জিন ব্যাংক রয়েছে।

৪। জিন ব্যাংক (Gene bank) : উদ্ভিদের জিন তত্ত্বের সম্পদগুলোকে সংরক্ষণে এবং পৃথিবীর বিশাল শস্য প্রকরণ (variety) এবং তাদের বন্য প্রজাতিগুলো সংরক্ষণের ও উৎপাদনে জিন ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনাগুলোকে সময়ে সময়ে জন্মানো হয় এবং এ থেকে নতুন বীজ উৎপন্ন করে সংরক্ষণ করা হয়।

৫। চিড়িয়াখানা (Zoo) : চিড়িয়াখানা এমন এক ধরনের স্থাপনা (এলাকা) যেখানে জীবন্ত বন্য প্রাণীসমূহ খাচায় বন্দী করে রেখে সেখানে বিনোদন, গবেষণা ও প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এটা জাতীয় পর্যায়ে এক বৃহৎ পরিসরে আবার ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে ওঠে। উদাহরণ-মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা।

৬। নিম্নতাপমাত্রায় সংরক্ষণ (Low temperature conservation) : অঙ্গজ বংশবিস্তারে সক্ষম এমন অনেক ফসলের অঙ্গজ অংশ (যেমন-রাইজোম, বাল্ব, টিউবার, করম) সাধারণত অল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায়, যদি না এদেরকে উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। ৯০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা ৪°–৫° সে. তাপমাত্রায় গোল আলুকে ৫–৭ মাস হিমাগারে সংরক্ষণ করা যায়। আবার ১৪° সে. তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতায় মিষ্টি আলু কয়েক মাস সংরক্ষণ করা যায়। তবে এভাবে বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না। [MAT:20-21]

৭। ইন-ভিট্রো সংরক্ষণ (In-vitro conservation) : ইন-ভিট্রো উপায়ে ল্যাবরেটরিতে রিক্যালসিট্র্যান্ট প্রজাতির ক্যালাস (callus) টিস্যু সংরক্ষণ করা যায় বা তরল আবাদ মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যায়। অতি নিম্নতাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে Cryogenic পদ্ধতিতেও (–১৯৬° সেন্টিগ্রেড) এদেরকে সংরক্ষণ করা যায়, তবে এতে সময়, খরচ ও অধিক সতর্কতার দরকার হয়।

৮। ডিএনএ সংরক্ষণ (DNA conservation) : উদ্ভিদ থেকে DNA আহরণ করে তা সংরক্ষণ করা হয়। DNA সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও কাঙ্ক্ষিত জিন সংরক্ষণ করা যায় কিন্তু এখনো সংরক্ষিত DNA থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবিত হয়নি।

৯। পরাগরেণু সংরক্ষণ (Pollen grain conservation) : পরাগরেণুকে নিম্নতাপমাত্রায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং পরে জীবন্ত উদ্ভিদের সাথে ক্রসিং-এ ব্যবহার করা যায়। সংরক্ষিত পরাগ থেকে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদও সৃষ্টি করা যাবে। পরাগ সংরক্ষণের মাধ্যমে কেবল উদ্ভিদের পুরুষ দিকটি সংরক্ষিত হয়, স্ত্রী দিকটি নয়।

কোন কোন প্রজাতি সংরক্ষণের দাবিদার

এক্স-সিটু কনজার্ভেশনে সব উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়, তাই কোন কোন উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার পাবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। সংরক্ষণের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

(i) দুর্লভ (rare) এবং সংকটাপন্ন (endangered) প্রজাতি প্রথম অগ্রাধিকার পাবে।

(ii) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দরকারি উদ্ভিদ প্রজাতির নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রজাতি অগ্রাধিকার পাবে, কারণ এসব নিকট সম্পর্কযুক্ত উদ্ভিদ জেনেটিক সম্পদের (genetic material) উৎস হিসেবে কাজ করে; যেমন— রোগ প্রতিরোধক্ষম জিন।

(iii) ট্যাক্সোনমিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতি ও তার নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রজাতি সংরক্ষণে অগ্রাধিকার পাবে।

দলগত কাজ : কোনো বোটানিক্যাল গার্ডেন, ন্যাশনাল পার্ক, অভয়াশ্রম, অভয়ারণ্য ভ্রমণ করে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন তৈরি করো এবং শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করো।

ইন-সিটু কনজারভেশন ও এক্স-সিটু কনজারভেশনের মধ্যে পার্থক্য

ইন-সিটু কনজারভেশন	এক্স-সিটু কনজারভেশন
১। স্বাভাবিক বাসস্থানের পরিবেশের মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে ইন-সিটু কনজারভেশন বলে।	১। জীবকে তার নিজস্ব বাসস্থান থেকে এনে অন্যত্র (বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা) কনজার্ভ করা হলো এক্স-সিটু কনজারভেশন। এছাড়া জীবের প্রোটোপ্লাজমযুক্ত কোষ, স্পার্মাটোজোয়া, ওভাম ইত্যাদিকে ঋণাত্মক উষ্ণতায় সংরক্ষিত করাকেও এক্স-সিটু কনজারভেশন বলে।
২। একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিকে ইন-সিটু কনজারভেশন করলে তার সাথে সম্পর্কিত অন্য জীবরাও সংরক্ষিত হবে।	২। এ ধরনের ঘটনার সুযোগ নেই।
৩। জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ইত্যাদির মাধ্যমে ইন-সিটু কনজারভেশন করা হয়।	৩। চিড়িয়াখানা, বীজ-ব্যাংক, স্পার্ম ও ওভাম ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে এক্স-সিটু কনজারভেশন করা হয়।
৪। অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম শ্রমের প্রয়োজন।	৪। অপেক্ষাকৃত কঠিন ও অধিক শ্রমের প্রয়োজন।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Importance of biodiversity conservation)

ধীরগতিতে জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি ও ধ্বংস একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। কিন্তু গত এক শতাব্দী যাবৎ ধ্বংসের হার সৃষ্টির চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। এর মূল কারণ মানুষের কর্মকাণ্ড। বন ধ্বংস ও জলাশয় ভরাট করে কৃষিজমি সম্প্রসারণ; অধিক ফলনের জন্য রাসায়নিক সার, আগাছানাশক, কীটপতঙ্গ নাশক, ছত্রাক নাশক প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার; নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য অধিক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস ও মাত্রাতিরিক্ত বনজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক বনভূমি ও জলাভূমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। প্রাণিকুল তার খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য সরাসরি উদ্ভিদকুলের ওপর নির্ভরশীল থাকায় বনভূমি ও জলাভূমি হ্রাসের সাথে সাথে বহু প্রাণী প্রজাতিও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অথবা বিপন্ন অবস্থায় আছে। একসময় আমাদের পত্রঝরা বনে ময়ূর ছিল বলে জানা যায়। আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও শালবনে বাঘ ছিল, বানরের জন্য বনের ধারে বাড়িতেও থাকা যেতো না। এখন ময়ূর নেই, বাঘও নেই, বানরও প্রায় নেই বললেই চলে।

জীবপ্রজাতির দ্রুত হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা দেখা দিয়েছে এবং দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু। ঝড়, টর্নেডো, হ্যারিকেন, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েই চলেছে। এসব কারণে মানুষের অস্তিত্বই আজ হুমকির মুখে। কাজেই মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই পৃথিবীব্যাপী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে। সৃষ্টি হয়েছে IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources);

WWF (World Wildlife Fund & Nature) ; UNEP (United Nations Environmental Program); WCMC (World Conservation Monitoring Centre); CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), EAS (Environmental Awareness Strategies), UNICEF (United Nations International Children Emergence Fund) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

নিজ দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ওপর নির্ভর করার চেয়ে নিজেরাই সচেতন হবো এবং অন্যদেরকে সচেতন করবো। জনগণকে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বোঝাতে পারলে সহজেই আমাদের এ অমূল্য সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে ভারতের হিমালয় অঞ্চলের **'চিপকো'** আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। চিপকো স্থানীয় আদিবাসী শব্দ যার অর্থ হলো **লেপ্টে থাকা**। কোনো বৃক্ষ কাটতে এলে ঐ আন্দোলনের কর্মীরা গাছের সাথে লেপ্টে থাকে, ফলে ঐ গাছটি কাটার হাত থেকে রক্ষা পায়। স্থানীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আমাদেরও অবস্থা অনুযায়ী কোনো উপায় আবিষ্কার করতে হবে।

যাহোক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বকে নিম্নলিখিত উপায়ে নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা যায়।

১। **জীববৈচিত্র্য ও কৃষি :** কৃষি উন্নয়নের জন্য জীববৈচিত্র্য থাকা অপরিহার্য। ফসলী উদ্ভিদের নিকট সম্পর্কযুক্ত বন্য উদ্ভিদের জিন ব্যবহার করে আমাদের কৃষি প্রজাতির ফলন অনেক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ফসলী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে, ক্ষরাসহিষ্ণু, লোনা জলসহিষ্ণু প্রকরণও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও করতে হবে। তাই জীববৈচিত্র্য (বিশেষ করে বন্য জীববৈচিত্র্য) মানব সমাজের খাদ্য যোগানের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

২। **জীববৈচিত্র্য ও মাছের চাহিদা :** বহু জাতের মাছ আছে, এদের পুষ্টিমানও পার্থক্যমণ্ডিত। আবার মানুষের পছন্দের চাহিদাও বহুমুখী। আবার এক মাছ আরেক মাছের খাবার। কাজেই জীবকুল যত বৈচিত্র্যময় হবে, আমাদের নিজস্ব চাহিদাও ততটাই পূরণ হবে।

৩। **জীববৈচিত্র্য ও ওষুধ :** মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জীববৈচিত্র্য নির্ভর। নতুন নতুন উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণায় নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। মানুষের জেনেটিক পার্থক্য ব্যাপক, বর্তমানের রোগের ধরনও ব্যাপক। কাজেই বৈচিত্র্যময় চাহিদা মেটাতে ব্যাপক বৈচিত্র্যময় জীব প্রজাতি থাকা অপরিহার্য। আমেরিকার The National Cancer Institute ৩৫,০০০ হাজার বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির এক লক্ষটি নির্যাস পরীক্ষা করে মাত্র একটি থেকে **Taxol** (Pacific Yew Tree থেকে) নামক ক্যান্সার কেমোথেরাপির ওষুধ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ৩৫,০০০ হাজার প্রজাতির মাঝ থেকে যদি এ একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতো তাহলে কেমোথেরাপির এ ওষুধটি আর আবিস্কৃত হতো না। এ থেকেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

৪। **জীববৈচিত্র্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য :** ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কযুক্ত। নির্মাণসামগ্রী, বুননসামগ্রী, ওষুধ, রং, মোম, কাগজ শিল্প, কর্ক শিল্প, রাবার শিল্প ইত্যাদি বহু ধরনের সামগ্রী জীবজগৎ থেকে আসে। বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ, বৈচিত্র্যময় সামগ্রীর যোগান দেয়। জীববৈচিত্র্য সংকুচনের সাথে সাথে আমাদের ব্যবসা ও শিল্প সংকুচিত হবে।

৫। **জীববৈচিত্র্য ও ইকোট্যুরিজম :** জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এলাকাকে ইকোট্যুরিজমের জন্য বেছে নেয়া হয়। বৈচিত্র্যময় জীব দেখার জন্য দেশ-বিদেশের প্রচুর লোক সেখানে যায় এবং এর মাধ্যমে দেশ বিপুল অংকের মুদ্রা (বৈদেশিক মুদ্রাসহ) লাভ করে।

৬। **জীববৈচিত্র্য ও এথনোবায়োলজি :** উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধরনের জীবকে সংযুক্ত করেছে। সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সাথে তাদের সমৃদ্ধ জীবন-যাপন নির্ভরশীল। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ উপজাতীয় গোষ্ঠীর সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য দরকার।

৭। **জীববৈচিত্র্যের নান্দনিক গুরুত্ব :** জীববৈচিত্র্যের নান্দনিক গুরুত্ব অপরিসীম। জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ পরিপাটি একটি মনোরম পরিবেশ মানুষকে দিয়ে থাকে অনাবিল আনন্দ, মানসিক শান্তি ও দৈহিক প্রশান্তি। মানসিক শান্তি মানুষকে করে চিন্তামুক্ত, রোগমুক্ত ও দীর্ঘজীবী। এটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য অধিক উপযোগী।

৮। জীববৈচিত্র্য এবং অবকাশ যাপন ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব : জীববৈচিত্র্য কবি সাহিত্যিক ও চিত্র শিল্পীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগায়, কাজে আনে নতুনত্ব ও গতি। অনেকেই অবসর সময় কাটান বাগান করে, পাখি পালন করে, অ্যাকুরিয়ামে সুন্দর মাছ চাষ করে।

৯। জীববৈচিত্র্যের ইকোলজিক্যাল গুরুত্ব : জীববৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ইকোসিস্টেম পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। যেকোনো ইকোসিস্টেমের ১/২টি কীস্টোন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটলে সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ফুড চেইন ও ফুড ওয়েব দুটিই জীববৈচিত্র্যনির্ভর। কাজেই জীববৈচিত্র্যের ইকোলজিক্যাল গুরুত্ব অপরিসীম।

১০। শরণার্থী হ্রাস : বিশ্বের বহুস্থানে পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে শরণার্থী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে ১ জন এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনে ১ জন জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করলে জলবায়ুগত অসুবিধাগুলো দূর হবে এবং সঠিকভাবে পরিকল্পনা নিলে শরণার্থী সংখ্যা হ্রাস পাবে।

IUCN Red List Categories

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) একটি বিশ্বভিত্তিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী সংস্থা, বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির আশঙ্কায় আছে এমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা করেছে, যা IUCN Red List নামে পরিচিত। বিস্তর গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের আলাপ-আলোচনার পর IUCN এ সংক্রান্ত কতিপয় ক্যাটিগরি (শ্রেণি) নির্ধারণ করে দিয়েছে। IUCN এর বর্তমান নাম World Conservation Union (WCU)।

ক্যাটিগরিসমূহ নিম্নরূপ :

১। Extinct Species বা বিলুপ্ত প্রজাতি : যে প্রজাতিটির সম্ভাব্য সব বাসস্থান এবং বছরের সব ঋতুতে পর্যায়ক্রমিক অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর পর নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, প্রজাতিটির সর্বশেষ সদস্যটির মৃত্যু হয়েছে। এর আর কোনো সদস্য বেঁচে নেই। বাংলাদেশের এন্ডেমিক *Nothopegia acuminata* J. Sinclair এখন বিলুপ্ত।

২। Extinct in the Wild বা বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত : যে প্রজাতিটি তার প্রাকৃতিক বন্য পরিবেশে আর পাওয়া যায় না বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে কিন্তু বাগানে চাষাবস্থায় বা কোথাও পালিত অবস্থায় (প্রাণীর ক্ষেত্রে) এখনও সংরক্ষিতভাবে জীবিত সদস্য রয়েছে তাকে বলা হয় বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত। *Anthurium leuconeurum* এমন একটি প্রজাতি যা বন্য অবস্থায় বিলুপ্ত কিন্তু Kew garden-এ লাগানো আছে।

৩। Critically Endangered বা অতিবিপন্ন : বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি নিকট ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার মতো চরম ঝুঁকিতে আছে তা হলো অতিবিপন্ন শ্রেণি।

৪। Endangered Species বা বিপন্ন প্রজাতি : বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি ভবিষ্যতে অতিবিপন্ন অবস্থায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটি হলো বিপন্ন প্রজাতি।

৫। Vulnerable Species বা বিপদগ্রস্ত/শঙ্কাগ্রস্ত : বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি ভবিষ্যতে বিপন্ন শ্রেণিভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা হলো বিপদগ্রস্ত বা শঙ্কাগ্রস্ত শ্রেণি।

৬। Rare Species বা বিরল প্রজাতি : এসব প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা খুব কম এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত বা কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমিত থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, **অতিবিপন্ন, বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত শ্রেণি তিনটিকে একত্রে হুমকিগ্রস্ত** (threatened) **প্রজাতি বলে।**

IUCN এর অন্যান্য ক্যাটিগরি হলো Least concern (LC), Data deficient (DD) এবং Not evaluated (NE)

৩, ৪ এবং ৫নং ক্যাটিগরিকে বলা হয় Threatened Category.

দলগত কাজ : এলাকার বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর তথ্য অনুসন্ধান, তালিকাকরণ, ফটোগ্রাফকরণ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি। বছর শেষে কাজের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে হবে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং, না ক্লাইমেট চেইঞ্জ

বিশ্বব্যাপী এখন আলোচনার বিষয় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (global warming) এবং বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন (climate change)। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার প্রধান কারণ হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের ক্রমবৃদ্ধি, অধিক হারে অরণ্য ধ্বংস, সম্প্রসারিত শিল্পায়নসহ আরো অনেক কারণ। গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ। যেমন N_2O, ফ্লোরোকার্বন্‌স (FCs), জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।

এক হিসেবে দেখা যায়, বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব ১৯৫৯ সালে ছিল ৩১৬ PPm, যা ২০০৮ সালে এসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৬ PPm; বৃদ্ধির হার ২২.২%। CO_2 গ্যাস বৃদ্ধির মূল কারণ বৃক্ষনিধন এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার। মিথেন গ্যাসের বৃদ্ধি ঘটেছে সবচেয়ে বেশি।

গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের বর্ধিত ঘনত্ব বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে এবং জলবায়ুর ধরনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা দেখছেন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে; তারা এটাকে বলছেন global warming বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সোলার রেডিয়েশন বায়ুমণ্ডল কতটা শোষণ করে এবং বায়ুমণ্ডলে এদের ঘনত্ব কত তার ওপরই বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর প্যাটার্ন নির্ভর করে।

বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলাফল

১। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে পর্বত চূড়ার হিমবাহ বা তুষারস্রোত কমে যাওয়া বা সরে যাওয়াতে ঐ অঞ্চলে পানি প্রাপ্তির ঘাটতি দেখা দেয়।

২। মেরু অঞ্চলে পুরু বরফস্তর গলে যাওয়া। গত ৪০ বছরে এ বরফস্তর ২০% গলে গিয়েছে, যার ফলে অতি দ্রুত সাগরে পানির স্তর বেড়ে গেছে। এর ফলে সাগর পারের নিম্ন এলাকা লোনা পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। একই কারণে বিশ্ব জলবায়ুর প্যাটার্নগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেমন অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, হারিকেন, টাইফুন, সুনামি ইত্যাদি।

গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চল অধিকতর ঠাণ্ডা হতে পারে, তাই গ্রিন হাউস গ্যাস বিরূপ প্রভাবকে **বৈশ্বিক উষ্ণতা** (Global warming) না বলে **জলবায়ু পরিবর্তন** তথা Climate Change বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। অ্যান্টার্টিকা অঞ্চলে অধিক হারে উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পুষ্পায়ন (২০২৩) জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি উদাহরণ।

সার-সংক্ষেপ

জীববৈচিত্র্য : Biodiversity-এর বাংলা জীববৈচিত্র্য করা হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে পৃথিবীতে বিরাজমান জীবসমূহের সামগ্রিক সংখ্যাপ্রাচুর্য ও ভিন্নতা হলো জীববৈচিত্র্য। জীব বলতে অণুজীব, ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বোঝায়। পৃথিবীতে **লক্ষ লক্ষ প্রজাতির** জীব রয়েছে। এরা একটি থেকে অপরটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং পৃথকযোগ্য। একটি প্রজাতির সব ব্যক্তি (individual) সামগ্রিক গঠনে একই রকম হলেও সূক্ষ্মতর বৈশিষ্ট্যে এরা পার্থক্যমণ্ডিত। পৃথিবীর সকল মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রতিটি মানুষই একজন থেকে অপরজন আলাদা। **জিনগত** পার্থক্যের কারণে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথকযোগ্য, ভিন্ন। পরিবেশ তথা **ইকোসিস্টেম** জীব প্রজাতিসমূহকে ধারণ করে। একটি ইকোসিস্টেম থেকে অন্য একটি ইকোসিস্টেমের গঠনগত পার্থক্য থাকলে তাদের ধারণকৃত জীবপ্রজাতিসমূহের মধ্যেও পার্থক্য থাকবে। একটি জলজ ইকোসিস্টেমে যে ধরনের জীব বাস করে, একটি স্থল ইকোসিস্টেমে অন্য ধরনের জীব বাস করে। সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমে যে ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে, মধুপুর বনের ইকোসিস্টেমে অন্য ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে। কাজেই দেখা যায়, জীববৈচিত্র্যের সাথে জিন, প্রজাতি ও ইকোসিস্টেম নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজেই জীববৈচিত্র্যকে সাধারণত তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়। যথা— জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity), প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species diversity or Taxonomic diversity) এবং ইকোসিস্টেমগত বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity)। এ তিন প্রকার বৈচিত্র্য মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছে জীববৈচিত্র্য বা Biodiversity। প্রাথমিকভাবে Biological Diversity নামে ১৯৮০ সালে দু'টি প্রবন্ধে বিষয়টি প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে Walter Rosen দু'টি শব্দকে মিলিয়ে Biodiversity হিসেবে প্রকাশ করেন।

কনজারভেশন : কনজারভেশন (conservation) শব্দটি জীববৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যকে টিকিয়ে রাখার নামই কনজারভেশন। কনজারভেশন হলো মানুষ কর্তৃক জীবমণ্ডলের ব্যবহার সংক্রান্ত এমন ব্যবস্থাপনা যাতে

করে জীবমণ্ডল বর্তমান প্রজন্মের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় সুফল প্রদান করতে পারে এবং একই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সব প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনাও সমভাবে অক্ষুণ্ন থাকে। কাজেই কনজারভেশন বলতে বোঝায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সহনীয় মাত্রায় প্রয়োগ, পুনরুদ্ধার এবং ব্যবহার।

কনজারভেশনের দু'টি প্রধান উপায় হলো— (i) ইন-সিটু কনজারভেশন এবং (ii) এক্স-সিটু কনজারভেশন।

(i) ইন-সিটু কনজারভেশন হলো জীববৈচিত্র্যের উপাদানকে তাদের নিজস্ব আবাসভূমিতে রেখেই সংরক্ষণ করা। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হলো ইন-সিটু পদ্ধতিতে কনজার্ভ করা। ন্যাশনাল পার্ক, ইকোপার্ক, সাফারি পার্ক, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, মৎস্য অভয়াশ্রম ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে ইন-সিটু কনজারভেশন করা হয়।

(ii) এক্স-সিটু কনজারভেশন হলো জীববৈচিত্র্যের উপাদানকে তাদের নিজস্ব বাসস্থানের বাইরে অন্য কোনো স্থানে সংরক্ষণ করা। বোটানিক গার্ডেন, সীড ব্যাংক, ফিল্ড জিন ব্যাংক, নিম্নতাপমাত্রায় ও তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো হলো এক্স-সিটু কনজারভেশন।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

১। গ্রিক Oikos অর্থ বাসস্থান এবং logos অর্থ জ্ঞান। শব্দ ২টি থেকে Ecology শব্দটির উৎপত্তি।

২। H. Reiter নামক একজন জার্মান বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম Ecology শব্দটি ব্যবহার করেন।

৩। প্রজাতি বলতে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের মিলসম্পন্ন একদল জীবকে বোঝায় যারা এ দলভুক্ত (প্রজাতিভুক্ত) অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যৌন মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম কিন্তু অন্যদলের (অন্য প্রজাতির) সদস্যদের সাথে যৌন মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

৪। একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই সময় বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে **পপুলেশন** (population) বা জীবগোষ্ঠী বলা হয়।

৫। একট নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ও সম্মিলিতভাবে পরস্পরের পর ক্রিয়াশীল সব প্রজাতির সব পপুলেশন মিলিতভাবে একটি **কমিউনিটি** বা **জীবসম্প্রদায়** গঠন করে।

৬। ইকোলজির মূল উপাদান হলো তিনটি। যথা– জীবসম্প্রদায়ের Abundance, Distribution and Adaptation অর্থাৎ ADA।

৭। কোনো স্থানের জীবসম্প্রদায় ও এদের পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে বলা হয় **বাস্তুতন্ত্র** বা **ইকোসিস্টেম**।

৮। যেকোনো বাস্তুতন্ত্রের জীব উপাদান হলো– (i) উৎপাদক (producer), (ii) খাদক (consumer) এবং (iii) বিয়োজক (Decomposer).

৯। উৎপাদক থেকে বিভিন্ন জীবস্তরের মধ্যদিয়ে খাদ্য শক্তির প্রবাহকে **খাদ্যশৃঙ্খল** বা **ফুড চেইন** বলে।

১০। ফুট চেইনের বিভিন্ন খাদ্যস্তরকে **ট্রফিক লেভেল** বলে।

১১। প্রকৃতিতে যেকোনো বাস্তুতন্ত্রে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর যুক্ত থাকলে তাকে **ফুডওয়েব বা খাদ্যজাল** বলে।

১২। বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ নিম্নরূপ : ১। উৎপাদক→২। তৃণভোজী খাদক→৩। মাংসাশী খাদক।

১৩। বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ একমুখী: উৎপাদক থেকে খাদকে।

১৪। উৎপাদক থেকে পরবর্তী প্রতি খাদ্যস্তরে ১০ শতাংশহারে শক্তি জমা হয়। শক্তি প্রবাহে এটি ১০ শতাংশ নিয়ম নামে পরিচিত।

১৫। যেকোনো পরিবর্তিত পরিবেশে জীবের খাপখাইয়ে নেয়াকে জীবের অভিযোজন বলে।

১৬। পানিতে জন্ম ও বিস্তার লাভ করা উদ্ভিদগুলোকে **হাইড্রোফাইট** (হাইড্রো = পানি; ফাইট = উদ্ভিদ) বা জলজ উদ্ভিদ বলে।

১৭। *Hydrilla* (হাইড্রিলা) নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের একটি উদাহরণ।

১৮। ক্ষুদিপানা মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদের একটি উদাহরণ।

১৯। শাপলা মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদের একটি উদাহরণ।

২০। কলমিলতা উভচর উদ্ভিদের একটি উদাহরণ।

২১। জলজ উদ্ভিদের বায়ুকুঠুরী বিশিষ্ট অন্তঃঅঙ্গসংস্থানিক গঠনকে **অ্যারেনকাইমা** বলে।

২২। মরুময় পরিবেশে জন্মানো উদ্ভিদকে **জেরোফাইট** বা **মরুজ উদ্ভিদ** বলে। ফণিমনসা, করবী হলো জেরোফাইটের উদাহরণ।

২৩। লবণাক্ত পরিবেশে জন্মানো উদ্ভিজ্জকে **হ্যালোফাইট** বা **লোনামাটির উদ্ভিদ** বলে।

২৪। অনেক লোনামাটির উদ্ভিদে **নিউমেটাফোর** বা শ্বাসমূল থাকে। কেওড়া উদ্ভিদে শ্বাসমূল থাকে।

২৫। অনেক লোনামাটির উদ্ভিদে **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম** হয়। রাইজোফোরা উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম দেখা যায়।

২৬। স্বাভাবিক মাত্রার মিঠা পানির অঞ্চলের স্থলজ উদ্ভিদকে **মেসোফাইট** বলে।

২৭। একই ধরনের জলবায়ু, একই ধরনের মাটি, একই জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ (ও প্রাণী) নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমকে বলা হয় **বায়োম**। যেমন—মরুভূমির বায়োম, তৃণভূমির বায়োম।

২৮। পৃথিবীকে মোট **৬টি প্রাণিভৌগোলিক** অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অবস্থান ও বিস্তৃতির ওপর ভিত্তি করে PL. Sciater ১৮৫৭ সালে প্রথম এ বিভাজন করেন।

২৯। পৃথিবীর ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল হলো– (i) প্যালিআর্কটিক অঞ্চল, (ii) ওরিয়েন্টাল অঞ্চল, (iii) অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল, (iv) নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল, (v) ইথিওপিয়ান অঞ্চল এবং (vi) নিআর্কটিক অঞ্চল।

৩০। বাংলাদেশ ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের অন্তর্গত।

৩১। বাংলাদেশে সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষের মধ্যে সিভিট, গর্জন, চন্দুল অন্যতম।

৩২। সিলেটের **রাতারগুল** একটি জলাবন বা সোয়াম্প ফরেস্ট। এখানে প্রধান উদ্ভিদ হিজল ও করচ।

৩৩। সুন্দরবনের প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী।

৩৪। গোলপাতা উদ্ভিদের পাতা গোল নয়, বরং নারিকেল পাতার মতো লম্বা। গোলপাতা অতি সংক্ষিপ্ত কাণ্ডবিশিষ্ট।

৩৫। বাংলাদেশের কয়েকটি এন্ডেমিক উদ্ভিদ হলো ক্ষুদে বড়লা *(Knema bengalensis).* রোট্যালা *(Rotala simpliciuscula),* নোথোপেজিয়া *(Nothopegia acuminata)*।

৩৬। বাংলাদেশে কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ হলো মল্লিকা ঝাঁঝি *(Aldrovanda vesiculosa).* কোরুদ *(Licula peltata).* ক্লোরোফাইটাম *(Chlorophytum repalense)*।

৩৭। বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত (পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত, কারণ এটি বাংলাদেশে এন্ডেমিক) একটি উদ্ভিদ হলো *Nothopegia acuminata* J. sinclair (Acanthaceae)। এটি Sinchlair ১৯৫৫ সনে কক্সবাজারের কলাতলি ছড়া থেকে নতুন প্রজাতি হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন।

৩৮। বাংলাদেশে কার্পজাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র হলো হালদা নদী।

৩৯। বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম রাজশকুন, নীলগাই, ঘড়িয়াল, মিঠাপানির কুমির ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কয়েকটি এন্ডেমিক উদ্ভিদ

Aspidopteris rotundifolia A. Juss.	চট্টগ্রাম	Malpighiaceae
Butea listeri (Prain) Blatter	রাঙ্গামাটি (বরকল)	Fabaceae
Gymnostachyum listeri Prain	চট্টগ্রাম (দিমাগিরি)	Acanthaceae
Hedychium speciosum Wall.ex Roxb.	সিলেট	Zingiberaceae
Knema bengalensis de Wilde	কক্সবাজার	Myristicaceae
Lagenandra gomezii (schott) Bogner and Jacobso	সিলেট (পানছড়া)	Araceae
Limnophila cana Griff.	জামালপুর, পাবনা	Scrophulariaceae
Litsea clarkei Prain	চট্টগ্রাম (সিতাকুণ্ড)	Lauraceae
Myrioneuron clarkei Hook.f	চট্টগ্রাম	Rubiaceae
Nothopegia acuminata J. sinclair	কক্সবাজার (কলাতলি ছড়া)	Anacardiaceae
Ophiorrhiza villosa Roxb.	চট্টগ্রাম	Rubiaceae
Phrynium imbricatum Roxb.	চট্টগ্রাম	Marantaceae
Rotala simpliciuscula (S. Kurz.) Kochne	চট্টগ্রাম	Lythraceae
Taxillus thelocarpa (Hook.f.) Alam	চট্টগ্রাম বাড়িয়াঢালা (কাজির হাট)	Loranthaceae
Vernonia thomsoni Hook.f.	চট্টগ্রাম (সিতাকুণ্ড)	Asteraceae

১৫টির মধ্যে ১২টি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, ২টি সিলেট এবং ১টি জামালপুর ও পাবনা জেলা থেকে সংগৃহীত ও বর্ণনাকৃত। এতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বায়োডাইভারসিটির ব্যাপকতা প্রমাণ হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রাণী কোনটি?
(ক) পাতিকাক (খ) ঘড়িয়াল (গ) মেনিমাছ (ঘ) গুইল্যা টেংরা

২। জীব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন—
(i) অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বন, ইকোপার্ক তৈরি (ii) যুদ্ধ-বিগ্রহ, বাঁধ ও সড়ক নির্মাণ, কলকারখানা তৈরি
(iii) DNA সংরক্ষণ, টিস্যু সংরক্ষণ, লিভিং জিন ব্যাংক তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
বাংলাদেশের সব জায়গার মাটি ও আবহাওয়া এক রকম নয়। তাই এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম উদ্ভিদ জন্মায়। কোনো কোনো উদ্ভিদ চিরহরিৎ আবার কোনো কোনোটি পত্রঝরা। শাল, চাপালিশ, নলখাগড়া, সুন্দরী, গেওয়া, বান্দরহোলা, গোলপাতা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবেশে জন্মে থাকে।

৩। উদ্দীপকের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলোর বৈশিষ্ট্য—
(i) জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (ii) শ্বাসমূল উপস্থিত (iii) লুক্কায়িত পত্ররন্ধ্র উপস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। উদ্দীপকের পত্রঝরা উদ্ভিদ কোন অঞ্চলে বেশি জন্মে থাকে?
(ক) গঙ্গানদীর বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল (খ) ঢাকা-ময়মনসিংহ বনাঞ্চল
(গ) বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল (ঘ) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (খ)	২। (খ)	৩। (ক)	৪। (খ)

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

১। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের একদল ছাত্র শিক্ষা সফরে সিলেট যায়। সেখানে তারা শাপলা, ফণিমনসা, হাইড্রিলা ইত্যাদি উদ্ভিদ সংগ্রহ করে শিক্ষককে দেখায়। শিক্ষক আর এক প্রকার উদ্ভিদ সুন্দরীর কথা বললেন যা সুন্দরবনে পাওয়া যায়।
(ক) জীবসম্প্রদায় কাকে বলে?
(খ) বাংলাদেশ যে প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলের একটি করে এন্ডেমিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম লেখ।
(গ) উদ্দীপকের উদ্ভিদগুলো পানির প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে কোন কোন গ্রুপে অবস্থান করে দেখাও।
(ঘ) উদ্দীপকের উদ্ভিদগুলো তাদের বাসস্থানে কীভাবে অভিযোজিত তা ব্যাখ্যা কর।

২। মিসরের পিরামিডের ওপর ডকুমেন্টারি দেখছিল অপু। পিরামিডগুলোর নিচের দিকটা প্রশস্ত এবং ওপরের দিক ক্রমশ সরু। নিচের দিকের পাথরের সংখ্যা ও ভর মধ্যস্তরের পাথরের সংখ্যা ও ভর অপেক্ষা বেশি। আবার শীর্ষস্তরের পাথরের সংখ্যা ও ভর মধ্যস্তরের পাথরের সংখ্যা ও ভর অপেক্ষা কম।
(ক) প্রজাতি কী?
(খ) ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের কী কী উপঅঞ্চল রয়েছে?
(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত নকশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থা বাস্তুতন্ত্রেও বিরাজমান—বিশ্লেষণ করো।
(ঘ) "উদ্দীপকের বিভিন্ন স্তরের পাথরগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের মতো বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক থাকলেই কেবলমাত্র পৃথিবীর পরিবেশ ঠিক থাকবে।"—উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

৩। ড. রাকিব এক ধরনের উদ্ভিদে শ্বাসমূল ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম এবং অন্য ধরনের উদ্ভিদে বড়ো বায়ুকুঠুরী ও লম্বা মধ্যপর্ব দেখতে পেলেন যা উদ্ভিদগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত করেছে।
(ক) ইকোলজিক্যাল পিরামিড কী?
(খ) জীব বিলুপ্তির (জীববৈচিত্র্য হ্রাসের) কারণ কী?
(গ) উক্ত দুই প্রকার উদ্ভিদের মধ্যে তুলনা করো।
(ঘ) উক্ত উদ্ভিদগুলো কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে টিকে আছে?